কান্তাপ্রেম

॥ প্রারম্ভিক ॥

এ কাহিনী যখনকার তখন গৌড়বঙ্গের গৌরব বলতে, শিক্ষা-সংস্কৃতি-জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু বলতে নবদ্বীপকেই বোঝাত। সেন বংশের সঙ্গেই হিন্দু রাজশক্তি বিলুপ্ত হয়েছে, এই নবদ্বীপের রন্ধ্রপথেই এসেছে বিদেশী মুসলমান শক্তি, ইখতিয়ার-উদ্দীন মুহম্মদ বক্তিয়ার বিনাযুদ্ধে দখল করেছেন এই গৌরবনগরী, সেই সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ গৌড়বঙ্গই। গেছে তথাকথিত পাঠানরা, এসেছে মুঘলরা। গৌড়বঙ্গে দু-একটা সামান্য সাময়িক অভ্যুত্থান ছাড়া রাজশক্তি পুনরায়ত্ত করার কোন চেষ্টা করেন নি কেউ।

নবদ্বীপের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী এসব নিয়ে মাথা ঘামান নি। তাঁরা জ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির রাজ্য বিস্তারকেই শ্রেয় বোধ করেছেন। তাঁরাও দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন বৈকি। তখন মিথিলা বা কাশী থেকে উপাধি না নিয়ে এলে কেউ কোন শাস্ত্রে পারঙ্গম বিবেচিত হতেন না। বাঙালী, নৈয়ায়িক রঘুনাথ মিথিলার পক্ষধর মিশ্রকে পরাজিত ক'রে—কবির ভাষায় 'পক্ষধরের পক্ষ শাতন' ক'রে সে স্বীকৃতির অধিকার নবদ্বীপে এনেছেন। নবদ্বীপের আর এক পণ্ডিত গদাধর তর্কের শক্তিতে ভুলকে নির্ভুল প্রমাণ করেছেন। তাঁর পুঁথির লিপিকার অনবধানতাবশত একটি শব্দ ভুল লিখেছিল, অপর কোন ঈর্ষী পণ্ডিত পুঁথির সেই পৃষ্ঠাটি কুকুরের গলায় বেঁধে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছিলেন—গদাধর লিপিকারের ভুল জেনেও মাথা নত করেন নি, বিচারসভা ডেকে তর্কের দীপ্তিতে অপরের জ্ঞান আচ্ছন্ন ক'রে সে শব্দও যে ওখানে প্রযুজ্য হতে পারে তা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন।

এই ছিল নবদ্বীপ, পণ্ডিত আর পাণ্ডিত্যাভিমানীদের নিয়ে যেন এক পৃথক পৃথিবী রচনা ক'রে। ধরাতলের রাজশক্তি ও পরলোকের ঐশীশক্তির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক সীমাবদ্ধ ছিল পুঁথির পাতায় আর তর্কের কোলাহলে।

তবে কি সেখানের অধিবাসীরা ঈশ্বরকে বাদ দিয়েছিলেন জীবন থেকে?

না, তা কেন? আচার অনুষ্ঠান সবই যন্ত্রবৎ পালিত হ'ত। গৃহদেবতার নিত্যপূজায় কোন ত্রুটি ঘটত না। আর যেটা হ'ত—জীর্ণ রোগগ্রস্ত বৌদ্ধধর্মের উত্তরাধিকার হিসেবে কিছু তথাকথিত তন্ত্রসাধনা—সাধনার নামে সুরা ও ব্যভিচারের উন্মত্ত-উৎসব। ঈশ্বর বা ইষ্ট ছিলেন শাস্ত্রের আর তর্কের জালে আচ্ছন্ন,

তাঁকে লাভ করার যেটুকু প্রচেষ্টা—তা ছিল একমাত্র জ্ঞানের মধ্য দিয়ে—তাঁকে ভালবাসার কথা কেউ ভাবত না, তাঁকে অন্তরে পাবার আকূতিও না। দু-একজন সাধুসন্ত আসতেন নবদ্বীপের গৌরবদ্যুতিতে আকৃষ্ট হয়ে—তাঁদের সেবা-যত্নের কোন অভাব ঘটত না—কিন্তু সেইখানেই সে পর্বের সমাপ্তি ঘটত।

তবু, একদা এই নবদ্বীপের জ্ঞানের পঙ্কেই সেই প্রেম-সাধনার কমলটি বিকশিত হয়েছিল। ঈশ্বরকে যে ভালবাসা যায়, বিরহিণী নারীর মতো তাঁকে উগ্র কামনায় আকর্ষণ করা যায়, নরদেহধারীর মতো তাঁকে সেবা ক'রে তৃপ্তি ও সার্থকতা লাভ হয়—সে কথা জনৈক নবদ্বীপবাসীর কাছেই শুনল মানুষ।

কতকটা তারই কাহিনী এ। সেই এক অত্যাশ্চর্য সাধনার, সেই অবিশ্বাস্য উপলব্ধির, সেই পরম পিপাসার। তবে এ কাহিনী—কাহিনীই, উপন্যাস মাত্র। ইতিহাস নয়।

গ্রন্থারম্ভ

॥ ১ ॥

নবদ্বীপের প্রশস্ত গঙ্গার উপরে অস্তসূর্যের রক্তিমাভা-রঞ্জিত একখণ্ড মেঘের ছায়া দক্ষিণা বাতাস লেগে নদীজলের দর্পণে বার বার কেঁপে ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। বাতাস বন্ধ হয়ে নদীজলে প্রশান্তি ফিরে এলে সে চিত্র আবার সংহত অখণ্ড রূপে ফিরে আসে কিনা, সুদূর আকাশের প্রতিচ্ছবি এই মর্ত্যের নদীতে পূর্ণরূপে দেখা দেয় কিনা—একাগ্র, বলা উচিত যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে সেইটিই লক্ষ্য করছিলেন তরুণ অধ্যাপক বিশ্বেশ্বর আচার্য।

অন্তত তাঁর ভ্রূবদ্ধ ললাট ও নিশ্চল দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। যেন তাঁর আর কোন কর্ম নেই, উদ্দেশ্য নেই, লক্ষ্য নেই—ঐ খণ্ড খণ্ড, ইতস্তত বিসর্পিত, চূর্ণীভূত প্রতিবিম্বের পুনঃ অখণ্ড রূপ ধারণ করার উপরই তাঁর জীবনমরণ নির্ভর করছে।

আসলে বিশ্বেশ্বর তাঁর বর্তমান মানসিক অবস্থাটারই প্রতিফলন মিলিয়ে পাচ্ছিলেন—মেঘের এই ছায়াচিত্রের মধ্যে।

স্বচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত বংশের সন্তান, উচ্চশিক্ষিত,—অবিশ্বাস্যরূপ স্বল্পসময়ে চতুষ্পাঠীর সর্বোচ্চ পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হয়ে গুরুর দ্বারা সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম বলে স্বীকৃত হয়েছেন। সুপুরুষ, কান্তিমান, স্বাস্থ্যবান—গৃহে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী, সুন্দরী বধূ—জীবন ঐ বর্ণোজ্জ্বল মেঘখণ্ডের অনুরূপ কৃষ্ণছায়ালেশহীন লঘুপক্ষ-বিহঙ্গমের মতোই অবাধ আনন্দ আকাশে ভেসে যাওয়ার কথা। কিন্তু কেন কে জানে, কোথা থেকে এক চিন্তা-অস্থিরতা এসে অকারণেই তাঁর চিত্তকে বিক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছে—একটা অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। সে অস্বস্তি বা অস্থিরতা খুব প্রবল বা প্রকট না হ'লেও সর্বক্ষণস্থায়ী—নিদ্রায়-জাগরণে, গৃহকর্মে-অধ্যাপনায় —সর্বসময়ের সঙ্গী হয়েছে, যেন তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গেই বিজড়িত হয়ে পড়েছে।···

'বিশাই!'

অকস্মাৎ এক পরিচিত কণ্ঠের এই অন্তরঙ্গ সম্বোধনে চমক ভাঙল বিশ্বেশ্বরের।

যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন। একটু যেন অপ্রতিভও বোধ করলেন সেই সঙ্গে। কোন গোপন অনুষ্ঠানের মধ্যে আকস্মিক এক বহিরাগতের আগমন ঘটলে যেমন হয় তেমনিই।

যিনি ডাকলেন তিনি বিশ্বেশ্বরের সতীর্থ, অধুনা—অতি তরুণ বয়সেই—বিখ্যাত নৈয়ায়িক হিসাবে পরিচিত—রঘুবীর।

স্বপ্নের ঘোর বিদূরিত হতে বা তন্দ্রাভঙ্গে মন ও বাক্‌শক্তিকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে বিলম্ব হয়। বিশ্বেশ্বরেরও হ'ল। সেই সঙ্গে ভ্রূকুটি আরও একটু ঘনীভূত হয়ে উঠল।

তাঁর নাম বিশ্বেশ্বর, সাধারণত পরিচিত বন্ধুরা ডাকেন 'বিশু' বলে—বিশাই নামটি তাঁর মাতার নিজস্ব ডাক, এ নামকে অপর কেউ উচ্ছিষ্ট করে, সর্বজন-সমক্ষে তাকে সাধারণের ব্যবহার্য ক'রে তোলে—এটা রুচিকর নয় বিশ্বেশ্বরের। কিন্তু এখন তাঁর সতীর্থ ও বন্ধুরা অনেকেই এই নামে ডাকছেন। ভাল লাগে না, অথচ বাধাও দিতে পারেন না—এ এক অদ্ভুত অবস্থা।

তবু, বেশীক্ষণ সে বিরক্তির চিহ্ন স্থায়ী হ'ল না। স্মিত প্রসন্ন মুখেই ডাকলেন, 'কে, রঘুবীর! এসো ভাই, এসো এসো।'

'অমন একাগ্রচিত্তে কি এত চিন্তা করছিলে?' বলতে বলতে নদীর পাড় বেয়ে নেমে আসেন রঘুবীর, 'ন্যায়ের কোন বিশেষ সূত্র? না, পাণিনির কোন সূত্রের খণ্ডন-যুক্তি? তোমার তো এখন আবার বেদান্তের দিকে বেশী মন গেছে!'

'না, ওসব কিছু না!' হেসেই উত্তর দিলেন বিশ্বেশ্বর, 'মন যত নানা তুচ্ছ চিন্তায় ও বাসনায় বিক্ষিপ্ত হয়—ততই শরীর স্থির হয়ে সেই সব চিন্তাকে সংহত করতে চেষ্টা করে বা বিশেষ চিন্তায় নিবদ্ধ করতে চায়। সাধারণ লোকে সে নিশ্চলতাকে তন্ময়তা বলে ভুল করে, তুমি করবে কেন? তুমি পণ্ডিত, মনকে একাগ্র করা কত কঠিন—তুমি জান না?'

'তা বটে। যাক গে, ওসব কচকচি। অতি মধুর দক্ষিণা বাতাস বইছে, এমন সময়ে এসব গুরুগম্ভীর আলোচনা করা অন্যায় শুধু নয়, অপরাধ। চলো, গঙ্গাগর্ভে গিয়ে একটু এই সন্ধ্যা উপভোগ করা যাক। অনুকূলের ডিঙ্গিখানা তো ঘাটে বাঁধাই আছে, এটাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ি এসো।'

'তারপর? অনুকূল?'

'সন্ধ্যার আগে অনুকূলের দ্বিপ্রহরের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না, তার পরেও বহুক্ষণ যায় জড়তা কাটতে—আমরা তার পূর্বেই ফিরে আসতে পারব।'

বিশ্বেশ্বর আর দ্বিরুক্তি করলেন না। 'চলো' বলে একেবারে ছোট্ট নৌকা-

খানিতে উঠে বসলেন।

রঘুবীর স্বাস্থ্যবান, নৌকা চালনায় তাঁর দক্ষতা সর্বজনস্বীকৃত। তিনিই দু-হাতে দুটো দাঁড় বেয়ে অতি অল্পক্ষণেই নৌকোখানাকে নদীমধ্যে নিয়ে গেলেন এবং আশ্চর্য কৌশলে একখানি মাত্র দাঁড়ের সাহায্যে সেই মাঝগঙ্গাতেই নৌকো-খানাকে স্থির রাখলেন। দুদিকের ছায়া-সুনিবিড় তীরভূমির শোভা দেখা আর অপরাহ্নের বসন্ত বাতাস উপভোগ করাই তাঁর উদ্দেশ্য, এ সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম ক'রে ঘর্মাক্ত হতে চান না।

দু-একটি লঘু হাস্য পরিহাসের পর হঠাৎই রঘুবীরের লক্ষ্য পড়ল—বিশ্বেশ্বরের হাতে একখানি পুঁথি, এতক্ষণ উত্তরীয়ে আবৃত ছিল বলে দেখা যায় নি।

'ও গ্রন্থটি কি বিশাই ? কার লেখা ? কিসের ওপর ?' সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলের রঘুবীর।

'ও কিছু না।' বিশ্বেশ্বর কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন, দ্রুত পুঁথিখানির উপর উত্তরীয় টেনে দেন।

'কিছু না, তার অর্থ ? একটি বস্তুর অস্তিত্ব চোখে দেখতে পাচ্ছি—প্রত্যক্ষ সত্য—তুমি মায়াবাদীর মতো দৃষ্টিগোচর পদার্থকেও উড়িয়ে দিতে চাইছ ! না, আমার সন্দেহ হচ্ছে পুঁথিখানি তোমারই, স্বরচিত।'

অপ্রতিভের হাসি হেসে বিশাই বলেন, 'না ভাই, গঙ্গাগর্ভে মিথ্যা বলতে পারব না, তোমার অনুমান যথার্থ !'

'বা বা ! তোমার মতো অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত যখন গ্রন্থ রচনা করেছ তখন তার বিষয়বস্তুও অসামান্য নিশ্চয়। তা, কোন্ শাস্ত্রে তোমার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে ইচ্ছা হ'ল একটু জানবার সাধ জাগছে যে মনে !'

'বলতে লজ্জা বোধ করছি ভাই, তুমি এই বয়সেই দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক বলে বিখ্যাত হয়েছ—যথার্থ অর্থে দিগ্বিজয়ী—সেখানে প্রবেশ করার চেষ্টা শুধু অনধিকার-চর্চা নয়,—বোধ করি ধৃষ্টতাই। এ ন্যায়েরই একটি টীকা রচনার সামান্য চেষ্টা।'

'তাই নাকি !'

অকস্মাৎ কি রঘুবীরের মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে ! সূর্য বহুক্ষণ বৃক্ষবিটপীর অন্তরালে আত্মগোপন করেছেন কিন্তু তাঁর দীপ্তিবৈভব একেবারে বিলুপ্ত হয় নি, দিকচক্ররেখা থেকে ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত সে রশ্মিছটা আকাশের মেঘে প্রতিফলিত হয়ে

এক অপূর্ব, প্রায় অনৈসর্গিক আলোকের সৃষ্টি করেছে। কৃত্রিমও নয় অথচ স্বাভাবিকও নয় সে আলোক। তাকে আবরিত এমন কি ম্লানও করতে পারে নি সন্ধ্যাদেবীর কৃষ্ণচেলাঞ্চল।

সেই লোহিতাভ বর্ণাভায় যতটুকু দেখা যায়—বিশ্বেশ্বরের মনে হ'ল যেন রঘুবীরের স্বভাব-উজ্জ্বল মুখকান্তিকে কে ভস্মাচ্ছাদিত ক'রে দিল।···

প্রায় কয়েক পল পরে রঘুবীর স্বর খুঁজে পেলেন। কণ্ঠে অভ্যস্ত কৌতুক-প্রিয়তার আভাস আর নেই, বরং কেমন একপ্রকার মিনতির ভাবই প্রবল। অনুনয়ের ভঙ্গীতে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'কি লিখেছ একটু পড়বে? পড় না ভাই!'

'যাঃ! তোমার কাছে আমি পড়ব ন্যায়ের গ্রন্থ!'

'বার বার ও কথা বলে কি আমাকে পরিহাস করছ!' রঘুবীরের কণ্ঠ অন্যরূপ চেষ্টা সত্ত্বেও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, 'কে না জানে সকল পরিচিত শাস্ত্রেই তোমার অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিবিধি! তুমি যদি আমাকে না শোনাও তো বুঝব আমাকে তোমার রচনার মর্মগ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচনা করো না!'

এর পরে আর পলায়নের পথ কোথায়? বিশ্বেশ্বরকে কতকটা অনন্যোপায় হয়েই পড়তে হয়।

আর, হয়ত মনের নিভৃত গোপনে একটু ইচ্ছাও ছিল নিজের সদ্যসমাপ্ত রচনাটি শোনাবার। নিজের শক্তি স্বীকৃত হোক, নিজের সৃষ্টি, প্রচেষ্টা যোগ্য সমাদর ও সম্মান লাভ করুক— এ কোন্ গ্রন্থকার না চান! এবং যে শাস্ত্রে তিনি নূতন আলোকপাত করতে চাইছেন এ গ্রন্থে--সে শাস্ত্রে রঘুবীরের তুল্য শ্রোতা বা পাঠক আর কে আছে!

তিনি বৃথা আর বাক্যব্যয় না ক'রে পুঁথির বস্ত্রবন্ধন মোচন ক'রে পাঠ আরম্ভ করলেন।

সূক্ষ্মমাত্র অন্যমনস্ক ভাবে একটি দণ্ড সঞ্চালন ক'রে নৌকাখানিকে একস্থানে রাখার চেষ্টা চলতে লাগল—তদ্ব্যতিরেকে কোন চাঞ্চল্য কি অস্থিরতা নেই শ্রোতার, মুখভাবেরও কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না—তিনি স্থির ভাবেই বসে একাগ্র মনে শুনতে লাগলেন বিশাই পণ্ডিতের টীকা, স্বীয় মতের স্বপক্ষে তীক্ষ্ণ ও অকাট্য যুক্তি।

কোন চাঞ্চল্য নেই, বোধ করি চোখের পলকও পড়ছে না—কেবল মনের

মধ্যে যে প্রবল ঝটিকাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ কেউ লক্ষ্য করলেই দেখতে পেত —ললাটে প্রথম স্বেদাভাস, পরে ঘর্মবিন্দুর গঠন—সে বিন্দু ক্রমে একত্রিত হয়ে জল-ধারায় পরিণত হচ্ছে, স্কন্ধের ও পৃষ্ঠের উত্তরীয় স্বেদার্দ্র হয়ে দেহের সঙ্গে লিপ্ত হচ্ছে ; সেই সঙ্গে মুখ বিবর্ণ থেকে বিবর্ণতর হয়ে উঠছে।

তবে, রঘুবীরের সৌভাগ্যবশত, তা লক্ষ্য করার মত কেউ ছিল না।

বিশ্বেশ্বরের পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে যে পরিমাণ সঙ্কোচ ও জড়তাই থাক না কেন—পরে আর তার চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি নিজের রচনার লিপিকৌশলে, যুক্তিজালের অভিনবত্বে যেন আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন ; সাফল্যের তৃপ্তি ও আনন্দে উত্তেজিতও হয়ে উঠেছিলেন একটু। তিনি নূতন ক'রে অনুভব করছেন —তাঁর যুক্তি খণ্ডন করার মতো কোন প্রতিপক্ষ আর নেই।···

দিবসের আলোকচিহ্ন ম্লান হ'তে হ'তে ক্রমে অন্তর্হিত হয়। গঙ্গাবক্ষে নেমে আসে অন্ধকারের আস্তরণ। আকাশে একটি একটি ক'রে তারকার আবির্ভাব ঘটে। দুপাশের দেবালয়ে ও গৃহস্থাবাসে শঙ্খধ্বনির দ্বারা সন্ধ্যাকে স্বাগত জানানো হ'তে থাকে।

অবশ্য, শীতের কুহেলি আর নেই, বাতাস স্নিগ্ধ, বায়ু নির্মল। নির্মেঘোজ্জ্বল আকাশে তারকাগুলিকেও উজ্জ্বলতর দেখায়, তারও কিছু আলোক এসে পৌঁছয় ; প্রথম শুক্লপক্ষের এক কলা চন্দ্রও পশ্চিম আকাশে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ। অর্থাৎ পরিবেশ একেবারে মসীঘন তমসাবৃত নয়।

তবে আলোর বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। পুঁথির পত্র একটি একটি ক'রে সরিয়ে যাচ্ছেন বিশ্বেশ্বর কিন্তু তা দেখে পড়ার কোন প্রয়োজন হচ্ছে না। এ বই তাঁর কণ্ঠস্থ। যাঁর কোন পুঁথি একবার মাত্র পাঠ করলে বা শ্রবণ করলেই তা মুখস্থ হয়ে যায়—সেইজন্যই গুরু যাঁকে 'শ্রুতিধর' আখ্যা দিয়েছিলেন—নিজের রচনা তাঁকে পুস্তকের পৃষ্ঠা দেখে পড়তে হবেই বা কেন ?

নিবিষ্টচিত্তে পাঠ ক'রে যাচ্ছিলেন বিশ্বেশ্বর, গ্রন্থ সমাপ্ত হ'তে পুনশ্চ পুঁথি বন্ধন করতে করতে মুখ তুলে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রশ্ন করলেন, 'কেমন শুনলে বলো ? পণ্ডিত সমাজ এ গ্রন্থ গ্রহণ করবেন ?'

উত্তর দিতে সময় লাগবে, এ তো স্বাভাবিক।

অবশেষে বিশেষ চেষ্টায় রঘুবীর বলে উঠলেন, 'অপূর্ব ! অপূর্ব ! এর তুলনা নেই। বিশ্বেশ্বর তুমি ধন্য, সত্যই তুমি পণ্ডিতচূড়ামণি। এর ওপরে কেউ যেতে

পারবে না। যাওয়া সম্ভব নয়।'

কিন্তু কণ্ঠস্বরটা এমন কেন? যেন করুণ, অতীব ব্যথাতুর; অশ্রুবিকৃত বলে মনে হচ্ছে।

চমকিত হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন বিশ্বেশ্বর বন্ধুর মুখের দিকে। এতক্ষণের অন্ধকারে অভ্যস্ত দৃষ্টি সেই যৎসামান্য প্রকৃতিদত্ত আলোকেই দেখতে পেল রঘুবীরের দুই চক্ষুর কোল বেয়ে নিঃশব্দে দরবিগলিতধারে জল গড়িয়ে পড়ছে। স্বেদধারাও যথেষ্ট, তবু অক্ষিপল্লব সিক্ত ক'রে যা নেমে আসছে তা অশ্রুই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিশ্বেশ্বর ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

'একি ভাই রঘুবীর, তোমার চোখে জল, কণ্ঠস্বর গাঢ়! তুমি—তুমি কি দুঃখ পেলে? কিন্তু কেন ভাই? আমার এই গ্রন্থের বক্তব্যে? এটি কি খুব কুলিখিত বলে মনে হ'ল তোমার? আমি কি তবে শাস্ত্রের অমর্যাদা করেছি? তুমি যে এইমাত্র প্রচুর প্রশংসা করলে সে কি তবে ব্যঙ্গার্থক? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'তুমি বুঝতে পারবে না ভাই', গাঢ়স্বরে বলেন রঘুবীর, 'তুমি বিরাট, তুমি মহান। তুমি বিপুল শক্তিধর। তোমার প্রজ্ঞা-ঐশ্বর্যের সীমা নেই। আমার মতো জ্ঞান-দরিদ্রের দুঃখ তুমি অনুমানও করতে পারবে না। আমার বস্তুত এক কানাকড়ির মূলধন, তারই ভরসা ক'রে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছি—ন্যায়দীধিতি—আমার সাধ্যমতো অবশ্য তাকে পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিহীন করার চেষ্টা করেছি, বার বার দেখেছি, মার্জনা করেছি। তার ফলে আমার ধারণা হয়েছিল যে, এই একটিমাত্র গ্রন্থেই আমি অমর হয়ে থাকতে পারব। যাবচ্চন্দ্রার্ক-মেদিনী—যতদিন অধ্যয়ন অধ্যাপনা বা শাস্ত্রচর্চা চলবে ততদিনই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে লোকে—আর ততদিনই আমার এই পুস্তক ছাত্ররা শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে পাঠ করবে।···আজ তোমার এই গ্রন্থের পাঠ শুনে—'

আবারও স্বর রুদ্ধ হয়ে এল রঘুবীরের।

বিশ্বেশ্বর বলে উঠলেন, 'তুমি, তুমি এ বিষয়ে কৃতবিদ্য শুধু নয়—ন্যায়শাস্ত্রে পারঙ্গম—এ কথা কে না জানে। তোমার কাছে আমার মতামত অবশ্যই অর্বাচীনের ধৃষ্টতা বলে বোধ হবে—তুমি এ শাস্ত্র ভালবাস তাই এত দুঃখ পেলে—'

'বিশাই, বিশাই, তুমি কি আমার বক্তব্য এখনও বুঝতে পারো নি। তোমার গ্রন্থের মর্মোপলব্ধির পর আমি কি প্রলাপ লিপিবদ্ধ করেছি—কী তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ রচনা করেছি—তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তোমার এই রচনার পাশে কেন, কাছাকাছিও দাঁড়াতেও পারবে না আমার রচনা। নিজের যুক্তিকে নিজেরই অক্ষম পঙ্গু বলে বোধ হচ্ছে। যাকে কীর্তি বলে মনে হচ্ছিল আজ তাকেই অপকীর্তি বলে বুঝতে পারছি। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করছে।…এতদিন ধরে যে প্রাসাদ গড়ে তুলেছি তা পাষাণ এমন কি ইষ্টক-নির্মিতও নয়, নিতান্তই বালুকা দিয়ে তৈরী। অথচ এও জানি, আমি অবহেলা করি নি বিন্দুমাত্রও, এর থেকে অধিক বিদ্যা বা বুদ্ধি আমার নেই। আসলে তোমার শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় জানা সত্ত্বেও এ প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়াই আমার মূর্খতা হয়েছে।'

যেন নিশ্চিন্ত হলেন বিশ্বেশ্বর। বালকের প্রচণ্ড অভিমানের তুচ্ছ কারণ অবগত হয়ে যেমন অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত হন তেমনিই। হেসে বললেন, 'এই ! এর জন্যে তুমি এত দুঃখিত হচ্ছ। তোমার ন্যায়দীধিতি অক্ষয় হোক, অমর করুক তোমাকে—আমার এ বিষয়ে প্রশংসা বা স্বীকৃতিতে কিছুমাত্র লোভ নেই !'

বলতে বলতে—গ্রন্থের আবরক বস্ত্রে গ্রন্থিবন্ধন তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল—তিনি পুঁথিখানি বহু দূরে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন। একটি মা সামান্য শব্দ ক'রে এতদিনের পরিশ্রম জাহ্নবীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেল।

'হাঁ হাঁ, করলে কি ! করলে কি ! এই অমূল্য গ্রন্থ—'

রঘুবীর পুঁথিটি পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে জলে ঝাঁপ দেবার উপক্রম করছেন দেখে বিশ্বেশ্বর চোখের নিমেষে সবলে তাঁকে চেপে ধরলেন। তাঁদের সেই ধস্তাধস্তিতে ক্ষুদ্র নৌকা একদিকে হেলে প্রায় নিমজ্জিত হবার উপক্রম হচ্ছিল—রঘুবীরই তা বুঝে দক্ষ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে বিপদ সামলে নিলেন।

'তুমি এই অমূল্য রত্ন জলে ফেলে দিলে ! আমার জন্যে ! ছি ছি, করলে কি !'

'ভাই, লিখেছিলাম বটে, একটু-তৃপ্তিও পেয়েছিলাম, মিথ্যা বলব না। কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হচ্ছি জানলে সে চেষ্টাও করতুম না। এ অফল শাস্ত্রের কি মূল্য—যে, সে শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বন্ধুকে দুঃখ দেব ! ধিক ! তুমি নিশ্চিন্ত হও, এ গ্রন্থ নষ্ট করার জন্য আমার কখনই,

কোন দিনই পশ্চাত্তাপ হবে না।'

'তুমি একে অফল শাস্ত্র বলছ!' রঘুবীরের কণ্ঠে একটা বক্রতা দেখা দেয়, 'তোমার মতে কোনটা সফল শাস্ত্র তাহ'লে!...এতদিনের এত বিদ্বজ্জনের জ্ঞানচর্চার ফল, কত লোকের আজীবন চিন্তালব্ধ ঐশ্বর্য, অক্লান্ত পরিশ্রম অতন্দ্র গবেষণার এই বিপুল সঞ্চয়—এর কোন মূল্যই নেই তোমার কাছে!'

'রঘুবীর, তুমি অনন্যমনা হয়ে এই শাস্ত্রচর্চা করছ একে অফল বললে তোমার আঘাত লাগবারই কথা—সেই কারণেই উত্তেজিত হয়েছ কিন্তু এসব কোন্ শাস্ত্র কোন্ জ্ঞান তোমাকে বহু দূরে চরমতম সত্যে নিয়ে যেতে পারে বলো তো! আমি এতদিন মন দিয়ে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, বহু পণ্ডিতের বহু বিতর্ক যুক্তি প্রতিযুক্তি পাঠ করেছি, হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছি; তুমিই আমাকে মহা-পণ্ডিত বলেছ, সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম বলেছ, মায়াবাদীও বলেছ—হ্যাঁ, চেষ্টা করেছি বোঝার কিন্তু দেখেছি এই সব পণ্ডিতের জ্ঞান বুদ্ধি কিছুদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে—চরম প্রশ্নের সত্য উত্তর দিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত নীরন্ধ্র এক অন্ধ প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে থামতে হয়েছে সকলকেই, যে অন্ধকারের অপর পারে সত্যালোক আছে সে তমসাবৃত নদী পার হতে পারেন নি কেউ!'

'কি সে সত্য?'

'সেইটেকেই তো খুঁজছি। মনে হয় এসব শাস্ত্রচর্চা কেবলই যেন কথা দিয়ে কথা কাটা—সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের যুদ্ধ; এ সবই অসার। সৃষ্টির অমৃত, চতুর্দিকে থরে থরে সাজানো, আনন্দের প্রস্ফুট কমল ফুটে আছে তার মধুর সম্ভার নিয়ে—সেখানে সে পদ্মের আকৃতি, গঠন, সৌরভের পরিমাণ নিয়েই তর্ক করব, সেই হিসাবে জীবন কাটাব—মধু আস্বাদ করব না!'

'সে মধু তুমি কাকে বলছ? তোমার কিসের পিপাসা, কিসের অন্বেষণ—কোন্ সে শাশ্বত বস্তু। এতখানি পাণ্ডিত্য আয়ত্ত ক'রেও তোমার কোন অভিমান নেই, অহঙ্কার নেই—এত বড় সম্মানকে তুচ্ছ করছ কিসের জন্যে? কী চাও তুমি।'

'তা জানি না।' যেন উন্মনার মত বলে ওঠেন, 'এখনও ঠিক যেন বুঝতে পারছি না। সেইটেই জানতে চাই—যা জানলে এ জীবনে আর কিছু জানার থাকে না। এক-একসময় মনে হয় এই বিপুল সৃষ্টিরহস্যকে জানাই বুঝি সেই জানা; এর ওপরে আর কোন জ্ঞান নেই, থাকতে পারে না। আবার মনে হয়

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ধ্যানে কল্পনায় ইচ্ছায় সম্ভব হয়েছে তাঁকে জানার চেষ্টা না ক'রে এই সৃষ্টির মায়ারণ্যে ঘুরে বেড়াই কেন!'

'তা যদি বলো', রঘুবীর বলেন, 'সামনে বিরাট হিমবন্ত থাকতে কে আর বল্মীক স্তূপ নিয়ে মাথা ঘামায়।'

'কিন্তু তাই কি!' বিশ্বেশ্বরের ললাটে ভ্রূকুটি ঘনবদ্ধ হয়ে ওঠে, 'মনে হয় ঈশ্বর কি তাঁর এই সৃষ্টির মধ্যেই প্রকট নন! তাঁর ইচ্ছায় যা হয়েছে—তাঁর লীলা এটা—এর মধ্যেই তাঁকেও খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি আমার মধ্যেই অবস্থান করছেন—শাস্ত্রকাররা বলেন। তিনিই জীবাত্মা তিনিই পরমাত্মা। কিন্তু এ ছাড়াও কি তাঁর অস্তিত্ব নেই? কেউ কেউ বলেন তাও আছে। সে ক্ষেত্রে কি ভাবে কেমন ক'রে তাঁকে পাওয়া যাবে, তাঁকে পেয়েছি কিনা তাই বা কেমন ক'রে বুঝব!' যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেন বিশ্বেশ্বর।

'কী বলছ তুমি কিছুই বুঝি না। তোমার বক্তব্য যেন তোমার কাছেও স্পষ্ট নয়।'

'ঠিকই বলেছ ভাই। আমার মার আশঙ্কা অধিক অধ্যয়নে আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। তিনি আমাকে দীক্ষা নিতে বলেন তাই। কি খুঁজছি—কোন্‌টা সেই পরম সত্য, কোন্‌টা পরম প্রাপ্তি—তা কি জানাও এত সহজ। তা জানতে পারলে আর এত অস্থিরতা কেন, এত অশান্তিই বা কিসের!'

বলতে বলতে মৌন হয়ে যান বিশ্বেশ্বর। তারপর কিছুক্ষণ স্থির নিস্তব্ধ থাকার পর সহসাই যেন তন্দ্রাচ্ছন্নতা থেকে জাগ্রত বাস্তবে ফিরে এসে বলে ওঠেন, 'নাও ভাই, এবার নৌকো ফেরাও। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, রাত্রি এসে গেছে। গৃহদেবতার আরতি হ'ল না এখনও, মা নিশ্চয় অস্থির হচ্ছেন, অদৃষ্টে তিরস্কার আছে। এসব অলস চিন্তা—এর শেষ নেই। এর জন্যে কর্তব্যে ত্রুটি ঘটা উচিত নয়।'

রঘুবীর সবলে নৌকা চালনা করেন ঘাটের দিকে।

॥ ২ ॥

বিশ্বেশ্বরের জননী ইন্দ্রাণী দেবী সত্যই উদ্বিগ্ন হয়ে গৃহদ্বারে অপেক্ষা করছিলেন। বধূ মাধবী সন্ধ্যাকৃত্য—যা তাঁর দ্বারা সম্ভব: তুলসীমঞ্চ মার্জনা, সেখানে এবং

ঠাকুরঘরে প্রদীপদান, গৃহদ্বারে জলসিঞ্চন, শঙ্খধ্বনি—সমস্তই সমাপন করেছেন। কিন্তু দেবসেবা তো তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। সে কর্তব্যে বহু বিলম্ব ঘটছে—সেজন্য তাঁরও ব্যাকুলতার অন্ত নেই, একটু দুশ্চিন্তাও যোগ হয়েছে সেই সঙ্গে। তাঁর স্বামী তো কর্তব্য বিষয়ে উদাসীন নন এমন—শ্রীশ্রীজানকীনাথ এখনও অনর্চিত : সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে বসেছে, তাঁর আরতি হ'ল না এখনও—বোধ করি নৈশ ভোগ নিবেদন করারও সময় পার হয়ে এল—তবু তিনি ফিরছেন না কেন ?

ইদানীং দুই বেলাই গঙ্গাতীরে গিয়ে অনেকটা সময়ক্ষেপ করছেন—এটা লক্ষ্য করেছেন মাধবী। কী যেন এক কুটিল চিন্তা অহরহ তাঁকে পীড়িত করছে—তাও বুঝতে পারেন। এ অবস্থায়—অন্যমনস্ক হয়ে স্নান করতে নেমে কোন বিপদ বাধান নি তো !

সম্ভাবনাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শিউরে ওঠেন তিনি।

অবশ্য তখনই মনে পড়ে—বহু চিন্তার ফল সদ্য-সমাপ্ত গ্রন্থখানিও সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন বিশ্বেশ্বর। হয়ত নিজেই কোথাও নির্জনে বসে পরিমার্জনা করার ইচ্ছা, কিংবা বন্ধু কেশব গুপ্তকে গিয়ে দেখাবেন বলেই নিয়ে গেছেন। সেজন্যও বিলম্ব হ'তে পারে। তবু—

না, মনের অস্থিরতা যায় না কিছুতে।

ইন্দ্রাণীর মতো, মাধবীর বহির্দ্বারে যাওয়া সম্ভব নয়, অগত্যা দাওয়াতেই একটি খুঁটি ধরে বিবর্ণ মুখে অপেক্ষা করছেন। প্রকাশ্যে কোন চাঞ্চল্য নেই—অন্তরে নানা আশঙ্কার উত্তাল তরঙ্গ।

ইন্দ্রাণী অকারণেই প্রদীপ হাতে দরজা পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। অকারণ এই জন্য যে, বাতাসে প্রদীপ নিভে যাওয়ার মতো হবে—সে তো জানা কথাই, সেজন্য হাত দিয়ে তার শিখাকে আড়াল করতে হয়েছে। সে আলোতে বাইরে কিছু দেখা যায় না, বিশেষত কিছু দূরের পথে দৃষ্টি কাজ করে না। বরং অন্ধকার যেন আরও ঘন বোধ হয়।

'মা।'

অতি পরিচিত, মধুর গম্ভীর কণ্ঠের ডাক।

মা ও তাঁর বধূ দুজনেই চমকে উঠলেন। বধূর রোমাঞ্চ হ'ল। মা আর একটু এগিয়ে যেতে যেতে বলে উঠলেন, 'বিশাই, এলি !'

তারপর, উৎকণ্ঠা দূর হ'তে উষ্মা দেখা দিল।

'দিন দিন তোর এ কি হচ্ছে বিশাই! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রির প্রথম প্রহরও যেতে বসেছে, জানকীনাথ আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন! এতই যদি অনিচ্ছা, একজন পূজারীর ব্যবস্থাই করো না! গৃহদেবতার অর্চনায় অবহেলা করলে সেবা-অপরাধ লাগে—শুধু একজনের উপর নয়, সেবকের বংশেই। এত লেখাপড়া করেছ, এটা জানো না?'

সময়ের হিসাবে অতিশয়োক্তি নিয়ে তর্ক করার এ সময় নয়। বিশ্বেশ্বর একেবারেই দুই হাত জোড় করলেন, 'অপরাধ হয়ে গেছে মা। আর কখনও যাতে এমন না হয়—এবার থেকে তা স্মরণে রাখব।'

তারপর বহিরাঙ্গণে আসতে আসতে হেসে বললেন, 'কিন্তু মা, আমাদেরই দিন আসে, রাত্রি হয়, এই মর্তের মানুষদের—জানকীনাথের দিনই বা কি, রাত্রিই বা কি? ঈশ্বর কি এ হিসাবের বাইরে নন? ব্রহ্মার পলকপাতে আমাদের বর্ষ পার হয়ে যায়—পুরাণে বলে, তাঁর একদিনে আমাদের চার যুগ, এমন বহু হিসেব বহু পুরাণকার দিয়েছেন—তাই না?'

'তাতে কি!' ইন্দ্রাণী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'আমাদের আত্মবৎ সেবা। আমরা আমাদের মতোই সেবা করব।'

'আমি তো সেই কথাই বলতে চাইছি মা! আত্মবৎ সেবা, আমরা কি প্রত্যহ প্রহর দণ্ড পল ধরে আহার নিদ্রা সারি? প্রতিদিন একই সময় তুমি আমাদের খেতে দাও? আর তাহলে আরতিই বা কেন? কই, আমরা তো গুরুজনকে আরতি করি না—ঠিক সন্ধ্যা ধরে? তাহলে জানকীনাথের সঙ্গে তোমাকেও আরতি করা উচিত আমার!'

'ঐ! আরম্ভ হয়ে গেল পাগলামি। যা দেখি—যা করতে হবে সেরে নে। ভগবানের সঙ্গে আমাদের একত্র নাম করলে অপরাধ হয়। ওসব কথা পরিহাস ছলেও বলতে নেই।'

বিশ্বেশ্বর মার ক্রুদ্ধ—অথচ পুত্রের পাণ্ডিত্যগর্বে উদ্ভাসিত—মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে দাওয়ায় উঠে যান।

মাধবী পূর্বেই স্বামীর পট্টবস্ত্র, চীনাংশুকের উত্তরীয় প্রস্তুত রেখে ছিলেন, সেই সঙ্গে দাওয়ারই একপ্রান্তে মার্জনা-উজ্জ্বল কাটোয়ার একটি ছোট ঘড়ায় হাত-পা ধোবার জল।

'আমি খুব ভাবছিলাম।' ঘড়া থেকে স্বামীর হাতে জল ঢেলে দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে বলেন মাধবী।

'কেন?' একটু বিস্মিত হয়েই তাকান স্ত্রীর আনত মুখের দিকে।

'আপনি আজকাল যা অন্যমনস্ক হয়ে থাকেন সর্বদা। দিবারাত্রিই যেন কিসের চিন্তায় ডুবে থাকেন।...এই অবস্থায় যদি জলে নামেন—'

কথা শেষ করা যায় না। অবসিত আশঙ্কাতেও—মহাবিপদের সম্ভাবনা স্মরণে পড়ে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে।

ততক্ষণে বিশ্বেশ্বরের হাত ধোয়া শেষ হয়ে গেছে।

মাধবী নিজেই অতি প্রিয় এবং আকাঙ্ক্ষিত পা দুটি ধুয়ে অঙ্গমার্জনী দিয়ে মুছিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বলে তাঁর চোখের জলটা বিশাইয়ের চোখে পড়ল না, তবে সেটা তিনি অনুমান করতে পারলেন। সস্নেহকণ্ঠে বললেন, 'পাগল! আমি কি স্নানের বেশে গেছি। আর এ সময়ে স্নান করিও তো কদাচিৎ।'

'না, তবু মন যে মানে না। তবে—' বলতে বলতেই, যে আশ্বাস ধরে এতক্ষণ মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেছেন, সে তথ্যটা মনে পড়ে যায়, 'আপনার পুঁথি?'

'সে কথা পরে বলব।' সংক্ষেপে উত্তর দেবার দায়িত্ব এড়িয়ে বিশ্বেশ্বর পূজার ঘরে গিয়ে আসনের উপর থেকে পট্টবস্ত্র তুলে নেন। এমনিতেই পূজার বহু বিলম্ব হয়ে গেছে বুঝে মাধবীও আর পীড়াপীড়ি করেন না। তা ছাড়া পণ্ডিত স্বামী সম্বন্ধে নববধূর ভীতি-মিশ্রিত সম্ভ্রমবোধ এখনও বিদূরিত হয় নি। সে অবসরও দেন নি স্বামী—একই প্রসঙ্গে তাঁর উত্তরের উপর প্রতিপ্রশ্ন করতে সাহসে কুলোয় না।

আরতি ও নিজের সান্ধ্য গায়ত্রী শেষ ক'রে বিশ্বেশ্বর ধ্যানে বসলেন।

রঘুকুলতিলক জানকীনাথের মূর্তি তাঁর সম্মুখে, তা ছাড়াও পিছনের প্রাচীর-গাত্রে সীতা-রামের একটি পটও বিলম্বিত আছে। এই পটে অঙ্কিত মূর্তিটিই বিশ্বেশ্বরের বেশী পছন্দ। পটুয়া সুনিপুণ হস্তে নবদূর্বাদল-শ্যামকান্তি ফুটিয়ে তুলেছেন। কোন্ উপাদানে এই রঙ প্রস্তুত করেছেন কে জানে—ঠিক বাল্মীকি-বর্ণিত বর্ণই প্রকাশ পেয়েছে। অঙ্কিত মূর্তির দৃষ্টিতে একই সঙ্গে যেন বর ও

অভয় ফুটে উঠেছে। প্রসন্ন মুখে লাবণ্যর সঙ্গে দার্ঢ্য ও শক্তির এক অবর্ণনীয় মিলন ঘটেছে।

বিশ্বেশ্বর সাধারণত এই মূর্তিটিই ধ্যানে আনার চেষ্টা করেন, এক-একদিন সে প্রয়াসের একাগ্রতায় ঐ পটাঙ্কিত মূর্তি তাঁর মানসভূমিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। আবার কোন কোন দিন কিছুতেই সে তন্ময়তা আসে না।

আজও এল না। বহু চেষ্টাতেই সে ধ্যানমূর্তিকে ধারণায় ধরতে পারলেন না।

কেন এমন হয়? ইদানীং যেন এই ব্যর্থতার ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এ কী হ'ল তাঁর?

ধ্যানে আনতে পারলেন না, সেটাই যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ—কিন্তু তার সঙ্গে আর একটা তীব্র অপরাধবোধের কারণও যোগ হচ্ছে এই সব দিনগুলিতে।

সে তীব্রতা বেদনায় পরিণত হয়ে, ধ্যান-প্রচেষ্টা বিসর্জন দিয়ে আসন পরিত্যাগ করার পরও তাঁকে পীড়ন করতে থাকে।

ভগবদ্ভক্তি চিত্তে প্রভাসিত হচ্ছে না—সেটাই যথেষ্ট অন্যায়, তাঁর মতো ব্যক্তির পক্ষে অপরাধ তো বটেই, তার সঙ্গে একটা বৃহত্তর অন্যায়—যা পাপেরই নামান্তর—তা হ'ল, সে স্থানে একটি মানুষের মূর্তিই ফুটে উঠছে। অতি সাধারণ একটি মানুষ।

কিন্তু সে মানুষটি বিশ্বেশ্বরের বড় প্রিয়।

বড় দুর্বার আকর্ষণে ওঁকে টানে ঐ মানুষটি।

ওঁর সহাধ্যায়ী কেশব গুপ্ত।

ওঁর থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ, ভাল ছাত্র হ'লেও বিশ্বেশ্বরের মতো মেধা, শাস্ত্রমর্মার্থ আয়ত্ত বা হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি কি সাধ্য তাঁর নেই; অপর নির্বোধ বা স্মৃতিশক্তি-হীন ছাত্র থেকে ঈষৎ উচ্চস্তরের—এই মাত্র।

এ আকর্ষণের হেতু অন্য।

শ্যামবর্ণ মানুষটি, দোহারা আকৃতি, বক্ষ ও স্কন্ধ সুগঠিত, চক্ষু দুটি আয়ত, তার দৃষ্টিতে এক অতল গভীরতা।

একদিন সহসাই মনে প্রশ্ন জেগেছিল, শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণ কি এই রকমই দেখতে ছিলেন না?

নিশ্চয়ই তাই—অন্তত রামায়ণে বা শ্রীমদ্ভাগবতে তো এই রকমই বর্ণনা

পাওয়া যায়। নবদুর্বাদল-শ্যাম বা নবীননীরদকান্তি—কবিরা তো এই উপমাই দিয়েছেন।

ইদানীং বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর বিশ্বেশ্বর বুঝেছেন শ্রীভগবানের ধারণার মধ্যে একটা অনতিক্রম্য অন্ধকারময় ব্যবধান আছে। মানুষের প্রজ্ঞা-অনুভূতি-অধ্যয়ন, বিচার-বিশ্লেষণ শক্তি—ঈশ্বরের চিন্তা বা তাঁকে ধারণা করার, তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করার যতই সাধনা বা চেষ্টা করুক, সে প্রচেষ্টা যতই উগ্র যত একাগ্র হোক—কিছুদূর গিয়ে তা যেন কোন এক নিরন্ধ্র পাষাণপ্রাচীরে প্রতিহত হয়, শেষ পর্যন্ত তা সেই পরম লক্ষ্যে, সার্থকতায় পৌছতে পারে না; অর্থাৎ সেই এক অদৃশ্য শক্তি যা অনাদি বা অনন্ত,—যাকে কেউ 'পুরুষ' কেউ 'প্রকৃতি' কেউ বা দুইয়ের সমন্বয় বলে বর্ণনা করেছেন, কেউ বা বলেছেন এ সকলের অতীত নিরাকার ব্রহ্ম—তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের, রূপের—মানুষের ক্ষুদ্র ধারণার মধ্যে ধারণ করার মতো কোন আকৃতির (মানুষের) বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারেন নি।

না, কোন পণ্ডিতই পারেন নি। স্বয়ং শঙ্করও পারেন নি। তাঁকেও এক জায়গায় গিয়ে বাগ্‌জাল-বিস্তারের আশ্রয় নিয়ে থামতে হয়েছে।

বহু যুক্তি, ক্ষুরধার, গভীর চিন্তাপ্রসূত বাক্য রচনা করেছেন এই সব মহান শক্তিধর মানুষরা, কিন্তু তার দ্বারা সেই অচিন্ত্য ঈশ্বর চিন্তাগ্রাহ্য হতে পারেন নি, তাঁকে প্রত্যক্ষ করাতে পারেন নি। পারেন নি তার কারণ সে সব মানুষেরই চিন্তা, তা ঐ দেহ ও মস্তিষ্ক-কোষের মধ্যেই সীমিত। পুরুষ বা প্রকৃতি—সেও তো মানুষেরই বর্ণনা, নয় কি? তিনি তাঁর বিশাল সৃষ্টির মধ্যে, সীমাহীন অনন্তের মধ্যে ওতঃপ্রোত হয়ে আছেন, না তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে—কে বলতে পারে?

এক-একজন নিজের মতো ক'রে যুক্তিজাল দিয়ে, সে যুক্তিকে বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছেন বা নিশ্চিত হয়েছেন। তাঁরা সেই সিদ্ধান্ততেই বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন—কিন্তু সে বিশ্বাসকে বিশ্বেশ্বর কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন নি।

মানুষ সে অনন্তকে, নিরাকারকে ধারণা করতে পারে না বলেই এক এক লোকোত্তর চরিত্রের মহান মানুষকে অবতার বা মানুষের দেহধারী ঈশ্বরের অংশ বলে ভাবতে চেয়েছে, তাঁদের পূজা ক'রে ঈশ্বর সেবার সাধ মেটাতে চেয়েছে।

সেই ভাল। সেই অনেক অনেক ভাল।

আজকাল এই কথাটাই মনে হয় ওঁর—ভগবানের এই সৃষ্টির মধ্যে তাঁর যে রূপ প্রকট, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—তাঁর অস্তিত্বের কণামাত্র হয়ত, অণু-পরমাণু বা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন ভগ্নাংশ—তার মধ্যেই তাঁকে পাবার চেষ্টা করা ভাল। আর সে সৃষ্টির মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সার্থকতর আর কি আছে? সেই মানুষকে ভালবাসলে, তাকে পূজা, তার সেবা করতে পারলে হয়ত সকল মন-বুদ্ধি-বিচারের অতীত সেই পরমসাধ্য পরমারাধ্যকে পাওয়া যেতে পারে, সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে একদিন স্রষ্টার কাছে পৌছনো—এই বুঝি তাঁকে পাবার একমাত্র পথ!

তবু এই কি কেশবকে এত ভালবাসবার একমাত্র কারণ?

এইভাবে যুক্তি দিয়ে, এত বিচার-বিবেচনা ক'রে ভালবেসেছেন উনি?

কে জানে। কিছুই যেন বোঝেন না এই উদগ্র আকর্ষণের কারণ। শুধু মনে হয় ঐ অতি সাধারণ মানুষটি প্রতিদিন প্রিয় থেকে প্রিয়তর হয়ে উঠছে। যেন ওঁর মনের মধ্যেকার ইষ্টের আসনটি অধিকার করতে চাইছে। এ কী হ'ল তাঁর?

সত্যিই কি তিনি পাগল হয়ে যাবেন? যাচ্ছেন?

না হলে এসব মাথামুণ্ডু ভাবছেন কেন ইদানীং। ঐ যে যারা বলে অতিরিক্ত অধ্যয়নে আর শাস্ত্রচর্চায় তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে – তাদের কথাই কি তাহ'লে সত্য!···

অস্থির হয়ে উঠে পড়তে যাচ্ছেন—পরিবেশ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত হয়েই—ইন্দ্রাণী দেবী নৈশ ভোগ বা শীতলের উপকরণ নিয়ে উপস্থিত হলেন। কখন মাধবী গঙ্গাজলে সে স্থান মার্জনা ক'রে গেছেন, তা বুঝতেও পারেন নি বিশ্বেশ্বর, এখন ইন্দ্রাণীকে ভোগ নামাতে দেখে বুঝলেন।

দুধ, ফল ও বাতাসা। এর বেশী আয়োজনের ক্ষমতা তাঁদের নেই। পণ্ডিতের বংশ তাঁদের—পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যে পরিমাণ, আর্থিক সঙ্গতি সেই পরিমাণই স্বল্প। কোন কালেই তেমন ছিল না, এখন তো বরং আরও কমেছে। কারণ বিশ্বেশ্বর সাংসারিক বা বৈষয়িক বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। উত্তর-পূর্ববঙ্গে তাঁদের কিছু শিষ্য আছে, ব্রহ্মোত্তর জমিও আছে—সেখানে ঘুরে এলে কিছু প্রাপ্তি হ'তে পারে—সেই কদিনের সময়ও বিশ্বেশ্বর ক'রে উঠতে পারছেন না।···

মনে মনে জানকীনাথের কাছে মার্জনা ভিক্ষা ক'রে অনুতপ্ত বিশ্বেশ্বর পুনশ্চ

আচমন ক'রে নিয়ে দেবার্চনায় মন দিলেন।

ভোগ নিবেদন—শয়ন আরতি শেষ হলে ইন্দ্রাণী প্রসাদ সরিয়ে সে স্থান মুছে নিলেন। বিশ্বেশ্বরও শয়নের মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ ক'রে একেবারে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন।

আকাশের দিকে চেয়ে নক্ষত্রাদির অবস্থান দেখে বুঝলেন এখনও প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হ'তে বিলম্ব আছে। ইন্দ্রাণী দেবসেবার কাজ শেষ ক'রে এইমাত্র রন্ধন-গৃহে ঢুকেছেন। এ ভার তিনি এখনও বধূকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নন। প্রথমত তাঁর ধারণা বিশাইয়ের মনোমতো ব্যঞ্জন তিনি ছাড়া কেউ রাঁধতে পারবে না; দ্বিতীয়ত বধূ এখনও বালিকা—তাকে আগুনের কাছে যেতে দেওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ এখনও ভোজনের বহু বিলম্ব। এমনিই প্রত্যহ থাকে। অন্যদিন এই সময়টা গ্রন্থ পাঠ বা রচনায় অতিবাহিত করেন। ইদানীং মধ্যে মধ্যেই তার অন্যথা হচ্ছে, এক-একদিন সহসাই কেশবের গৃহে চলে যান, হয়ত তাঁর কাজের ক্ষতি হয়, তা বুঝেও না গিয়ে থাকতে পারেন না।

ঘরে গিয়ে পট্টবস্ত্র ত্যাগ ক'রে সূতীর উত্তরীয়খানা কাঁধে ফেলে স্ত্রীর দিকে না চেয়েই বলেন, 'আমি একটু ঘুরে আসছি—'

'কোথা থেকে?' প্রশ্নটা যেন আপনিই বেরিয়ে যায়, 'বৈদ্য বড়ঠাকুরের বাড়ি থেকে?'

অনাত্মীয় হ'লেও—বড়ঠাকুর সম্বন্ধ পাতালে আর নাম ধরা যায় না।

বিশ্বেশ্বর ভাবেন অন্য কথা।

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে কি ব্যঙ্গ? না অনুযোগ?

স্বাভাবিক যে নয় তা বোঝা গেল অন্তত।

এর যে কারণ আছে তাও তিনি জানেন। বহু কথাই নিশ্চয় মাধবীর কানে এসে পৌঁছয়। এবং সে কি শ্রেণীর কথা তাও অনবগত নন বিশ্বেশ্বর।

সে জন্যেই মাধবীর কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা বা বক্রতা লক্ষ্য করেন। আর কতকটা সে জন্যেই—সেই অশ্রুত অব্যক্ত ধিক্কারের প্রতিবাদেই বিশ্বেশ্বর সহসা রূঢ় হয়ে ওঠেন।

'হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি। [illegible] আছে যেতে?'

মাধবী সে রূঢ়ত[illegible] হয়ে যান। [illegible] পুষ্পের মতোই—শুধু মুখখানি

নয়, যেন সমস্ত দেহ শুষ্ক সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। ভীতিও বোধ করেন। নিরুত্তরে অপরাধিনীর মতো দ্রুত পাকশালার মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করেন।

॥ ৩ ॥

কেশবের গৃহে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই রওনা দিয়েছিলেন, যে কথা এই মাত্র কঠিন কণ্ঠে স্ত্রীর কাছে ঘোষণা ক'রে এলেন তা মিথ্যা নয়—তবু, ঠিক তখনই, কে জানে কেন, সে দিকে গেলেন না। অথবা যেতে পারলেন না।

বহুক্ষণ অবধি পথে পথেই ঘুরলেন। পথ তখনও একেবারে জনবিরল হয় নি, দু-চারজন পরিচিত পথিক তাঁর দিকে বিস্মিত নেত্রে চেয়েও দেখলেন—কিন্তু সে সব তথ্য তখন বিশ্বেশ্বরের লক্ষ্যে পড়ার কথা নয়।

মনে বিপুল ঝড় উঠেছে। একটি নয়—একাধিক।

মাধবীর অব্যক্ত অভিযোগটা তাঁকে একটু বুঝি আঘাতও করেছে। যে বালিকা তাঁর সম্বন্ধে এখনও সম্ভ্রম-মুগ্ধ—সম্ভ্রম-সন্ত্রস্ত বললেও অন্যায় হয় না—তার কণ্ঠে ঐ, অনুযোগ কেবল নয়—অভিযোগেরও স্বর ফুটে উঠতে দেখেই বিস্মিত হয়েছেন, আহত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই আত্মচিন্তা আত্মবিশ্লেষণ আরম্ভ হয়েছে মনে মনে।

কেশব সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব যে আসক্তির পর্যায়ে পৌঁছেছে—সে বিষয়ে তিনি একেবারে অনবহিত নন।

আজকাল নিভৃতে কোন কথা চিন্তা করতে গেলে—বিশেষ সে চিন্তা ঈশ্বরে নিবদ্ধ করতে গেলে প্রায়ই একটি মানুষের—কেশবের মূর্তিই মানসপটে জেগে ওঠে। এ জন্য কুণ্ঠা ও অপরাধবোধের সীমা নেই, সঙ্গে সঙ্গেই সে বিষয়ে সচেতন ও সক্রিয় হয়ে ওঠেন, অন্য চিন্তায় নিবিষ্ট হতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আবারও, ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। মনকে শাসন করেন কিন্তু আয়ত্তে আনতে পারেন না।

এক এক সময় মনে হয়, ঐ মানুষটি দিবারাত্র তাঁর সহচর বা সঙ্গী হয়ে থাকলেই তাঁর মনের ইদানীংকার শূন্যতা দূর হ'তে পারে। একান্ত ভাবে কেশব ওঁর হোন, ওঁর অন্তরের মধ্যে উনি একক, নিঃসপত্ন হয়ে বিরাজ করুন—তাহলেই হয়ত উনি শান্তি পাবেন। আর কাউকে প্রয়োজন হবে না।

আবার কখনও কখনও—প্রায় ঐ মনোভাব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই—পরিতাপের সীমা থাকে না। এ কি করছেন তিনি, ঈশ্বরের প্রাপ্য ও নির্দিষ্ট স্থানে মানুষকে বসাতে চাইছেন! ধিক!

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন, নবদূর্বাদলশ্যাম জানকীনাথকেই সে আসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত করবেন, অপর কারও সাধারণ সামান্য মানুষের সেখানে প্রবেশাধিকার থাকবে না।

কিন্তু পারেন না সে প্রতিজ্ঞা রাখতে।

আবারও সেই সাধারণ মানুষটিই এক দুর্বার বলে ওঁকে আকর্ষণ করেন, তার সান্নিধ্যে না গিয়েও থাকতে পারেন না।

আর গেলেই সব চিন্তা, সব বিচার-বিবেচনা-প্রতিজ্ঞা কোথায় আবেগের বন্যায় ভেসে যায়।

কেশবকে না দেখে থাকতে পারেন না, দেখেও সাধ মেটে না। আর শুধুই কি দেখা?

তাঁর ললাটে স্বেদকণা দেখা দিলে বিশ্বেশ্বর নিজে তালবৃন্ত দিয়ে বাতাস করেন, অপর কাউকে করতে দেন না। কোন কোন দিন দ্বিপ্রহরেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে কেশবের গৃহে উপস্থিত হন। কেশবকে নিদ্রিত দেখলে তাঁকে ডাকেন না, শুধু একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন মুখের দিকে।

আবার কখনও বা আবেগ অসম্বরণীয় হ'লে গাত্রসেবা, এমন কি পদসেবা করতে যান। কেশব ব্যস্ত হন, বাধা দেন। বলেন, 'করো কি, করো কি! তুমি কি পাগল হলে!'

'কেন, তা বলছ কেন! এতে দোষ কি। তুমি আমার থেকে বয়সে বড় নও?'

'তাতে কি হয়। তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আমি বৈদ্য।'

অধীর বিশ্বেশ্বর বলেন, 'তা জানি না। তোমার সেবা করতে পারলে আমার আনন্দ হয়। আর বর্ণ সৃষ্টি হয়েছিল তো গুণ-কর্ম ভেদে, এ একটা কৃত্রিম ব্যবধান—তাই নয় কি? তুমি তো ন্যায়-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এটা বোঝ না!'

এ ধরনের আবেগ হয়ত প্রাত্যহিক নয়, পূর্ণিমার জোয়ারের মতোই সাময়িক। তবু তা ঐ জোয়ারের মতোই প্রবল, উদ্দাম, ও বুঝি উন্মত্তও—তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। এক এক সময় যখন কেশবকে দেখার ইচ্ছা অদম্য হয়ে

ওঠে – তখন যেন কোন জ্ঞানই থাকে না ।

কিন্তু আজকের এ ভাবান্তর অন্য দিনের সচেতনতার মতো সাময়িক অনুতাপ কি আত্মতিরস্কার নয় —আজ মন একটা প্রচণ্ড নাড়া পেয়েছে।

তবে শুধু স্ত্রীর আবরিত তিরস্কারই তার কারণ নয়।

মনে অন্য একটা চিন্তা অতিমাত্রায় বেগবান হয়ে উঠেছে। কত যে বেগবান —তা আজ এইমাত্র কিছু পূর্বে, এই সন্ধ্যাতেই অনুভব করলেন। বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করতে করতেই।

ঈশ্বরকে পেতে হবে। তাঁকে ভালবাসতে হবে।

সেই ভাবেই পেতে চান উনি। ভালবেসে। যেমন ভাবে রক্তমাংসের মানুষ, আর একটা মানুষকে ভালবাসে।

মনুষ্য রূপে, দেহধারী রূপে।

বেদান্তবাদীদের সিদ্ধান্তে পৌছনো সহজ নয়। আদৌ সম্ভব কিনা সন্দেহ। সে সিদ্ধান্ত তো শুধুই তর্কবিতর্ক, পাণ্ডিত্যের আস্ফালন। নিরাকার, নির্গুণ অনাদি ও অনন্ত ঈশ্বরকে ঠিক মনের মধ্যে কি ওঁরাই অনুভব করতে পারেন! ঐ পণ্ডিত আর মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা?

হয়ত পারেন কেউ কেউ। হয়ত শঙ্কর পেরেছিলেন।

কিন্তু সে কজন!

না, তাতে ওঁর মন ভরবে না। উনি চানও না সে ভাবে ভাবতে ভাবতে। উনি চান ভালবাসতে, প্রেমময় রূপে, রক্ষাকর্তা রূপে চান। ভালবাসবেন, ভালবেসে ভালবাসা আদায় করবেন। পিতারূপে, জননীরূপে, ভার্যারূপে, দয়িত-রূপে, সন্তানরূপে—নানা রসের সরোবর রয়েছে চারিদিকে, সবগুলি ভালবাসার অমৃতে পূর্ণ—তাতে অবগাহন না করে—শুধু তা সত্য কিনা সে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তর্কবিতর্ক কেন করতে যাবে মানুষ।

ঈশ্বরই বা কেন তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যে সেই রূপ ধরে এসে ধরা দেবেন না? তাঁরই সৃষ্টি—প্রেম, স্নেহ—যার তুল্য মধুর কিছু কল্পনা করা যায় না —যা জননী-রূপে মানুষকে জীবনধারায় লালন করে, সঞ্জীবনী শক্তি দেয়; পুরুষ ও নারীর জীবনে যা এক অবর্ণনীয় সেতু রচনা করে, অনির্বচনীয় মাধুর্য এনে জীবনকে আকর্ষক, অর্থবহ ক'রে তোলে—পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে যা সৃষ্টিকে প্রবাহিত ক'রে দেয়। মানুষের জীবনের সেই প্রেমের লীলা ও রস তিনি নিজে উপভোগ

করবেন না কেন ?

এ-ই ভাবেই পেতে হবে তাঁকে। তিনি পাবেনও।

এমনিই একটি পুরুষ চাই তাঁর। মহান কোন মানুষ। মহত্তর—না, মহত্তম। যাকে ভালবেসে তাঁর এ দেহ ধারণ সার্থক হবে, তিনি ধন্য হবেন। সে ভালবাসার মধ্যে কোন ফাঁক কি ফাঁকি থাকলে চলবে না, কোন খাদ তিনি মিশতে দেবেন না !

সেই নিখাদ ভালবাসার আকর্ষণে তিনি ঈশ্বরকে ধরবেন।

হ্যাঁ, ঈশ্বরকেই চাই তাঁর।

সেই তাঁর লক্ষ্য। আচারে নয়, আচরণে নয়; অনুষ্ঠান কি শাস্ত্রের কচকচিতে নয়—তর্কবিতর্কে ঈশ্বর বহু দূরে চলে যান—লক্ষ্যে পৌঁছবেন তিনি ভালবাসার পথেই।

•

বহু রাত্রি পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন বিশ্বেশ্বর। গঙ্গার ধারেও গেলেন একবার। কোথাও শান্তি পেলেন না। শান্ত হ'তে পারলেন না। এ কী প্রবল অস্থিরতা, মাথার মধ্যে মনের মধ্যে এ কি আলোড়ন, এ কি প্রচণ্ড আবর্ত !

তিনি কি সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছেন ? যাবেনও ?

হে ঈশ্বর, যদি পাগল হনই—যেন তোমার জন্যে, তোমার প্রেমে পাগল হ'তে পারেন।

অবশেষে একসময়, প্রায় প্রহরকাল উত্তীর্ণ হ'লে ক্লান্ত পা দুটি তার অভ্যস্ত পথই ধরল। সহসাই চেয়ে দেখলেন তিনি কেশবের গৃহেই এসে পৌঁছেছেন। বিভ্রান্ত বা উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কের কাছ থেকে কোন নির্দেশ না পেয়ে পদযুগল কখন তাদের অভ্যস্ত পথই ধরেছে—উনি বুঝতেও পারেন নি।

না, উচিত হয় নি আর এখানে আসা, এত রাত্রে। আপন মনেই ভ্রূকুটি ক'রে যেন মনকে শাসন করেন বিশ্বেশ্বর। ইন্দ্রাণীদেবী নিশ্চয় এতক্ষণ রন্ধনপর্ব শেষ ক'রে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঁর অপেক্ষা করছেন।

বোধ করি ওঁরই সৌভাগ্যক্রমে কেশব তখন বাড়িতে ছিলেন না। কোথায় এক আত্মীয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে তাকে দেখতে গিয়েছেন—সন্ধ্যারও কিছু পরে। অন্তত এক ক্রোশ পথ—কেশবের জননী জানালেন, ফিরতে বিলম্ব হবে।

মধ্যরাত্রির পূর্বে ফিরতে পারবেন বলে মনে হয় না।

আর অপেক্ষা করার কোন কারণ নেই। ইচ্ছাও না।

বিশ্বেশ্বর কেশবের মাতৃদেবীর সঙ্গে আর অল্প দু একটি কথা বলে নিজ গৃহের পথই ধরলেন। কথা বেশি বলতেও সাহস হচ্ছে না তখন, কি জানি—যদি অপ্রাসঙ্গিক বা পারম্পর্যহীন কিছু বলে ফেলেন!

কেশবের গৃহ থেকে ওঁর গৃহের ব্যবধান বেশি নয়, কিন্তু পথ গিয়েছে অনেকটা ঘুরে। অথচ কেশবদের বাগানের মধ্য দিয়ে গেলে ওঁদের বাড়ির পিছন দিকের বাগানে গিয়ে পড়া যায় খুব সহজে। এদিকটা জনবিরলও বটে। এত রাত্রে, এই ক্রমাগত অকারণ পথে পথে ঘোরার ফলে ক্লান্তিও বোধ করছেন—এখন আর ঘুরে যেতে ইচ্ছা হ'ল না। অন্যদিনও আলাপ-আলোচনায় রাত গভীর হয়ে এলে এই বিজন এবং সংক্ষিপ্ত পথই ধরেন।

ভালও লাগে বিশ্বেশ্বরের।

কয়েক বিঘা ভূখণ্ডব্যাপী এই বাগানটি দীর্ঘকালের। বিশাল প্রাচীন কতকগুলি বৃক্ষ চারিদিকে অনেকখানি ছায়াঘন ক'রে রেখেছে। কতকাল ধরে ওরা এইভাবে আছে কে জানে, কত পুরুষ ধরে লোকে এর সুমিষ্ট ফল খেয়ে তৃপ্ত হয়েছে। আজও এরা নীরবে বিনা প্রতিবাদে ঈশ্বরের করুণা বহনের দায়িত্ব পালন ক'রে যাচ্ছে।

এ বিশ্বাস বিশ্বেশ্বরের আবাল্য। উনি মনে করেন না—এ যেন উনি অনুভব করেন—এইখানেই তাঁর করুণা প্রত্যক্ষ। সূর্যের তাপ, চন্দ্রের আলো, নদীর সুপেয় জলের মতোই এই ফলবহ পাদপগুলি তাঁরই সৃষ্ট মানুষকে শান্তি, তৃপ্তি, স্নিগ্ধতা এনে দিচ্ছে। জীবনও।

এখানের বৃক্ষতল দিয়ে যেতে যেতে প্রায় প্রতিদিনই এই চিন্তা মনে আসে তাঁর—সঙ্গে সঙ্গে একটা অপরিসীম শান্তি বোধ করেন, ঈশ্বরের করুণাকে মাতারই স্নেহ বলে মনে হয়।

আজও তার অন্যথা হ'ল না। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, সবে চন্দ্রোদয় ঘটেছে, তবু তারই আলো এই ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে কেমন এক বিচিত্র কারুকার্য রচনা ক'রে চলেছে, পত্রপল্লবের আন্দোলনে। তার কারণ শুধু চন্দ্রের অবস্থান পরিবর্তনই একমাত্র নয়, বাতাসও। মৃদু, খুবই মৃদু, তবু তাঁর পরিশ্রমস্বেদার্ত দেহের শ্রান্তি দূর করার পক্ষে যথেষ্ট—কিন্তু সেটা তাঁর কাছে বড় কথা নয়, সেদিকে

লক্ষ্যও নেই—এই বাতাসেই শাখাপত্রগুলি হিল্লোলিত হয়ে তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর আলোছায়ার আলিম্পনকে মুহূর্তে মুহূর্তে যেন নব নব রূপ এনে দিচ্ছে। তিনি সেই পরমাশ্চর্য শিল্পকর্মের মধ্যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর শক্তি দেখে চলেছেন দুই চোখ ভরে।

অকস্মাৎ কিন্তু সেই জাগ্রত স্বপ্নে, সে অনন্যসাধারণ পরম সৌন্দর্যানুভূতিতে ব্যাঘাত ঘটল।

একটি শ্বেত বস্ত্রাবৃত ছায়ামূর্তি যেন পাশের বিরাট পনসবৃক্ষের ছায়া থেকেই রূপ পরিগ্রহ ক'রে এসে তাঁর পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল।

ভয় পাবারই কথা।

অন্য যে কেউ হলেই ভয় পেত, কিন্তু ঐ অনুভূতিটি বিশ্বেশ্বরের স্বভাবে নেই, ওঁর স্নায়ু যেন একেবারে স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত। দেহী বা বিদেহী, মানুষ বা হিংস্র পশু কি সরীসৃপ—কাউকে ভয় করেন না তিনি কখনও।

যে এসেছিল সে অবশ্য বেশীক্ষণ অনুমান কি বিস্ময়-বোধের অবকাশও দিল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই তৃণপত্রাবৃত উদ্যানভূমিতে নতজানু হয়ে বসে ওঁর পায়ে প্রণাম জানাল।

সেও সাধারণ কোন প্রণাম নয়, দুটি পাদুকাহীন পায়ে মাথা রেখে বহুক্ষণ ধরে প্রণাম জানাল।

আর তাতেই—পলকপাত মাত্রে বিশ্বেশ্বর এই ছায়ামূর্তির পরিচয় পেয়ে গেলেন। এমন প্রণাম, শুধু পায়ে মাথা রেখেই নয়, ধূলিধূসর পায়ে মুখ ঘষে প্রণাম জানায় ওঁকে একটিই মাত্র প্রাণী—কেশবের বিধবা ভগ্নী, লক্ষ্মীমণি।

॥ ৪ ॥

বিশ্বেশ্বর তখনই কোন বাধা দেন না, ওকে নিরস্ত করার জন্য ব্যস্ত হন না। স্থির হয়ে থেকে লক্ষ্মীমণির এই আবেগ প্রশমিত হবার সময় দেন।

তিনি নিরতিশয় ক্লান্ত, দেহে ও মনে, দুই-ই।

চিন্তা যুক্তি আবেগের সংঘাতে কিছুটা বিভ্রান্তও। কি ঘটছে তাই যেন বুঝতে বিলম্ব হচ্ছে। তাছাড়া, এমন ঘটনা এই নতুন নয়। লক্ষ্মীমণি যখনই ওঁকে প্রণাম করে তখন এই ভাবেই করে। করে সর্বসমক্ষেই। এর মধ্যে যে

কোন সঙ্কোচের কারণ থাকতে পারে তা যেন ওর মাথাতেই যায় না।'

লক্ষ্মীমণি বাল্যবিধবা। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে সে বিধবা হয়েছে। তখন অত বোঝে নি কিছুই। শিশুকন্যার সঙ্গে শিশু পাত্রের বিবাহ হয়েছিল, মাত্র তিন-চার দিনের দেখাশুনো পরিচয়। এমন কি খেলার সাথী হয়ে ওঠারও অবসর মেলে নি।

বিবাহ মনে কোন রেখাপাত করতে না পারলেও বয়স তার কাজ করে গেছে। দেহধর্ম তার কার্যে বিরত থাকবে কেন? ফলে বয়স বেড়েছে, যৌবন পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে। নিজের পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে এবং বাহিরে—সংসারের পূর্ণ চিত্র, নরনারী সম্পর্ক তার মনে বিরাট শূন্যতাবোধ, ঈর্ষা ও ঈপ্সা জাগাবে এও স্বাভাবিক।

গুরুজনরা সে স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে শিক্ষায় উপদেশে অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করেছেন বৈকি! তার ফলও কিছু হয়েছে। সে নিত্যপূজায়, দীর্ঘায়ত জপে, ধর্মগ্রন্থ পাঠে—নিজের চিত্তকে স্থির রাখার চেষ্টা করেছে, করছেও। হয়ত বা সেই কারণেই অন্তরের বাসনা ও আবেগ এই ভগবৎ-চিন্তার মধ্যেই নিজ ইষ্টকে খুঁজে পেয়েছে। বিশ্বেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা কেন—পূজার মধ্যে দিয়েই নিজের ব্যথা বেদনা অন্তরের অস্থিরতা সে নিঃশেষে নিবেদন করতে চায়। তার অন্তরালে আর কোন আবেগ কাজ করে যাচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখে নি। সে অভিজ্ঞতা নেই বলেই ভাবে নি।

বিশ্বেশ্বর এ সমস্তই বোঝেন। তাই এই প্রণাম বা · · গ দৃষ্টিকটু হয়ে উঠলেও ওকে বাধা দেন না। আবাল্য লোক-মত ও লোক-লজ্জার ঊর্ধ্বে মানবতাবোধকেই স্থান দেন তিনি। এবং কেউ লোকলজ্জা লোকনিন্দা রীতি সংস্কার—এসবের দোহাই দিলে ক্ষুরধার অখণ্ডনীয় যুক্তিতে তাকে নীরব করে দেন।

আজও তাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এ পূজা গ্রহণ করলেন তিনি—এক সর্বরিক্তা তরুণীর ব্যথার পূজা, বেদনার ডালি।

অনেক, অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলল লক্ষ্মীমণি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে সেই মুহূর্তে ক্রমোর্ধ্বগতির প্রাকৃতিক নিয়মেই চন্দ্রকিরণের একটি সঙ্কীর্ণরেখা পনস বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার এক অন্তরাল থেকে ওঁর মুখে এসে পড়েছিল। দৃষ্টি নিরুদ্ধ অশ্রুতে অস্পষ্ট হ'লেও

ওঁর মুখের অপরিসীম ক্লান্তির ভাব ও ললাটে প্রচুর স্বেদ—লক্ষ্মীমণির লক্ষ্যে পড়তে অসুবিধা হ'ল না।

সঙ্গে সঙ্গেই, ব্যাকুল কণ্ঠে প্রায় যেন আর্তনাদ করে উঠল সে।

'আপনার এ কী অবস্থা প্রভু! আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? খুব দূর পথে কোথাও? আপনি যে বিষম ক্লান্ত!'

'হ্যাঁ, সত্যিই এখন বড় ক্লান্তি বোধ করছি। দূরে কোথাও যাই নি, এইখানেই বহুক্ষণ ঘুরেছি। তবে এ কিছু না, এবার গৃহেই ফিরব, তাই এ পথ ধরেছি। সামান্য বিশ্রাম নিলেই এ ক্লান্তি দূর হবে।'

বলতে বলতেই বিশ্বেশ্বর গমনোদ্যত হলেন কিন্তু তখনই যাওয়া গেল না।

যা কখনও করে নি লক্ষ্মীমণি, এ পর্যন্ত কোন দিন করে নি—তাই করে বসল। 'সামান্য একটুখানি দয়া করুন—' বলে অকস্মাৎ নিজের অঞ্চলপ্রান্ত দিয়ে ওঁর শ্রমবারি মুছে নিতে লাগল। ললাটে হাত দিতে সাহস হ'ল না—গুরুজনদের ললাটে মস্তকে হাত দেওয়া ধৃষ্টতা, দিতে হ'লে অনুমতি নিতে হয়—সে কণ্ঠ, বক্ষ, এমন কি পৃষ্ঠদেশের ঘর্মও যতটা সম্ভব মুছে নেবার চেষ্টা করল।

আর সেই সময়ই—যেন এক অতর্কিত মুহূর্তে—এতদিনের অবরুদ্ধ আবেগ ও অতৃপ্ত তৃষার উপরকার চেষ্টাকৃত ছদ্ম-আচ্ছাদন খসে পড়ল। সহসা নির্লজ্জা ভ্রষ্টার মতো সবেগে ওঁকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। কঠোর সে আলিঙ্গন। মনে হ'ল বুঝি সে তার দেবতাকে পিষ্ট চূর্ণ ক'রে নিজের মধ্যে লীন করতে চায়।

হয়ত এই আকস্মিক ও অনভিপ্রেত স্পর্শে, এই প্রকারের আলিঙ্গনে বিশ্বেশ্বর শিহরিত হয়ে উঠলেন কিন্তু তাঁর আচরণে তেমন কোন ভাবই প্রকাশ পেল না। অরুচি কি বিতৃষ্ণার কোন লক্ষণই না। তিনি রূঢ় ভাবে সরিয়ে দিলেন না, কঠোর ভাষায় তিরস্কারেও প্রবৃত্ত হলেন না—বরং পূর্ববৎ তেমনি অবিচল, তেমনি স্থির হয়েই এই ভাগ্যবঞ্চিতা মেয়েটিকে তার বহু দিনের বহু বারের অতৃপ্ত সেবার সাধ মিটিয়ে নিতে দিলেন। অবশ্য এই সামান্য সময়ে যেটুকু সম্ভব ···

আকস্মিক আবেগ আবার অকস্মাৎই সম্বরিত হ'ল বৈকি!

সম্বিৎ ফিরতেই নিদারুণ লজ্জা ও নিজের ঘৃণায় অস্ফুট কণ্ঠে 'ছি ছি' এই দুটি শব্দ উচ্চারণ ক'রে বাহুবন্ধন শিথিল করল লক্ষ্মীমণি। তখনই সে স্থান ত্যাগ করা উচিত, কিন্তু তাও পারল না।

ওর যে কিছুই বলা হয় নি ওর এই জীবন্ত ইষ্টকে, পুঞ্জীভূত ব্যথা নিবেদনের

কার্যটাই যে অসমাপ্ত। এমন নিভৃত বিজন অবকাশ কি আর কোনদিন পাওয়া যাবে !

বিশ্বেশ্বরও ওকে পরিহার ক'রে তখনই চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হলেন না। বরং যেন সস্নেহে—অবুঝ ভগ্নীকে যেমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা সান্ত্বনা দেয়, সেই ভাবে—লক্ষ্মীমণির মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে মিষ্ট কণ্ঠেই বললেন, 'শান্ত হও লক্ষ্মী, তোমার দুঃখ আমি বুঝি, এ দুঃখ এই ভাবে বিদূরিত হবে না। হয় না। এ বিধাতার দেওয়া দুঃখ, অ'বিচার কি না জানি না—তবে তোমাকে এ সহ্য করতেই হবে। তুমি আমাকে ভালবাসো। কিন্তু এ ভালবাসা যে আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়—তাও তুমি জানো। বহু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করেছ। যা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য সে আশা বা আকাঙ্ক্ষা অন্তরে বহন করলে শুধু আঘাতই পাবে।...তুমি চেষ্টা করো এই ভালবাসা ঈশ্বরকে দিতে, প্রাণপণে চেষ্টা করলে তা পারবেও। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। প্রাণপণ ঐকান্তিক চেষ্টাই তো সাধনা। সিদ্ধি না হোক, সাধনায় মন স্থির হ'লেই শান্তি পাবে। শান্তি থেকেই সুখ। কোন ব্যর্থতার বেদনাই তখন এমন ভাবে অহরহ পীড়ন করবে না।'

বহুক্ষণ থেকেই লক্ষ্মীমণির দুই চোখ থেকে লজ্জা, অনুশোচনা ও বেদনার ধারা নেমেছিল, তবু তার মধ্যেই—বোধ করি ওঁর এই সস্নেহ সপ্রশ্রয় কণ্ঠস্বরেই সাহস সঞ্চয় করল। বাষ্পবিকৃত কণ্ঠে বলল, 'তুমিই আমার ঈশ্বর, ইষ্ট। তুমিই আমার গুরু। আমি অন্য কোন ইষ্ট বা ঈশ্বর জানি না।'

'তা হয় না লক্ষ্মীমণি, ঈশ্বরের প্রাপ্য কি মানুষকে দেওয়া যায় !'

'কেন যাবে না। আমি তোমাকে সেই ভাবেই দেখি, আমার পূজা আমার ধ্যান ঈশ্বর তোমার মধ্যে দিয়েই গ্রহণ করবেন না কেন !'

'তা হয় না। মানুষকে ঠিক ঈশ্বররূপে দেখা সম্ভব নয়।'

'কেন নয় ! মাটি বা পাথরের বিগ্রহকে যদি ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা যায়—তবে মানুষকে, যে মানুষ আমার চোখে শ্রেষ্ঠ, তাকে কেন যাবে না ! আমি সেই ভাবেই তাকে সেবা করব, পূজা করব না কেন ? তুমিই আমার ভগবান, তুমি ছাড়া অন্য কোন ভগবানের কথা আমি ভাবতে পারি না, তুমি সেই ভাবেই আমার পূজা নাও।'

অকস্মাৎ কি একটা প্রবল আলোড়ন অনুভব করলেন বিশ্বেশ্বর ?

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে নিমীলিত নেত্রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর শুধু বললেন, 'তুমি এখন গৃহে যাও লক্ষ্মীমণি, আমি আজ বড়ই ক্লান্ত। মাও নিশ্চয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন এতক্ষণে, হয়ত নিজেই চলে আসবেন। আমি যাই।'

তিনি আর সত্যই দাঁড়ালেন না। দ্রুত গৃহের পথ ধরলেন।

খুবই পরিশ্রান্ত, এতক্ষণের পদচারণায় হয়ত ক্রোশাধিক ভূমি অতিক্রম করার কাজ হয়ে গেছে—দুই পা এবার ভেঙ্গে আসতে চাইছে। অন্তরাবেগের সংঘাতেই আরও—যেন পর্বতপ্রমাণ অবসাদ নেমে এসেছে দেহেও। তবু সে রাত্রিতে লেশমাত্র তন্দ্রা নামল না তাঁর চোখে।

বধূ ওঁর মুখ দেখে যথেষ্ট উদ্বেগ বোধ করলেও ওঁর প্রায় উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে কোন প্রশ্ন করতে সাহস করেন নি তখন, বিশেষ জননীর অনুযোগোদ্যত রসনা সহসা স্তব্ধ হয়ে যেতে নিজের সতর্কতার একটা সমর্থন পেয়েছিলেন যেন। এমন কি উনি যে নামমাত্র আহার করলেন—আহার্যের সামনে বসেই উঠে পড়লেন—সেজন্যও কোন প্রশ্ন করতে পারেন নি। রাত্রে শয্যায় এসেও—সেই কারণেই নির্বাক স্বামীকে কোন প্রশ্ন করেন নি, শুধু নীরবে বাতাস করে গেছে বহুক্ষণ ধরেন।

তাতেও, বিস্ময়ের ও তজ্জনিত দুশ্চিন্তার ন্যূনতা ঘটল না।

অন্য দিন এই ভাবে বাতাস করলে বিশ্বেশ্বর নিবৃত্ত করেন, জোর করে পাশে শুইয়ে দেন—ভয় দেখান, যে তাহলে তিনিও বসে বসে স্ত্রীকে ব্যজন করবেন—কিন্তু আজ সে সব কিছুই করলেন না, নীরবে স্থির হয়ে শুয়েই রইলেন, দুই চোখ চেয়েই—তবে সে দৃষ্টি বা মন কি অনুভূতি যে এখানে কোথাও নেই তাও বুঝতে অসুবিধা হ'ল না।

কারণ তাহলে কথা কইতেন, হাত থেকে পাখা টেনে নিতেন, এই অপরিসীম ক্লান্তির কারণও বিবৃত করতেন নিজেই।

তবে কি রুষ্ট হয়েছেন ওঁর প্রতি? ঐ ইঙ্গিতটা বা অনুযোগের জন্য?

এমন আশঙ্কাও হতে লাগল।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল উনি তো জননীর সঙ্গেও কোন বাক্যালাপ করেন নি, ভোজনে বসে বা তার পরেও।

অতিশয় পরিশ্রান্ত বিশেষ পথশ্রান্ত বুঝেই—শ্রমজনিত ঘর্ম অপগত হয়েছে দেখে ব্যজন রেখে মাধবী তাঁর ক্ষুদ্র কোমল হাতে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে, একটু

চাপ দিয়ে টিপেও দিতে লাগলেন। প্রথমটা খুব সন্তর্পণে, ভয়ে ভয়েই হাত দিয়ে ছিলেন, কারণ এই ধরনের ব্যক্তিগত সেবা নিতে খুবই আপত্তি বিশ্বেশ্বরের— বিশেষ নিতান্ত-বালিকা বধূকে দিয়ে সেবা করানোকে তিনি লজ্জাজনক বিবেচনা করেন।

হয়ত জানেন—মানসিক বা দৈহিক কোন দিক দিয়েই যখন তিনি স্ত্রীর যা প্রাপ্য ততটা প্রেম বা মনোযোগ দিতে পারছেন না তখন অকারণে স্বামীর প্রাপ্যই বা দাবী করবেন কেন। সে তো এক রকমের অপরাধ।

আজ কিন্তু এ সেবাতেও যেন বিশ্বেশ্বরের সচেতনতা ফিরল না। তিনি তেমনি স্থির হয়েই শুয়ে এই সেবা নিতে লাগলেন। এতে আরামই বোধ করছিলেন সম্ভবত, প্রয়োজন তো ছিলই, তাই নিজের অজ্ঞাতসারেই পাদুটি স্ত্রীর কোলের আরও কাছে সরিয়ে দিলেন—এই সেবাকার্যের মধ্যেই।

সচেতনতা ফিরল গভীর রাত্রে, যখন মাধবী শ্রান্ত হয়ে তন্দ্রায় ঢুলে পড়লেন ওঁর পায়ের ওপরই।

চমকে চেয়ে দেখে নিমেষে ঘটনাটা অনুমান ক'রে নিলেন, অনুতপ্ত চিত্তে উঠে বসে সস্নেহে ও সযত্নে নিদ্রাতুর স্ত্রীকে পাশে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবার মতো ক'রে বহুক্ষণ তার ললাটে হাত বুলিয়ে দিলেন।

কিন্তু তাঁর নিজের দুটি চোখে অপরিসীম শ্রান্তি বা এতক্ষণের দুটি কোমল হাতের স্নেহসিক্ত সশ্রদ্ধ সেবাও তন্দ্রা আনতে পারল না।···

আজ কিশোরী লক্ষ্মীমণির কথাগুলোই তাঁর মনের মধ্যে এই প্রচণ্ড তুফান তুলেছে।

এক-একবার এমনও মনে হচ্ছে, তাঁর সংশয় বা দ্বিধা নিরসনের জন্য ঈশ্বরই ঐ মেয়েটার মুখ দিয়ে ঐ কথাগুলো বলিয়েছেন।

মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরকে কল্পনা—না কল্পনাও নয়—অনুভব করা যায়।

কোন একটি মানুষকে তীব্রভাবে, ঐকান্তিক ভাবে ভালবাসলে সে ভালবাসা ঈশ্বরই বুঝি নিজে থেকে গ্রহণ করেন।

মানুষের মধ্যে দিয়ে ভগবানকে ভালবাসা, তাঁর সেবা করা—তাঁর মহিমা তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করা অবাস্তব অসম্ভব কিছু নয়। এমন হয়, হতে পারে।

তাহলে কেশবের প্রতি তাঁর এই যে উন্মত্ত ভালবাসা—এও কি ঐ রকমই ?

সেই ভালবাসাই ঈশ্বরে পৌছতে পারে ?

না, না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—কথাটা চিন্তায় আসা মাত্র যেন শিহরিত হয়ে ওঠেন। নিজের মনেই প্রতিবাদ ধিক্কারের আকার নেয়—না না। ছিঃ!

কেশব সে মানুষ নয়। নিতান্তই সাধারণ সে।

ভদ্র, শিক্ষিত—কিন্তু তর্কপ্রিয়, সংশয়প্রিয়। বৈষয়িক-বুদ্ধিবিশিষ্ট। প্রিয়ভাষী, প্রিয়দর্শন—কিন্তু এ সবই তো জৈবিক গুণ।

উনি যে ভালবাসেন—তাঁর মনের তীব্র আবেগ, কাউকে ভালবাসার সুতীব্র ইচ্ছা, আধার খুঁজে বেড়াচ্ছে এখনও, কেশব সেই খোঁজার পথে পড়েছে মাত্র, ক্ষণিকের ভ্রান্তিতে তাকে আধার মনে হয়েছে।

যাকে ঈশ্বর বলে কল্পনা করা যায়—তার মধ্যে অতি-মানবিক গুণ থাকা চাই। সে হবে, মহৎ নয়—এমন কি মহত্তরও নয়—মহত্তম।

লক্ষ্মীমণির শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কার, পরিবেশ—এর মধ্যে যে ধারণা গড়ে উঠেছে তাতে হয়ত ওঁকেই সে এ বিশ্বের সকলের চেয়ে শ্রেয় ও প্রেয় ভাবতে পারে, হয়ত তেমন কোন গুণের বিকাশ দেখে থাকবে সে, নিজের দৃষ্টির শক্তি-সীমার মধ্যে যতটা দেখা সম্ভব। কিংবা নিতান্তই জৈবিক আকর্ষণে, রূপজ মোহেই ওঁর মধ্যে সে শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করেছে।

অত সহজে ওঁর মন ভরবে না।

তবে কোথায় সে পাত্র ? সে আধার ?

ভাবতে ভাবতে এক সময় মনে হয়—জানকীনাথই তো গৃহে আছেন। তিনিও তো মনুষ্যদেহ-ধারীই ছিলেন। তাঁকে কেন ভালবাসতে পারেন না ? কেন কোথায় একটা অতৃপ্তি দেখা দেয় মনে ? সে কি সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন বলে, না একটা সংস্কারের বশে শম্বুককে বধ করেছিলেন বলে ; না নিজের স্বার্থের জন্য—বালিকে নিহত করেছিলেন বলে ?

পুরাণকারেরা, রামায়ণ-প্রণেতা অবশ্যই এ সব কাজের যুক্তি দিয়েছেন। তবু ওঁর মনে কেন সে অনুরাগ জন্মে না—তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে মনে হয় না ?

শ্রীকৃষ্ণ আছেন।

সম্প্রতি শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত পড়ে মনে হয়েছে—কেউ কেউ যে বলেন শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ অবতার, অন্যান্য অবতারদের মতো খণ্ডাংশ মাত্র নন, তা একেবারে

অমূলক অযুক্তিগ্রাহ্য নাও হতে পারে।

দেহধারণ করলে দেহীর দোষ গুণ কিছু—স্বভাবজ দেহজ—থাকতে বাধ্য। তবু তা সত্ত্বেও, অথবা সব জড়িয়েই, তাঁকে মহত্তর মনে হয়।

কিন্তু সে শ্রীকৃষ্ণ কৈ? কোথায় তিনি? কেমন তিনি?

কী তাঁর রূপ, কি ভাবে তাঁকে ধ্যান করবেন, ধারণায় আনবার চেষ্টা করবেন? কার মধ্য দিয়ে ভালবাসবেন! ওঁর এই সেবা-করার, মন প্রাণ আবেগ দিয়ে ভালবাসবার সাধ মেটাবেন?

কিছুই স্থির হয় না। অশান্ত মন মস্তিষ্কের রুদ্ধ কারায় বৃথাই মাথা কুটে মরে।

দুই চোখ অনিদ্রায় জ্বালা করতে থাকে। হয়ত রক্তবর্ণ ই হয়ে উঠেছে। ললাটের দুই পাশ দপদপ করে, মাথার মধ্যে যেন যন্ত্রণা বোধ হয়। রাত্রিশেষের স্নিগ্ধতাও তাপ প্রশমন করতে পারে না। মানসিক অস্থিরতাতেই পুন পুন স্বেদার্ত হয়ে ওঠে দেহ।

অবশেষে একসময় দূরে পাখী ডাকার শব্দ ওঠে। প্রতিবেশী যুগল আচার্য তাঁর অভ্যাসমতো শেষ-রাত্রের স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করেন।

অর্থাৎ ঊষা সমাগত, প্রভাতের বিলম্ব নেই।

চকিতে বিশ্বেশ্বর উঠে বসেন।

রাত্রে ঘুমের মধ্যেই কখন মাধবী ওঁর দেহে একটা হাত রেখেছিলেন, বিশ্বেশ্বর তা বুঝতে পারেন নি। এখন উনি উঠে বসতেই সে হাত স্থানচ্যুত হতে মাধবীরও ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনিও সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লেন। বেশবাস অসম্বৃত হওয়ার অবকাশ পায় নি, সুতরাং তার জন্য মুহূর্তকালও বিলম্ব ঘটল না, বিশ্বেশ্বর শয্যাত্যাগ করার পূর্বেই উনি খাট থেকে নেমে ওঁর দু পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলেন, যেমন নিত্যই করেন।

আজ কিন্তু অন্য দিনের মতো তখনই চলে যেতে পারলেন না।

সহসাই বিশ্বেশ্বর দু হাতে স্ত্রীর দুটি হাত ধরে নিজের দিকে ঈষৎ আকর্ষণ ক'রে কতকটা যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো প্রশ্ন করেন, 'মাধবী, তুমি কখনও ঈশ্বরের কথা চিন্তা করেছ? করো?'

বেশ বিস্মিত হ'লেও বিচলিত বোধ করলেন না মাধবী, শান্ত কণ্ঠেই উত্তর

দিলেন, 'করি বৈকি ! প্রত্যহই করি। তাঁর চিন্তাতেই তো সারাদিন কাটে আমার। আপনিই যে আমার ঈশ্বর। তাই চিন্তা কি ভাবনায় তো অসুবিধা ঘটে না !'

॥ ৫ ॥

সেদিন শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত লঘু বা ভারমুক্ত মন নিয়ে।

অনেকখানিই সহজ হয়ে গেছেন তিনি। এই অত্যাশ্চর্য অরুণোদয়, এই প্রভাতী স্নিগ্ধ বায়ু, নিশিগন্ধী জানা-অজানা পুষ্পের সুবাস—বহু দিন পরে তিনি যেন এ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন, এর নির্মল আনন্দ উপলব্ধি করলেন আবার।

ছুটি অল্পবয়সী মেয়ে—বধূ মাধবী তো কিশোরী মাত্র—তাঁর গুরুর কাজ করেছে।

অসংখ্য কুটিল সন্দেহের, এই কদিনের নিদারুণ অন্তরনিরুদ্ধ বেদনার-অস্থিরতার নিরসন করেছে।

করেছে তাদের অকপট বিশ্বাসে, তাদের প্রেমে। আন্তরিক নির্দ্বিধা-প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা ঈশ্বরকে সহজে কাছে পাওয়া যায়। কোন মানুষকেও ঐকান্তিক ভাবে ভালবাসলে—যাকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে হয়—তার মধ্যেই ইষ্টোপলব্ধি হয়। এ যদি ওদের কাছে এত সত্য হয়—ওঁর কাছেই বা হবে না কেন ?

নিজের মধ্যে যে বিশ্বাসটা ধারণাটা অস্পষ্ট হয়ে ছিল, যাকে অবলম্বন করতে সাহস হচ্ছিল না ঠিক—সেইটেকেই ঐ স্বল্পশিক্ষিতা ছুটি মেয়ে কত অনায়াসেই না অবলম্বন করেছে। নিজেদের বিশ্বাসে নিজেরা শান্তি পেয়েছে—শান্ত হয়েছে।

এই বিশ্বাসটুকুর অভাবেই কি অশান্তি ও অস্থিরতাই না অনুভব করেছেন এই গত কয়েক মাস।

জ্ঞানের পথে শাস্ত্রের পথে বিচার করলে এ বিশ্বাস হয়ত অসমসাহসিক, বা শুধু তাও নয়—ধৃষ্টতা বা মূর্খতাও।

এ কথা পণ্ডিত সমাজে উপস্থাপিত করলে—এই অত্যাশ্চর্য দৃঢ় অথচ সহজ

বিশ্বাসের কথা—তিনি নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হবেন। বাতুল বলবেন বিদ্বজ্জন সমাজ।

কিন্তু ঐ জ্ঞানী পণ্ডিতরাই বা কি পেয়েছেন?

বিস্তর পুঁথি পড়ে, পর্বতপ্রমাণ দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ ক'রে—জীবনের তিন-চতুর্থাংশ তর্ক-বিচার-মীমাংসায় অতিবাহিত ক'রে কি পেলেন ওঁরা?

যশ, প্রতিষ্ঠা?

এসবই তো শূন্যগর্ভ।

কী তার মূল্য, কত দিনেরই বা।

এ সম্মান-প্রতিষ্ঠা তো প্রায় পদ্মপত্রের জল।

পেলেই সদা ভয়—ঐ বুঝি গেল, বুঝি হারালাম। ঐ বুঝি অমুক ব্যক্তি আমাকে লঙ্ঘন ক'রে অধিকতর প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে গেল।

তাহ'লে এর মূল্য কি? কেন এর জন্য ওঁরা জীবনপাত করেন, অন্য কিছু না ভেবে, আর কারও দিকে না তাকিয়ে—যাঁর ইচ্ছায় এই বিপুল অত্যাশ্চর্য বিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে—তাঁর কথা না ভেবে শুধু শুষ্ক জ্ঞান আহরণ ক'রে ক্ষণস্থায়ী প্রতিষ্ঠাকে আঁকড়ে ধরে থাকেন?

কে যেন বলেছেন না—প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা, গৌরব রৌরব নরকসম, দম্ভ প্রকাশ সুরামত্ততার মতো।

অতি সত্য কথাই বলেছেন—যিনিই বলে থাকুন।

এই তো এ পাড়ারই বৃদ্ধ আচার্য মশাই।

বিশাই আজন্মই ওঁকে দেখছেন। আগে মধ্যে মধ্যে ওঁদের বাড়িতে যেতেন। বসে বসে কথা বলেছেন। শাস্ত্রসম্বন্ধে ওঁর ব্যাখ্যা শুনতেই যেতেন, পাঠ নেবারও চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেদিক দিয়ে কোন শুভ ফলই লাভ হয় নি।

অথচ বিরাট পণ্ডিত। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ ওঁকে একদা সর্বশাস্ত্র-পারঙ্গম উপাধি দিয়ে সম্মানিত, অভিনন্দিত করেছেন।

গুরুবংশের সন্তান। ওঁর ছাত্রও যেমন অসংখ্য, তেমনি শিষ্যও অগণিত।

কিন্তু কী পেলেন উনি?

ঈশ্বরের ধারে কাছেও যেতে পারেন নি, বোধ হয় তেমন ঈপ্সাও ছিল না। সম্ভবত সে চিন্তাই করেন নি কখনও।

আগেও দেখেছেন। যখন মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত তখনও—মনে

কোন শান্তি ছিল না।

কে পুরোপুরি ওঁর প্রাপ্য সম্মান দেয় নি; কে কার কাছে কি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছে; ওঁর নিজের পুত্র ওঁর চেয়ে বিদ্যায় জ্ঞানে অনেক ন্যূনতা সত্ত্বেও কেন অনেক বেশী জনপ্রিয়তা বা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, অনেক যশস্বী হয়েছে—কেবল এই নিয়ে ক্ষোভ আর অশান্তি, ঈর্ষা আর বিদ্বেষ। কটূক্তি ঈর্ষা দম্ভ—এ ছাড়া, কোন সমালোচনা শোনেন নি ওঁর মুখে।

এটা চিরকালই বিস্ময়কর মনে হয়েছে বিশ্বেশ্বরের।

জীবনের সার্থকতা কি তা নিয়ে কোন চিন্তাও করেন নি কখনও। যথার্থ তৃপ্তি বা শান্তি—যা মনকে শান্ত করে, মাধুর্য এনে দেয় জীবনে—অন্বেষণ করেন নি। অভিমানেরই সেবা করে গেছেন চিরকাল, ঈর্ষার বারি নিষেকে তাকে পুষ্ট করেছেন।

জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে তার পুরস্কারও পেয়েছেন—অপরিসীম দুর্গতি। সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়ে পড়েছেন দেহে ও মনেও। পূর্ণ ভীমরতি প্রাপ্ত হয়েছেন। নিজের বিষ্ঠা পরমানন্দে নিজের দেহে লেপন করেন। সর্বদা আহারের চিন্তা। একবার আহারের পরমুহূর্তেই সে কথা বিস্মৃত হয়ে আহার্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, না পেলে কুৎসিত গালিগালাজ করেন, স্ত্রী পুত্রবধূ সকলকে, ইতর কদর্য শব্দ ব্যবহার করেন। পাণ্ডিত্য ইতিপূর্বেই ওঁকে শান্তি দিতে পারে নি, এখনও পারছে না। উপরন্তু জীবনধারণে যেটুকু সুখের ভাগ তা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন।

সযত্ন আহরিত জ্ঞান, যা প্রাণ ধরে নিজের সন্তানকেও দিতে পারেন নি সম্পূর্ণটা —এখন কোন কাজেই লাগছে না।

বিশ্বেশ্বরও কি এই ভাবেই শুষ্ক পাণ্ডিত্যের সেবা করে যাবেন সারা জীবন, মূল্যহীন অভিমানের মূলে জীবনবারি নিষেক করবেন?

'না না, হে ভগবান, এ দুর্দশা থেকে আমাকে রক্ষা করো, আমাকে তোমার কাছে টেনে নাও। তোমাকেই আমি চাই, আর আমার কোন কামনা নেই।'

মনে মনে বার বার ব্যাকুলভাবে উচ্চারণ করেন কথাগুলো।

প্রভাতের কুসুম মধ্যাহ্নের পূর্বেই মলিন ও নির্গন্ধ হয়।

বিশ্বেশ্বরের মনের শান্ত-মাধুর্যও দিবারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের আতপতাপে বিগত দিনের শুষ্ক মালিকার রূপ ধারণ করে—স্বপ্নসুষমা দূর দিগন্তে বিলীন হয়।

জননী ইতিপূর্বেও মধ্যে মধ্যে মৃদু অনুযোগ করেছেন ; আজ সে অনুযোগের ভাষা বড় কঠোর শোনাল। বোধ করি তিনি ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌচেছেন তাই অনুযোগ যেন ধিক্কারের রূপ ধারণ করল।

এর জন্য যে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না, তা বিশ্বেশ্বরও জানেন। সে কথা কখনও তাঁর মনেও আসে নি। দেবী-সমা জননীর কোন ত্রুটির কথা চিন্তা করা সুদূর কল্পনার অতীত। এই সংসার পরিচালনার, তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা—যা নাকি একান্ত ভাবে তাঁরই করণীয়—তার পূর্ণ দায়িত্ব তো ইন্দ্রাণী দেবীই বহন করছেন।

তবু মনে হ'ল আজকের এই পরমাশ্চর্য নবলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রভাতটি তাঁকে যদি আর একটু উপলব্ধি করতে দিতেন মা।···

ইন্দ্রাণীর বক্তব্য—স্বামী গেছেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রও নিরুদ্দেশ, সম্ভবত সে সন্ন্যাসীই হয়ে গেছে, এখন বিশ্বেশ্বরই এ গৃহের, সংসারের কর্তা। সে আপন অধ্যয়ন অধ্যাপনা নিয়ে থাকে—তাঁর আপত্তি নেই—কিন্তু সংসারটা চলে কিসে—সে চিন্তায় যদি দিনের এক দণ্ড মাত্র সময়ও সে দিত, তো আজ তাঁকে এমন বিপন্ন হ'তে হ'ত না। এও তো তার অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে। নয় কি?

অধ্যাপনার জন্য কোন পারিশ্রমিক নেওয়ার রীতি নেই, অধিকন্তু ছাত্রদের গৃহে রেখে পালন করাই অধ্যাপকদের কর্তব্য বলে গণ্য। সে সামর্থ্য তাঁদের নেই বলে, স্বামী দেবদেব মিশ্র যথেষ্ট আত্মগ্লানি ভোগ ক'রে গেছেন চিরদিন। তবু তাঁদের যা সামান্য জমিজমা আছে ব্রহ্মত্র হিসাবে পাওয়া—তা ঠিকমতো দেখাশুনো করলেও দুবেলা জানকীনাথের সেবা—সাড়ম্বরে না হোক—নিয়ম-রক্ষার মতো চলে যেতে পারে।

কিন্তু সেটুকু সময় দেবার মতো সামর্থ্য বা অভিরুচি বিশ্বেশ্বরের নেই। তিনি স্ত্রালোক—তিনি কি করবেন, কতখানি করবেন?

অনেকে বলেন, এত অল্প বয়সে অধিক বিদ্যার্জনের ফলেই সে এমন একটা অদ্ভুত মানুষ হয়ে গেছে—পার্থিব জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, নিরাসক্ত। শুধু তাই নয়, সর্বদাই যেন অন্যমনস্ক, কী যেন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। এধারে গৃহে অন্নাভাব তো বটেই, সংস্কারের অভাবে বাসকক্ষগুলির অবস্থা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বৎসর চালে নূতন খড় না দিতে পারলে আগামী বর্ষায় নিজেদের তো বটেই স্বয়ং গৃহদেবতাকেও রক্ষা করা যাবে না। তাঁর শয্যাও

বৃষ্টির জলে সিক্ত ও কর্দমাক্ত হবে। মাথার উপর চাল বা দেওয়াল খসে পড়াও বিচিত্র নয়।

এক কথায় আশু বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। এখন জমিজমায় মন দিলেও সে পরিমাণ অর্থ কিন্তু এ বছরেই উঠবে না। সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে একবার দেশে যাওয়া। সেখানেও কিছু ব্রহ্মত্র জমি আছে, যে সব প্রজা বা চাষী সে জমি ভোগ করে তারা বেশির ভাগই সজ্জন, ওঁরা যে কেউ গেলেই তারা অর্থে বা শস্যে ওঁদের প্রাপ্য শোধ দেবে। এ ছাড়া ওদিকে ওঁদের কিছু মন্ত্রশিষ্যও আছেন, তাঁরা গুরুর বার্ষিক প্রণামী মুদ্রা ও বস্ত্র তুলে রেখে দেন, কেউ গেলেই স্বেচ্ছায় সাগ্রহে এনে পৌছে দেবেন। সেও যথেষ্ট।

দেশে যাওয়ার আরও একটা বিশেষ কারণ আছে। সেটা এতদিন বিশ্বেশ্বর শোনেন নি, আজ প্রথম শুনলেন।

সেখানে বিশ্বেশ্বরের পিতামহী এখনও জীবিত আছেন। অতিবৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন, তবু তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি অটুট আছে, একথা সে দেশাগত বহু লোকের মুখেই শুনেছেন ইন্দ্রাণী দেবী।

তাঁরই একটি আদেশ এবং ইন্দ্রাণীর প্রতিশ্রুতি আজও পালন করা হয় নি।

দেবদেব শেষ যেবার দেশে যান—এখান থেকে বহুদূর, বঙ্গদেশের উত্তরপূর্ব সীমান্তে সে দেশ—সেবার ইন্দ্রাণী দেবীও সঙ্গে ছিলেন। তিনি একদা স্বপ্ন দেখেন যেন এক জ্যোতির্পিণ্ড তাঁর গর্ভে প্রবেশ করেছে। সে স্বপ্নের বিবরণ শুনে প্রাচীনারা মন্তব্য করেন নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ ইন্দ্রাণীর সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করছেন।

দৈবক্রমে এর কিছুদিনের মধ্যেই ইন্দ্রাণীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন দেবদেব নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের সব আয়োজন সম্পূর্ণ করেছেন—তখন আর বিলম্ব করা যায় না, তিনি অন্তর্বত্নী স্ত্রীকে নিয়েই যাত্রা করলেন। দেবদেবের জননী, বিশ্বেশ্বরের পিতামহী বিশেষ বাধা না দিলেও বধূকে বলে দেন, 'এই যে ছেলে আসছে তোমার ঘরে, ছেলেই আসবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যেও।'

ইন্দ্রাণী বলেছিলেন, 'যদি ছেলে হয়, অবশ্য সে এসে আপনাকে প্রণাম ক'রে যাবে।'

এ বৃত্তান্ত আগেও কিছু কিছু শুনেছেন, তবে অত কান দেন নি। এমন

অবশ্যকরণীয় বলেও বোধ হয় নি। আজ সে ইতিহাস সম্পূর্ণ বিবৃত ক'রে ইন্দ্রাণী বললেন, 'তুমি যদি এখনও একবার না যাও, তোমার মহাগুরুর আদেশ অমান্য করা হবে। আমিও প্রত্যবায়ভাগী হবো।'

এর পর জননীর আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভিন্ন উপায় থাকে না। পরমার্থের চিন্তা-বিলাস ত্যাগ ক'রে অর্থের চিন্তাকেই প্রাধান্য দিতে হয়।

এ কদিনের আবেগ ও আজ রাত্রিশেষের আলোকোজ্জ্বল স্বপ্ন প্রদোষের দূর দিগন্তে বিলীন হ'য়ে যায়।—

তখনকার দিনে বিদেশ ভ্রমণ—দেশ এখন ওঁর কাছে বিদেশেরই তুল্য – আদৌ সহজ ছিল না। পদব্রজে, নতুবা জলপথ থাকলে নৌকার ব্যবহার, এই ছিল বিদেশ যাতায়াতের উপায়। নৌকায় ভ্রমণ সাধারণের সাধ্যের অতীত, বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন। তবে সেটা নিরাপদ, পায়ে হাঁটা পথে দস্যু তস্করের ভয় আছে, প্রতারক সর্বকালেই ছিল, পরেও থাকবে, আর তারা কাছাকাছিই থাকে। পথ ভুল হ'তে পারে। অভিজ্ঞ মাঝিরা শুধু পথই চেনে না, কোন্ স্থানে বিশ্রাম বা আহারের ব্যবস্থা নিরাপদ, কোন্ স্থানে নয়—তাও তাদের নখদর্পণে। তাছাড়া মালপত্র সঙ্গে নেওয়ার থাকলেও, নৌকাই সুবিধা। পায়ে-হাঁটা পথে সে এক বিড়ম্বনা, হয় নিজেকে বহন করতে হয়, নচেৎ একজন বাহক নিতে হয় সঙ্গে – সে যথেষ্ট ব্যয়বহুল।

সব দিক বিবেচনা ক'রে বিশ্বেশ্বর নৌকাযোগে যাওয়াই স্থির করলেন। তিনি দূরদেশে যাচ্ছেন শুনে তাঁর বিত্তবান শ্বশুর তাঁর নিজস্ব নৌকা ও দাঁড়ি মাঝি দিলেন, সঙ্গে একজন সেবকও।

প্রথমটা বিশ্বেশ্বর বা ইন্দ্রাণী এ আনুকূল্য গ্রহণ করতে চান নি, কিন্তু মাধবীর পিতা এসে করজোড়ে এটুকু ভিক্ষা চাইতে আর 'না' বলতে পারলেন না।

আর একটা প্রয়োজনও ছিল। ওঁর কাছ থেকে না নিলে ঋণ নিতে হয়। বহু ধনী ব্যক্তিই বিশ্বেশ্বরকে দেবার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হতেন – কিন্তু সে সহায়তা গ্রহণ ওঁর পক্ষে অস্বস্তিকর। অথচ সব দিক দিয়েই নৌকা নেওয়া শ্রেয়। রন্ধনের তৈজস ও কিছু কিছু খাদ্যও সঙ্গে নেওয়া উচিত। বিশ্বেশ্বর সঙ্গে জানকীনাথের পটখানি নিলেন—পথে যখন নিজেকেই রন্ধন ক'রে খেতে হবে তখন সেখানেই ভোগ নিবেদন করবেন। সে দিক দিয়ে সুপ্রশস্ত নৌকা

পেয়ে সুবিধাই হ'ল। বিশেষ আসার পথে বহু সংগৃহীত দ্রব্য থাকবে এই আশাতেই যাচ্ছেন, সেগুলির স্থান সংকুলানের ব্যবস্থাও রাখা দরকার।…

যাত্রার পূর্বরাত্রে, অকল্যাণের ভয়ে সংযমের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মাধবী মিলনক্ষণে অশ্রু সম্বরণ করতে পারবেন না—এ স্বাভাবিক। বিশ্বেশ্বরও এ জন্য প্রস্তুতই ছিলেন, কারণ তিনি শুধুই গ্রন্থকীট নন, অনায়াসে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গেই মেলামেশা করেন, সব্জী বিক্রেতা হাটুরিয়াদের সঙ্গেও তাঁর প্রগাঢ় সখ্য—সুতরাং তাঁর এই বয়সেই মানবচরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা।

তিনি আদরে আশ্বাসে বালিকাবধূকে সান্ত্বনা দিতেও ত্রুটি করলেন না। মাধবীও বহু চেষ্টায় অশ্রু সম্বরণ ক'রে পরমবাঞ্ছিত বক্ষ ও বাহুর খাঁজে মুখ গুঁজে লজ্জা ও বাষ্প-জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'আমার কেবলই কেমন ভয় হচ্ছে, আপনি আমার থেকে বহু দূরে চলে যাচ্ছেন।'

'আরে পাগল, তা তো যাচ্ছিই। তবে সে আর কতদিন? যাতায়াতে মাস ছয় বড় জোর। তার মধ্যে অবশ্যই ফিরে আসব, তোমাদের এ ভাবে ফেলে রেখে গিয়ে বেশী দিন থাকব না। আমার ছাত্ররাও তো এই যাত্রার সংবাদে তোমার মতোই কাতর হয়ে পড়েছে।'

এবার মুখ তুললেন মাধবী, 'না, সে দূরে যাওয়ার কথা বলছি না।'

'তবে?' বিস্মিত বিশ্বেশ্বর প্রশ্ন করেন।

তবু দ্বিধা যায় না, রাজ্যের সঙ্কোচ এসে কণ্ঠরোধ করে।

অতিকষ্টে, বেশ কিছুক্ষণ পরে বলেন, 'কেমন যেন মনে হচ্ছে আপনি অনেক অনেক বড় হয়ে যাবেন—তখন আমি আর নাগাল পাব না। আপনি তখন বহু-লোকের নাথ হয়ে যাবেন, আমি সামান্য দাসীর একজনও হয়ত হ'তে পারব না। …আর এই যেন তার পূর্বাভাস। আপনি যেন সেকালের রাজাদের মতো কোন্ দিগ্বিজয়ে যাচ্ছেন,—যে রাজ্য জয় ক'রে ফিরবেন সেখানে আমার স্থান হবে না।'

'তোমার কি আশঙ্কা আমি আর গুটিকতক বিবাহ ক'রে ফিরব?'

'না না, তাতে আমার ভয় নেই। সপত্নীদের সঙ্গে হলেও আপনার সেবা করতে পারলেই কৃতার্থ হবো।'

'তবে?'

'তবে কি, তা আমি বোঝাতে পারব না। নিজেই ঠিক যেন বুঝতে

পারছি না।'

এই বলে তিনি আবারও ওঁর দেহে মুখ গুঁজে দিলেন।

বিশ্বেশ্বরও আর কথা বাড়ালেন না।

ঠিক এই ধরনের একটা অস্পষ্ট আভাস, ভবিষ্যতের ছায়া কি তাঁর মনেও দেখা দেয় নি!

কি, তা তিনিই কি জানেন!

শুধু তার অস্থিরতা, আকারহীনতা ও অনিশ্চয়তা অনুভব ক'রে অস্বস্তি বোধ করেন।...

তিনি মৌখিক সান্ত্বনার পথ বর্জন ক'রে প্রেমের পথই গ্রহণ করলেন। বধূকে সবেগে ও সবলে বক্ষে আকর্ষণ ক'রে আলিঙ্গন নিবিড়তর করলেন।

সেই পরমসুন্দর দেহের স্বেদ নিজের দেহের স্বেদে মিলিত হচ্ছে, সেই একান্ত ঈপ্সিত বক্ষের স্পন্দন নিজের আবেগ-আশঙ্কা-কামনায় আন্দোলিত স্পন্দনে অনুভব করতে পারছেন—এই অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতায় মাধবী তখনকার মতো আর সব কিছুই ভুলে গেলেন।

প্রেম ও ঐকান্তিক আত্মনিবেদনের এই মধুরতম প্রকাশে বিশ্বেশ্বরও এক-প্রকার শান্তি ও আনন্দ অনুভব ক'রে থাকবেন নিশ্চয়। ঐ অবশিষ্ট রাত্রিটুকুর বিস্ময়কর ও অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতার স্মৃতি রাত্রিশেষেও তাঁর মনে মধুরতম সঙ্গীতের রেশ-এর মতো অনির্বচনীয় মাধুর্য জাগিয়ে রাখবে এটাই স্বাভাবিক—কিন্তু প্রত্যূষে আর একটি বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা বিশ্বেশ্বরকে আবারও অস্থির ও অন্যমনস্ক ক'রে তুলল।

এর কোন সঙ্গত অর্থ তাঁর হৃদয়ঙ্গম হ'ল না। শুধু বিস্ময়, বিস্ময়—আর কী এক দুর্বার আবেগ।

শয্যাত্যাগের সময়—যাত্রার পূর্বে আর এ ধরনের নিভৃত অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎ সম্ভব হবে না বুঝে—শেষবারের মতো, আরও আশ্বস্ত করার জন্যই বধূকে চুম্বন করতে গিছলেন—

শিয়রে পূর্বদিকের জানলা দিয়ে এখনও-অদৃশ্য অরুণের আবির্ভাবদ্যোতক দ্যুতির একটা আভা তখন এসে পড়েছে মাধবীর মুখে। অকস্মাৎ বিশ্বেশ্বরের মনে হ'ল এ মুখ যেন কোন অতিবাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত পরমসুন্দর কোন পুরুষের,

সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল এ তাঁর স্বামীর, তিনি যেন এর স্ত্রী। তিনি এর দাসী, সেবিকা, প্রেমিকা—পরম দয়িতকে চুম্বন করতে গেলে দেহে যেমন পুলক শিহরণ জাগে, যেমন সমস্ত শরীর হর্ষকণ্টকিত হয় ক্ষণেকের জন্য—হয়ত এক লহমা—তেমনি হ'ল। স্থান কাল পাত্র, তিনি কি ও কে—সব বিস্মৃত হয়ে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

কয়েক পলক মাত্র স্থায়ী এ অনুভূতি।

কিন্তু ড় আশ্চর্য যে! বড় আশ্চর্য!

সে আনন্দ-অনুভূতি সুমিষ্ট-সঙ্গীতের স্মৃতির মতো আবেগের সৃষ্টি করল না—তাঁকে দীর্ঘকাল উন্মনা ও উদ্বিগ্ন ক'রে রাখল।

এ কী হ'ল!

তিনি কি ক্রমে উন্মাদই হয়ে যাচ্ছেন?

তবু, এই অসম্ভব ও অবাস্তব অনুভূতিটিও যে বড মধুর, অমৃতময়—তাও তো অস্বীকার করতে পারছেন না।

॥ ৬ ॥

মাধবী যা বলেছিলেন, তার একটা কথা সত্যই মিলে গেল।

এ যাত্রা যেন বিশ্বেশ্বরের দিগ্বিজয় যাত্রা।

তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যে এত দূর অবধি প্রচারিত হয়েছে, এভাবে ছড়িয়ে পড়েছে—সে সম্বন্ধে বিশ্বেশ্বরের ধারণা মাত্র ছিল না।

নৌকায় ভ্রমণ করলে গঞ্জেবাজারে মধ্যে মধ্যে নৌকা রাখতে হয়। দাড়ি মাঝিদের বিশ্রাম তো প্রয়োজনই—প্রয়োজন রন্ধনদ্রব্যাদি সংগ্রহও।

তবে সে তো এক প্রহব বা এক বেলার কাজ। মূল রন্ধন কার্য বা পূজা ভোগ নিবেদনের জন্য অপেক্ষাকৃত জনবিরল স্থানই বাঞ্ছনীয়। তেমন স্থান নদীর দু পারেই অজস্র। একটি ছায়ানিবিড পরিচ্ছন্ন বৃক্ষতল দেখে কাছাকাছি নৌকা ভেড়ালেই চলে।

কিন্তু বিশ্বেশ্বরের এই ভ্রমণযাত্রায় জনপদের কোথাও তিনি একবেলা বা একদিনে অব্যাহতি পেলেন না। কোথা থেকে কেমন ক'রে যে তাঁর আগমনবার্তা প্রচারিত হয়, তা বোঝা যায় না, দেখতে দেখতে বহু দর্শনপ্রার্থীর

সমাগম ঘটে। বড় গণ্ডগ্রাম কি শহরে তো কথাই নেই—সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন ব্যক্তিরা এসে করজোড়ে তাঁকে নিজেদের গৃহে পদার্পণের আহ্বান জানান; স্থানীয় প্রধান প্রবীণ পণ্ডিতরা সকৌতূহলে বয়সে নবীন বিদ্যায় প্রবীণ এই অত্যাশ্চর্য প্রায় কিশোর অধ্যাপককে দেখতে এসে তাঁর স‍বিনয় বাক্যে ও সুমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত হয়ে সাগ্রহে আমন্ত্রণ জানান স্থানীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয় ও বিচার—অন্যথায় আলাপ আলোচনা ক'রে যাওয়ার জন্য। সৎব্রাহ্মণ-গৃহে আহারের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করতে হয়—সেখানেই নিজের গৃহদেবতাকে ভোগ নিবেদন করার সম্পূর্ণ সুযোগ পাবেন, এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে। তাঁদের দীনতা ও সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে পারেন না।

আর, এই প্রসঙ্গে কাল-প্রথানুযায়ী বিচারবিতর্ক অন্তে 'বিদায়' বা সম্মান-মর্যাদাও গ্রহণ করতে হয়। সাধ্যানুযায়ী স্থানীয় সম্পন্নব্যক্তিরা বস্ত্র, অর্থ, ভোজ্য এবং ধাতুপাত্র প্রভৃতি নিবেদন ক'রে যেন ধন্য কৃতার্থ হন।···

যাতায়াত দুদিকের পথেই এই ঘটনা ঘটেছে। সর্বত্র। এতে—এই প্রীতি ও শ্রদ্ধার প্রকাশে সুখী ও আনন্দিত হয়েছেন বিশ্বেশ্বর। তাঁর বিরাট নৌকা এই সব অর্ঘ্যে ভরে উঠেছে। তবে তিনি সব কিছু সঞ্চয় করেন নি—এক স্থানের বোঝা অন্য স্থানে নামিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন; দরিদ্র অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করেছেন অকাতরে। কেবল স্বল্পবিত্ত ভক্তদের আন্তরিক পূজা হিসাবে যেগুলি নিবেদিত বলে বুঝেছেন, সেইগুলি আর্থিক মূল্য হিসাবে সামান্য হলেও সযত্নে রক্ষা করেছেন।

দেশে পৌছেও জ্ঞাতি ও চাষী প্রজাদের বহু দ্রব্য উপহার দিয়েছেন। অবশ্য সে জন্য স্থান পূর্ণ হতেও বিলম্ব ঘটে নি। বৃদ্ধা পিতামহীর প্রায় শেষ অবস্থা—এতদিন তিনি যে তপস্যার মতো ক'রে আকুল হৃদয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের 'মহাপুরুষ' পৌত্রটির জন্য বুক দিয়ে তাঁর প্রাপ্য সম্পত্তি ও তৈজসদ্রব্যাদি পাহারা দিয়ে রেখেছেন—এখন তা সব উজাড় ক'রে দিতে চাইলেন।

ব্যাকুল বিব্রত বিশ্বেশ্বর তাঁকে বোঝাতে পারেন না যে, এত বোঝা কোনমতেই একটা নৌকায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়—তা সে যতবড় নৌকাই হোক। আর এখান থেকে অন্য নৌকা সঙ্গে নিলে তাদের আসা যাওয়ার ব্যয়ভার বহন ক'রে কোন লাভ হবে না।

কিন্তু শুধু-তিনিই তো নন—জ্ঞাতিরা, প্রজারা সকলেই যেন তাঁকে দিতে

ব্যগ্র, ব্যস্ত। এত প্রীতি, এমন আন্তরিকতায় তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েন। বিশেষ প্রবীণ খ্যাতনামা পণ্ডিতরা যখন তাঁর সঙ্গে বিতর্কে বিচারে রত হয়ে একসময় পরাজয় স্বীকার ক'রে নমস্কার জানাতে আসেন তখন তাঁর সঙ্কোচের অন্ত থাকে না। তিনি পূর্বে প্রণাম ক'রে তাঁদের নিরস্ত করেন।

চারিদিক থেকেই এমনি ক'রে প্রাচুর্য বর্ষিত হতে থাকে—সাধারণ মানুষ হলে তার তৃপ্তির পাত্র উছলে উঠত। সাময়িক ভাবে বিশ্বেশ্বরও যে তৃপ্ত হন না, তাও নয়। তবু কোথায় একটা অতৃপ্তি বোধ করেন তিনি।

পার্থিব প্রাপ্য যত কিছু পাওয়া সম্ভব সবই পেলেন এ যাত্রায়, আর্থিক দুর্গতির যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তার অনেকটাই লাঘব হ'ল। গৃহসংস্কার, জানকীনাথের একটি মন্দির নির্মাণ, নূতন শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা—কোনটারই আর অসুবিধা হ'ল না। প্রাচুর্য না হোক প্রয়োজন মিটেছে—এতেই ইন্দ্রাণী তৃপ্ত। আর স্বামী নিরাপদে ফিরে এসেছেন, অধিকতর সুস্বাস্থ্য নিয়ে, তাঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে, এককালের নিরতিশয় শুষ্ক ম্লান মুখে যেন জ্যোতি ফুটে উঠেছে – তাতে মাধবীও আনন্দিত।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর?

তিনি কেন কিছুতেই তৃপ্তি পান না আর।

আবারও সেই পূর্বের অস্থিরতা ও অতৃপ্তি তাঁকে পেয়ে বসে কেন?

যতদিন দেশভ্রমণের উত্তেজনা ছিল, সম্মানের বিভ্রান্তিকর দীপ্তি ছিল ততদিন এ শূন্যতা অতৃপ্তি এতটা বুঝতে পারেন নি। রাত্রিদিন বহুলোকের মধ্যে থেকে চিন্তারও খুব অবসর পান নি বলেই বোধ হয়। বিশেষ এ ভ্রমণে শুধুই তো সম্মান ও মর্যাদা কুড়িয়ে বেড়ান নি--যে সব দেশ গ্রাম পরগণা চাক্‌লার মধ্য দিয়ে গেছেন, যেখানে যেখানে দু-একদিন থেকে যেতে হয়েছে—যতটা সম্ভব সে সব স্থানের অধিবাসীদের সঙ্গেও মিশেছেন, তাদের অবস্থা অসুবিধা—অভাব অভিযোগ শুনেছেন, বোঝার চেষ্টা করেছেন, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটা অন্তরঙ্গ চিত্র পাবার চেষ্টা করেছেন।

এতে দুঃখই পেয়েছেন বেশী। কারণ যে সামগ্রিক চিত্র তাঁর মানসপটে অঙ্কিত হয়ে গেল তা আদৌ উজ্জ্বল নয়। পাঠান মুঘলে রাজ্য অধিকার নিয়ে নিত্য সংঘর্ষ, ভুঁইয়াদের প্রায় চিরন্তন বিবাদ—এসবের যাবতীয় কুফল নিরীহ

গৃহস্থদেরই ভোগ করতে হয় সবচেয়ে বেশী। পাইক বা সিপাহীরা যা তন্খা পায়—প্রায়ই পায় না সেটুকুও—তাতে তাদের পরিবারের ভরণপোষণ চলে না। অথচ তারা জীবন বিপন্ন করতে আসে পরিবার পালনের উপায় করতেই। সুতরাং লুঠতরাজের দ্বারাই জীবিকা সংস্থান করতে হয়; আর, সেই সঙ্গে যদি কিছু সম্ভোগের উপকরণও সংগ্রহ করে—বা ব্যবহার ক'রে চলে যায়—তো খুব দোষ দেওয়া যায় না।

এ রীতি তো আবহমান কাল থেকেই চলে আসছে। বিশ্বেশ্বর যতদূর শুনেছেন জেনেছেন—ভারতের বাহিরে পূর্ব-পশ্চিমের সুদূর দেশগুলিতেও এই একই রীতি প্রচলিত। বিজয়ী সৈন্যদেরই যে শুধু লুণ্ঠনের অধিকার তাও নয়—পরাজিত ছত্রভঙ্গ পলায়নপর বাহিনীও, খাদ্য তো বটেই ভবিষ্যতের জন্য অর্থ, অভাবে গৃহস্থদের ধাতুপাত্র পুরনারীদের অলঙ্কারাদিও হস্তগত করার চেষ্টা করে।

এ রীতি এমন কি মহাভারতের সময়ও ছিল।

নতুবা কুরুক্ষেত্র মহাসমরের শেষ দিনে দুর্যোধনের পতনের পরই বিজয়ী লুণ্ঠনরত সেনাদের আক্রমণ থেকে সদ্য বিধবা কৌরব পুরনারীদের রক্ষা করতে যুধিষ্ঠির ত্রস্তেব্যস্তে স্বয়ং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকেই বা পাঠাবেন কেন? অথচ সে রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত থাকলে অশ্বত্থামা ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সুযোগ পেত না।

এই নিত্য দুর্যোগের মধ্যে উৎকণ্ঠা লাঞ্ছনার ভিতর তথাকথিত শাস্ত্রপ্রবক্তারাও কম অত্যাচার করছেন না। একদিকে বিধবাদের নানা বিধিনিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ রেখে অকারণে উপবাসের ব্যবস্থা ক'রে কৃশ ও অবাঞ্ছনীয় ক'রে তোলার চেষ্টা করছেন যেমন; অন্যদিকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে বা অনিচ্ছাতেও সামান্যতম বিধর্মী সংস্পর্শ হলেও, এমন কি তাদের ছায়া স্পর্শ করলেও—হিন্দুদের জাতিচ্যুত করার ব্যবস্থা দিচ্ছেন। ফলে সেই সব জাতিচ্যুতদের অন্য ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, অনেক বিধবাও কুলত্যাগ ক'রে চলে যান বিধর্মীদের বিবাহ ক'রে সংসারের সাধ মিটোতে। এইসব লোকগুলো যদি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ঐ তথাকথিত জাতিরক্ষকদের উপর অত্যাচার করে তো তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় কি?

আরও অনেক সমস্যা চোখে পড়ল বিশ্বেশ্বরের। ধর্মাচরণের নামে একশ্রেণীর ভ্রষ্ট বা ছদ্ম বৌদ্ধরা ব্যভিচার ও সুরাপানের যেন এক স্রোত প্রবাহিত করেছেন

দেশের সকল বর্ণের মধ্যেই। তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের নামে তন্ত্রশাস্ত্রকে কলুষিত করছেন।

এসব দেখে ব্যথিত বোধ করবেন বৈকি।

সেও তাঁর উন্মনাভাবের অস্থিরতার একটা কারণ। যতই হোক, শুধু নিজের কথাই চিন্তা ক'রে নিজের মনের গভীরে ডুবে থাকা তাঁর স্বভাব নয়। অনেক পড়াশুনো করেছেন, দেশ ও জাতির প্রতি কিছু কর্তব্য আছে সে বিষয়ে তিনি অবহিত। শুধু তাই বা কেন, পৃথিবীর অপরাপর দেশের মানুষের কথাও ভেবে দেখেছেন তিনি। সকলেই সদ্য-বর্তমানের তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাপ্য সুখ দুঃখ হতাশা নিয়ে অহরহ কলহ বিবাদে মত্ত। যে প্রতিষ্ঠার কোন মূল্য নেই—যাকে সাধু ব্যক্তিরা শূকরী বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করেছেন—তারই জন্য উন্মত্ত, দিবারাত্রি ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হচ্ছে; নিজের ক্ষমতা ও সম্ভোগের লালসায় লক্ষ লক্ষ প্রাণ নাশ করতেও কেউ পশ্চাদপদ নয়।

এদের সম্বন্ধে চিন্তা করলে সহজেই যে কথাটা মনে আসে—উন্মার্গগামী ভ্রষ্ট সন্তান, যারা পিতার কথা চিন্তা করে না, অথচ পৈতৃক সম্পদই যাদের উপজীব্য। এরাও তেমনি সকল প্রাণীর যিনি পিতা সেই ভগবানের কথা কেউ স্মরণ করে না, তাঁকে প্রাণের মধ্যে ধারণ করা তো কঠিন—যা সহজ, তাঁকে ভালও বাসে না কেউ। মানুষ যেন ভালবাসতেই ভুলে গেছে। অপর মানুষকেই কি যথার্থ ভালবাসে? স্ত্রী স্বামীকে কিম্বা স্বামী স্ত্রীকে? মাও কি সন্তানকে ভালবাসে? নিঃস্বার্থ ভাবে, আত্মবিসর্জন দিয়ে? সে দু-একজন মাত্র হয়তো পাওয়া যাবে—লক্ষ মানুষের মধ্যে। নইলে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে নিজের পথে চলতে গেলে মা বাবা তিক্ত হয়ে ওঠেন কেন? একই স্বামী বহুবিবাহ করেন, স্ত্রীরা স্বামীর মৃত্যুতে নিজের কি অবস্থা হবে, সেই চিন্তা করেই আকুল হন।

অথচ ঈশ্বরের নাম ক'রেই কত না হানাহানি! অপর ধর্মাবলম্বীরাও যে সব আচার অনুষ্ঠান করে—নিত্যকৃত্য, সেও তো ঈশ্বরকেই লক্ষ্য ক'রে। হয়ত অন্য নামে, অন্য অনুষ্ঠানে—কিন্তু তাতে কি এসে যায়? তবে একজন আর একজনকে এত ঘৃণা করবে কেন, এত বিদ্বেষের চোখে দেখবে কেন, তাদের হনন করতে চেষ্টা করবে কেন? এ নিজেদের বুদ্ধির অহঙ্কার ভিন্ন আর কিছু নয়—তারা যা ভেবেছে সত্য, তাই সকলকে মানতে হবে, যারা মানবে না, তাদের জোর ক'রে মানাবে। মূর্খ এরা, একবার নিজেদের সংসারের দিকে

চাইলেই তো বুঝতে পারে সে মূর্খতা। তাদের সব সন্তান একরকম হয় না, এক পথে চলে না, তবু তারা ভাইবোন, একই মাতাপিতার সন্তান, তাই নয় কি!

মনের মধ্যে এই প্রশ্নগুলি যতই উত্থিত হতে থাকে—ততই বোঝেন ভালবাসার পথ ছাড়া অন্য কোন পন্থাই নেই মানুষের।

ভালবাসা ও বিশ্বাস। পূর্ণ নির্ভরতা, পূর্ণ বিশ্বাস। ঐ মেয়ে দুটির মতো সরল অথচ অটল বিশ্বাস, আর অখণ্ড ভালবাসা। নিখাদ নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

এই ভালবাসাতেই ঈশ্বরকে পাওয়া যেতে পারে। একমাত্র এই উপায়।

তাঁর জন্যেই তাঁকে ভালবাসা। কোন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়, কোন প্রাপ্যর আশায় নয়। এমন কি নিজেকে রক্ষা করার জন্যও নয়।

কোন ঐহিক সুযোগ সুবিধার কথা মনে থাকলে সে ভালবাসা মনে জাগবে না। অর্থ, প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা,—নিজের রোগমুক্তি বা দীর্ঘ আয়ুর জন্য তাঁকে ভালবাসলে সে ভালবাসা ঈশ্বরের কাছে পৌছবে না। ঈশ্বরকে ডাকলে কি ভালবাসলে (তারা যাকে ভালবাসা ভাবে) এসব যারা ভাবে তারা নিজেদেরই প্রতারিত করে। কোনো পিতামাতা—সন্তান নিজ স্বার্থের জন্য তাঁদের তোষামোদ করছে, ভক্তিভালবাসার ভান করছে দেখলে সুখী হ'তে পারেন?

না, তাঁর জন্যই তাঁকে ভালবাসতে হবে, নিজের দেহ মন. অস্তিত্ব সমস্ত বিলোপ ক'রে দিয়ে সকল চিন্তাভাবনা ভালবাসা তাঁর মধ্যে বিলীন করতে হবে, একাত্ম হতে হবে।

সে-ই পরিপূর্ণ শান্তি। তিনিই প্রাণের আনন্দ, আত্মার আরাম। তিনিই সুখ, তিনিই আশা।

এই ভাব মনে আসাই বুঝি পরম ও চরম পাওয়া, যার বেশী আর কোন প্রাপ্য আশা তো দূরের কথা—কল্পনা বা চিহ্নিত নির্দিষ্ট করাও যায় না।

কিন্তু সে ভালবাসা কি অনন্ত আকাশ, এই অগণিত গ্রহনক্ষত্রযুক্ত বিশ্ব বর্ণনাতীত ধারণাতীত, অনন্ত স্বরূপ, যাকে পণ্ডিতরা নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ অখণ্ড ব্রহ্ম বলেছেন—তাকে অবলম্বন ক'রে বিকশিত হওয়া সম্ভব! যে অস্তিত্বকে কিছুতেই মনে বা মস্তিষ্কে ধারণা করা যায় না—শুধু একের পর এক

বিশেষণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন ঋষিরা—তাকে ভালবাসা যায়? মন প্রাণ আকাঙ্ক্ষা বাসনা কামনা দিয়ে তাকে অর্চনা করা যায়, আবেগ দিয়ে তাকে আকর্ষণ করা যায়!

তা যায় না বলেই মানুষ মূর্তি গড়ে পূজা করতে চায়, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে, গোষ্পদজলের মধ্যে আকাশকে ধরতে চায়। কেউ মূর্তি পূজা করে, কেউ প্রস্তর খণ্ডকে তাঁর প্রতিনিধি ভাবে, কেউ বা বিশেষ আকৃতির কাষ্ঠখণ্ডকে তাঁর প্রতীক কল্পনা করে। বরং এ সবের থেকে মূর্তিকে পূজা করা আরও সহজ।

তবে তাতেই কি তাঁকে ভালবাসা যায়?

ভালবাসে কি মানুষ? ভালবাসতে পারে?

কে জানে, কেউ হয়ত পারে।

যুগে যুগে এক-আধজন এমন মহাপুরুষ জন্ম নেন যাঁদের দ্বারা এই অসাধ্যও সাধিত হয়।

বিশ্বেশ্বর অন্য কথা ভাবেন।

মনে হয় একটি পরিচিত কাউকে, তাকে না দেখলেও ক্ষতি নেই—অবলম্বন ক'রে তাঁকে এই ভাবে আত্মলোপ ক'রে—সুখদুঃখ দেহ সব লোপ ক'রে ভালবাসতে পারলে সে ভালবাসা একদিন সেই পরম অস্তিত্ব, পরম শক্তির কাছে পৌঁছতে পারে—যাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা পাবার চেষ্টা করে, পূজা করে। হয়ত ভালবাসছে ভেবে আত্মপ্রতারণা করে। কেউ হয়ত চেষ্টাও করে।

শুনেছেন, কঠোর তপস্যার দ্বারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন মতাবলম্বীর কোন কোন সাধুসন্ত, মুনিঋষিরা নিজেদের সেই ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম ক'রে দিয়েছেন। যাকে হিন্দুরা বলেন নির্বিকল্প সমাধি।

হয়ত তা পারা যায়। কিন্তু সে তপস্যা বড় কঠিন, বড় কঠোরও।

তাতে মাধুর্য কোথায়? এ জীবন, এ দেহ কি ভগবান সৃষ্টি করেছেন শুধু কঠিন তপস্যার দ্বারা ক্ষয় করতে, নষ্ট করতে?

না, তা হ'তে পারে না।

এই সুন্দরী শ্যামা বসুন্ধরা—তার ফুল ফল রূপ রস গন্ধ, এই সূর্য চন্দ্র, নক্ষত্র-খচিত আকাশ, অন্তহীন মাধুর্যে ভরা এই সৃষ্টি যিনি করেছেন—মধুর রসই কি তাঁর প্রিয় নয়? সেই ভেবেই নানান পুষ্প, সুমিষ্ট ফল, শ্রেষ্ঠ আহার্য দিয়ে

মানুষ পূজা করে।

না তিনি নিজেই মধুর, মধুরতর, মধুরতম। তাঁর চেয়ে মধুর আর কিছু নেই। মাধুর্য দিয়েই তাঁকে সেবা করতে হবে।

আর, প্রেম ভালবাসার মতো মধুর কি আছে?

ঈশ্বরও নিশ্চয়ই আমাদের কাছে তাই চান। পুরাণের অসংখ্য কাহিনীও তো সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

বহুদিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বিশ্বেশ্বর মন স্থির ক'রে ফেলেন। এই পথেই তিনি ঈশ্বরকে লাভ করবেন।

আত্মবোধহীন, তদ্গতপ্রাণ ভালবাসার দ্বারা। লাভ করতে পারুন বা না পারুন, ভালবাসার মাধুর্য তো অন্তত উপভোগ করতে পারবেন।

অকস্মাৎ নবদ্বীপের গতানুগতিক নিস্তরঙ্গ জীবনে একটা আলোড়ন দেখা দিল।

কে এক সন্ন্যাসী, উচ্চকোটির সাধক একজন এসেছেন ব্রহ্মস্বরূপ আচার্যের গৃহে।

বেদান্তবাদী এই আচার্য নিজেও সাধক। গৃহস্থ সাধক, প্রধানত জ্ঞানমার্গ-পন্থী। সেইজন্যেই কতকটা বিশ্বেশ্বর তাঁকে পরিহার ক'রে চলেন। আচার্য নিজে উপযাচক হয়ে মধ্যে মধ্যে আসেন—এই তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা করতে, অর্থাৎ তাঁকে দিয়ে নিজের মত সমর্থিত করতে। কিন্তু বিশ্বেশ্বর সেদিক এড়িয়ে যান, যথার্থ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে তর্কে পরাস্ত করতে মন চায় না।

আচার্যের গৃহে এই সন্ন্যাসীর আগমন সংবাদ পেলেন বিশ্বেশ্বর জননীর কাছেই।

সেদিন দ্বিপ্রহরে এঁদের ভোজন সমাপ্ত হলে তিনি বললেন, 'বিশাই, আজ তুই বাড়িতে থাক একটু। কোথাও যাস না। আচার্য ঠাকুরের ওখানে কে এক সন্ন্যাসী অনুগ্রহ ক'রে পদার্পণ করেছেন, তাঁকে একবার দর্শন করতে যাব এখন। বৌমা একা থাকবেন, সেটা ঠিক হবে না। ছেলেমানুষ ভয় পাবেন হয়ত।'

'কেন, গঙ্গাদাস দাদা নেই?'

গঙ্গাদাস মূলত ওঁদের কৃষাণ, বহুদিনের প্রবীণ লোক, সে-ই যথাসাধ্য এঁদের সংসারের সাধারণ দায়িত্বগুলো বহন করে। বিশ্বেশ্বর প্রায়ই গৃহে থাকেন না,

বস্তুত সে-ই এই দুটি নারীকে পাহারা দেয়।

ইন্দ্রাণী বললেন, 'সে পাগলারও তো সাধু দেখা বাতিক কম নয়। কোনমতে সংসারের কাজগুলো সেরে ছুটেছে সেখানে। খেতেও আসে নি। হয়ত সেখানেই প্রসাদ পাবে। আচার্য ঠাকুরও নাকি সেইমতোই ব্যবস্থা করেছেন, কোন দর্শনার্থীরা যাতে অভুক্ত না ফেরে।'

বিশ্বেশ্বর আর কিছু বললেন না। ইন্দ্রাণীকে বাধাও দিলেন না।

তখন অত কিছু মনেও হয় নি।

কিন্তু তখন থেকেই এই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে একটা কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। পরে বধূর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে সঙ্কল্পটাও আকার ধারণ করল।

মাধবীই কথাটা তুললেন, 'আপনি যাবেন না? শুনেছি খুব বড় সাধু, যথার্থ সংসারবিমুখ। সকলেই তাই বলছে।'

বিশ্বেশ্বরের মনে হ'ল, তাঁর মনের কথাটাই মাধবী উচ্চারণ করলেন।

একটু যেন ব্যগ্রভাবেই বললেন, 'যাবো? তুমি বলছ! বেশ, মা আসুন —সন্ধ্যার দিকে যাবো। তুমি যাবে?'

'ওমা, ছিঃ! লোকে আপনাকে—। না, না। সে হয় না। মা'র সঙ্গে গেলেও কথা ছিল। তিনি যখন বলেন নি, তখন বোধ হচ্ছে এত ভিড়ের মধ্যে আমাকে নিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। তা বাদে, সন্ধ্যার্চনার আয়োজন, গৃহে সন্ধ্যাদীপ দেখানো—অনেক কাজও তো আছে। আপনিই যান।'

আর কথা বাড়ালেন না বিশ্বেশ্বর।

ইন্দ্রাণী দেবী ফিরে এলে উত্তরীয়খানা কাঁধে ফেলে তখনই বেরিয়ে গেলেন।

আচার্যগৃহে তখন যেন জনসমুদ্রর সৃষ্টি হয়েছে। তথাপি, বিশ্বেশ্বরকে দেখে সকলেই কিছু সচেষ্ট হয়ে পথ ক'রে দিলেন।

আচার্যদেব চণ্ডীমণ্ডপে একটি কাঠের চৌকির উপর নিতান্ত অনাড়ম্বরে সাধু বসে আছেন। তবু এই সাধুকে দেখতেই যে এই বিপুল জনসমাগম—তা বুঝতে অসুবিধা হ'ল না। প্রথমেই যেটা লক্ষ্যে এল, কাঠের চৌকির উপর কোন প্রকার আসন নেই, কৃত্তি বা অজিন-আসনও একখানা পাতা হয় নি।

তবে এ তো তুচ্ছ। সাধুর মুখের দিকে চেয়ে আর চোখ ফেরাতে পারলেন

না। এমন শান্ত, প্রসন্ন অথচ উদাস দৃষ্টি, এত মাধুর্যে ভরা অথচ নিরাসক্ত এর আগে কারও চোখে দেখেন নি বিশ্বেশ্বর। এ সাধু এ শহরের তথাকথিত সাধকদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। আচার-(কদাচারই অধিকাংশ ক্ষেত্রে) অনুষ্ঠানের মধ্যে অসংখ্য বিধি-নিষেধের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি, তার অনেক ঊর্ধ্বে উঠেছেন।

চণ্ডীমণ্ডপের উপরে ওঠার মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিছলেন বিশ্বেশ্বর—এবং দাঁড়িয়েই ছিলেন—একদৃষ্টে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে। আচার্যদেব এতক্ষণ ভিড় কিছুটা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছিলেন, তাঁকে দেখতে পেয়ে এবারে ভিড় ঠেলে কাছে এলেন, বললেন, 'ইনিই পরিব্রাজক শ্রেষ্ঠ মহাত্মা পরমেশ্বর পুরী, সর্বজন-পূজ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণেন্দ্র পুরীর প্রধান শিষ্য। আমাদের পরমভাগ্যে নবদ্বীপে পদার্পণ করেছেন।'

এতক্ষণ পরমেশ্বরের দৃষ্টি সামগ্রিক ভাবে সেই সমবেত জনতার উপরে আবদ্ধ ছিল। এখন আচার্যের কণ্ঠস্বরে যেন সচেতন হয়ে উঠে বিশেষ ভাবে এদিকেই তাকালেন।

তখনও অপরাহ্ণ বেলা সন্ধ্যার কৃষ্ণাঞ্চলে আত্মগোপন করে নি, দিন-শেষের আলোক পশ্চিম আকাশে দীপ্যমান, যেন বিদায় নেবার পূর্বে সিন্দুরবর্ণ ধারণ ক'রে আগামী তামসী নিশার অচির-অবসান ঘটবে এই আশ্বাস ঘোষণা করছে।

সে অপরূপ লালিমা সেই মুহূর্তে যেন দৈব-ইচ্ছাতেই বিশ্বেশ্বরের উপর এসে পড়েছিল।

সুগঠিত দীর্ঘ দিব্য দেহ, অনিন্দ্যসুন্দর আনন, ঈষৎ আরক্ত ললাট কপোলে পথশ্রমজনিত বিন্দু বিন্দু ঘর্ম—কবির ভাষায় 'স্বেদমকরন্দ তাহে বিন্দু বিন্দু চুয়ত'—এবং পদ্মপলাশতুল্য আয়ত চক্ষুর বিস্ফারিত স্থির-নিবদ্ধ দৃষ্টি—দেখে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও যেন কিছু কালের জন্য মুগ্ধ অভিভূত হয়ে গেলেন।

কিন্তু সে কয়েক নিমেষ মাত্র। সে মোহ অপগত হ'তেও বিলম্ব ঘটল না।

যেন কা এক অজ্ঞাত আঘাতে সচকিত চ"কিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। পরক্ষণেই ত্বরিত গতিতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে একেবারে বিশ্বেশ্বরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরও তখন চক্ষু বিস্ফারিত—সে চোখে এক যেন বিপুল বিস্ময়, অবিশ্বাস্য অভূতপূর্ব কিছু দর্শন করলে মানুষের চোখে যেমন বিস্ময় দেখা

দেয় তেমনি।

বিশ্বেশ্বর দেখলেন সাধুর সমস্ত দেহ কী এক নিরুদ্ধ আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে, বিশেষ হাত দুটি স্পষ্টতই কাঁপছে থর থর ক'রে। বুঝি ওঁর হাত ধরারই চেষ্টা করলেন একবার কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না, অবশ অবাধ্য হাত সেখানে পৌঁছল না।

বেশ কিছু চেষ্টার পর পরমেশ্বরের বাক্যস্ফূর্তি হ'ল। যেন একপ্রকার আকুলিবিকুলি ক'রে বলে উঠলেন, 'আচার্য, এ—এ কে? কী আশ্চর্য, এ কাকে দেখছি! সত্য পরিচয় দাও তুমি কে। তোমাকে দেখা মাত্র আমার দেখা এমন পুলক শিহরণ জাগল কেন, কেন এমন হর্ষরোমাঞ্চ দেখা দিল। তোমার সঙ্গে আমার যেন জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক--যেন বোধ হচ্ছে তুমি আমার চিরকালের, তুমি আমার ইষ্ট—'

বলতে বলতেই তিনি কেমন কাষ্ঠবৎ স্থির হয়ে গেলেন। চক্ষু বিস্ফারিত কিন্তু তাতে দৃষ্টি নেই। দেহটা কাঠের মতোই পড়ে যেত—যদি না এটাকে ভাব-সমাধি বুঝে আচার্য ধরে ফেলতেন।

তাকে সযত্নে চৌকিতে শুইয়ে আচার্য ব্রহ্মস্বরূপ তাঁর কানের কাছে হরিনাম করতে লাগলেন—চৈতন্য আনয়নের চেষ্টায়।

॥ ৭ ॥

পরমেশ্বর পুরী বিশ্বেশ্বরের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, বেশ অনেকক্ষণ। যেন একটা কিছু নিরীক্ষণ করছেন—যেমন অদৃশ্য কোন লেখা পাঠ করার চেষ্টা করছেন, যা মানুষের মুখেই লেখা থাকে কিন্তু সাধারণ মানুষ পড়তে পারে না।

অথচ এই অনুরোধেরই আশা করেছিলেন তিনি, বলা চলে অপেক্ষা করছিলেন।

বোধ করি সেই প্রথম দিনটি থেকেই—যেদিন অকস্মাৎ তাঁর মনে ও মস্তিষ্কে প্রবল এক ভাবের আলোড়ন উঠে তাঁকে ক্ষণিকের জন্য বাহ্যচৈতন্যহীন ক'রে দেয়।

সে ভাব কি তা তিনি জানেন না, প্রেম না তার থেকেও বেশী কিছু—

তখনও বুঝতে পারেন নি, এখনও পারছেন না। কেমন যেন মনে হয়, এখন মনে হয়—তাঁর ইষ্টদর্শনের রোমাঞ্চ-শিহরণ জেগেছিল সর্বাঙ্গে, মন এক বিপুল পুলকের বাত্যায় নিমজ্জিত হ'তে বসেছিল প্রেমের অতল সমুদ্রে।

এত বৎসরের সাধনাতেও এ অনুভূতি জাগে নি ইতিপূর্বে—এই তরুণ কিশোরটিকে দেখে যা জাগল। আর সেই থেকেই মনে একটা সন্দেহ ক্রমে ক্রমে তাঁর চিন্তাভাবনায় আকার গ্রহণ করছে—এ বুঝি বিধাতার, না, তাঁর ইষ্টেরই যোগাযোগ। এ বুঝি তাঁর প্রারব্ধ—বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য।

ঈশ্বরের অবতার কিনা জানেন না, তবে এই ছেলেটি যে ঐশ্বরিক বিভূতি-সম্পন্ন তাতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে স্পর্শ করা মাত্র এমন একটা সর্বাঙ্গ-বিহ্বল-করা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জাগত না মনে। তার পরেও, সেই প্রথম দর্শনের বিস্ময়কর অনুভূতির পরেও দেখেছেন স্পর্শ ক'রে। বারবারই দেখেছেন। ছেলেটি নিত্য তাঁকে প্রণাম করে—প্রতিবারই একটা অকারণ অবর্ণনীয় রোমাঞ্চ জাগে তাঁর দেহে, মনে আসে অননুভূতপূর্ব বিহ্বলতা।

বোধ হয় এই মহামানবকে সাধনার পথে অগ্রসর করার জন্যই পরমেশ্বর পুরাকে এ পথে পাঠিয়েছেন ঈশ্বর। যখন কোন অবতার বা লোকোত্তর-বিভূতি-সম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব হয়, মনুষ্যত্রাণের জন্য—তখন, তাঁর জীবনকে সাধনাকে বিকশিত করতে, অনুকূল অবস্থা রচনা করতে পূর্ব থেকেই কিছু কিছু তাঁর চিহ্নিত লোকের আগমন হতে থাকে।

পরমেশ্বর পুরী আজ এখানে এসে বুঝলেন কথাটা।

এই জন্যই তাঁর জন্মগ্রহণ, তীব্র বৈরাগ্য-বোধ, সন্ন্যাসের বাসনা—এবং বিখ্যাত তপস্বী মধুসূদন পুরীর পদাশ্রয় লাভ।

এ সেই লীলাময়েরই খেলা।

মহাচতুর সেই মনুষ্যদেহধারীরই লীলা—যাকে ইষ্টজ্ঞানে পূজা করেন পরমেশ্বর, যাঁকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করার জন্যই এতদিনের সাধনা তাঁর—যাকে শুধু ভক্তি নয়, ভালবেসে ফেলেছেন তিনি।

সুতরাং এ ছেলেটি তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে চাইবে তা তিনি অনুমানই করেছিলেন।

আশা বা অপেক্ষাই করছিলেন এ অনুরোধের—অনুনয়ের।

তবে এ দ্বিধা কেন? কেন আরও কিছু জানার আগ্রহ। ওঁর ইষ্টের কোন

লিপির অনুসন্ধান—এর মুখে, প্রশস্ত বেদনার্ত ললাটে, অবর্ণনীয় সুন্দর দুটি চোখের আশ্চর্য দৃষ্টিতে ?

এর উত্তর কি পেলেন কে জানে—হয়ত কোন উত্তর পেলেন না বলেই বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি দীক্ষা চাও আমার কাছে ? আমার পথ আর তোমার পথ তো এক নয়। তুমি বেদান্ত-জ্ঞানী—বেদান্ত কেন সকল শাস্ত্রেই পারঙ্গম, তা এই ক'দিনেই বুঝেছি—তোমার লক্ষ্য নিশ্চয়ই সেই পরমব্রহ্ম, তাই নয় কি ? জীবজগতের পরমকারণ মূল সত্তা এক অখণ্ড অদ্বয় পরব্রহ্ম—বেদান্তোক্ত এই জ্ঞানযোগই তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু আমি সে পথের পথিক নই। কেউ কেউ আমাকে সাধক বলে, তপস্বী বলে—আমি জানি আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাস—না, দাস বলার স্পর্ধাও রাখি না, আমি কীটাণুকীট, তাঁর প্রেমরস আস্বাদনের যোগ্যতা নেই, লোভ আছে। তোমার পথ আমার পথ তো এক নয় বাবা।'

বিশ্বেশ্বর যেন সহসা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে বলেন, 'কিন্তু প্রভু সাধারণ মানুষের তো এ ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নেই। অধিকার তো দূরের কথা—এ সম্বন্ধে ধারণামাত্র নেই। এ তাদের পক্ষে বহুদূরের কোন বস্তু, শব্দটা মাত্র শুনেছে কেউ কেউ, সেও স্বল্প দু-চারজন—কেউ তাও শোনে নি। শুধু শিক্ষাতেও হয় না, এমন কি বহু উচ্চশিক্ষিত লোকও দেখেছি—তারা কেউ ঐ বেদান্তোক্ত জ্ঞানযোগের অধিকারী হ'তে পারেন নি। বরং তাঁরা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা সর্বসাধারণের মনে আরও জটিলতার সৃষ্টি ক'রে গেছেন।…প্রভু, নানা দেশ ঘুরে দেখলাম, যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি, এতকাল বর্ধিত হয়েছি, সেখানের মানুষ তো দেখছিই—সাধারণ মানুষের বড় দুঃখ। তারা জ্ঞান শিক্ষা তপস্যার কথা কিছু জানে না, বোঝে না, অহমিকা-সার পণ্ডিতদের উপদেশ নির্দেশের দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হয় না। বরং বহু ভ্রষ্টাচারী সাধক, গুরুনামধারী—তাদের কদর্য সাধনপদ্ধতিতে ঐ সব অবোধ মানুষদের বিপথে নিয়ে গিয়ে অধিকতর দুঃখের কারণ হচ্ছে। আমি চাই সহজ সরল সাধনার মধ্য দিয়ে, অন্তরের প্রেমভক্তির মধ্য দিয়ে ভগবদ্ প্রেমমাধুর্যের স্বাদ পাক তারা, দেহজ দুঃখ, সংসারের নানা কষ্ট দুঃখ নিপীড়ন থেকে উত্তরিত হয়ে এক পরম আশ্রয়ে গিয়ে পৌছাক, আমিও ঐ ভাবেই তাঁকে চাই, আপনি সেই পথই আমাকে দেখান।'

আবারও ওঁর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে নীরবে বসে রইলেন পরমেশ্বর পুরী ! তারপর পূর্ববৎ ধীর ভাবে বললেন, 'কিন্তু তুমি ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী, সাধন-চতুষ্টয়ের উত্তম আধার। তা এই ক'দিনেই বুঝেছি। তুমি কেন এ সুযোগ ত্যাগ করবে ?'

এবার বিশ্বেশ্বর প্রতিপ্রশ্ন করেন, 'আপনি কেন ঐ সাধনার পথ পরিত্যাগ করলেন ? আপনিও তো উত্তম অধিকারী একজন।'

'না, আমি তোমার মতো এতটা অগ্রসর নই। তুমি জ্ঞানমার্গের সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করেছ। সাধকমাত্রেরই যা চরম লক্ষ্য ও পিপাসা, ব্রহ্মে লীন হওয়া, ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি, তা তোমার কাছে সহজলভ্য। অনায়াসেই পেতে পারো। এমন সুযোগ ত্যাগ করছ কেন ?'

'না প্রভু', এবার কিছু দৃঢ়স্বরেই উত্তর দেন বিশ্বেশ্বর, 'আমি এই পরম বস্তু একা—স্বার্থপরের মতো সম্ভোগ করতে চাই না। আমি চাই এমন সাধনার পথ যে পথে গিয়ে আপামর সাধারণ পাপীতাপী দুর্বল অজ্ঞান মানুষ, ভিন্ন-ধর্মমতাবলম্বী মানুষও—ইহ জীবনের যা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্য, সর্বোত্তম ঈপ্সার বস্তু, সেই ভগবদ্‌প্রেমের স্বাদ লাভ করতে পারে। আমি নিজেও সেই পথেই যেতে চাই, শুষ্ক জ্ঞানমার্গে আমার আনন্দ নেই।'

পুনশ্চ এক অখণ্ড নীরবতা। কিছুক্ষণ পরে পরমেশ্বর পুরী বললেন, 'তুমি কি দীক্ষা চাও ? কোন্ ইষ্টকে তুমি এই অভিনব সাধনমার্গের যোগ্য লক্ষ্য বলে বিবেচনা করো ? সে কথা কি ভেবে দেখেছ ?'

'ভেবেছি প্রভু, অনেক ভেবেছি। কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারিনি। সেই কারণেই আমার আরও এত ব্যাকুলতা। জানকীনাথ রামচন্দ্র আমাদের গৃহদেবতা। তাঁকে ভক্তিও করি যথেষ্ট—কিন্তু আমি চাই ভালবাসতে। মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে। একজন দেহীকে বা দেহধারীকে যতটা ভালবাসতে পারে মানুষ—যে ভালবাসায় দেহভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়ে ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করা যায়। আমি কিন্তু ব্রহ্মে লীন হতে চাই না—আমি চাই তাঁকে ভালবাসার মাধুর্য উপভোগ করতে। মক্ষিকার মতো মধুর আস্বাদ চাই, মধুর পাত্রে নিজেকে নিঃশেষ করতে নয়।'

বলতে বলতে সহসা যেন আকুল হয়ে ওঠেন বিশ্বেশ্বর আচার্য, 'ঠিক কি চাই তা বুঝি আমিও জানি না, বুঝতে পারি না। ঈশ্বরকে চাই আমি—তাঁর

প্রেমে ডুবে থাকতে চাই—তার বেশী কিছু ভাবি নি, ভাবতে পারি না। আপনিই বলে দিন কি করব; কার কথা ভাবব।'

তার পর আর কিছুক্ষণ নীরব থেকে, আবেগের শ্রান্তি কিছুটা নিরসন ক'রে নিয়ে বলেন, 'এমন কে আছেন মহাপুরুষ বা অবতার—যাঁকে আমি এমনি ভালবাসতে পারি—মনপ্রাণ-সর্বস্ব দিয়ে, যিনি আমার সমস্ত চিন্তায় ভাবনায় কল্পনায় স্বপ্নে মিশে যাবেন, যাঁকে ঘিরে আমার মন নিত্য সেবার রসাস্বাদ করবে, যাঁর অস্তিত্বে আমার অস্তিত্ব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে, আমি বলতে আর কিছু থাকবে না—এমন একজনের কথা আমাকে বলুন।'

আবারও দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

এবার পরমেশ্বর শুধু নির্বাকই রইলেন না, দুই চক্ষুও নিমীলিত করলেন।

তবে কি তেমন কোন ইষ্টকে ধ্যানে পাবার প্রয়াস পাচ্ছেন? তেমন কোন মহামানব—যিনি মানবোত্তর মহাপুরুষ, ঈশ্বরের সর্বৈশ্বর্য যাঁর মধ্যে বিদ্যমান, অথচ যিনি সামান্য মানব-মানবীর প্রেমে ধরা দিয়েছেন?

বহুক্ষণ পরে যখন চোখ খুললেন পুরীজী, বিশ্বেশ্বর দেখলেন তাঁর দুটি চক্ষুই অশ্রুপ্লুত।

তবে এ অশ্রু বোধ করি বেদনার নয়, মনে হ'ল এ প্রেমাশ্রু। এই স্বল্পক্ষণ চিন্তার ফল।

পুরী ধীরে ধীরে বললেন, 'আচার্য, তেমন একজনকেই আমি জানি, যিনি আমার সমস্ত মন—সকল চিন্তা ভাবনাকে মাধুর্যে পূর্ণ ক'রে রেখেছেন—যাঁকে ধ্যান করতে বসলে প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়—প্রেমরসে পূর্ণ সে সময়ে আহার নিদ্রা, এ দেহ এ বাস্তব জীবনের কোন কিছুই স্মরণে থাকে না—কিছুরই প্রয়োজন হয় না; তোমারই কল্পনামতো যাঁকে আমার সর্বাঙ্গে সর্ব অস্তিত্বে মিশিয়ে ফেলার সাধনা আমার—তিনি হলেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। যিনি রাজনীতিক, যোদ্ধা, দার্শনিক—আবার সেই সঙ্গে প্রেমেশ্বরও, সরলা গোপকন্যারা যাঁকে সহজ প্রেমেই লাভ করেছিল; অথচ মুনিঋষিরা সহস্র বর্ষ তপস্যাতেও যাঁর করুণা লাভ করতে পারেন না। বৎস, তিনি ছাড়া আর কারও কথা আমি জানি না, শ্রেষ্ঠতর কোন দেহধারীর কথা ভাবতে পারি না।'

বিশ্বেশ্বর সাগ্রহে সবেগে তাঁর দুটি চরণ স্পর্শ ক'রে বললেন, 'আমাকে সেই

ইষ্টই দিন—তাঁরই সাধনার দীক্ষা। আর তাঁর কথা বলুন, আরও, আরও। তাঁর অত্যাশ্চর্য জীবন কথা। আমি শুনেছি, শ্রীমদ্ভাগবতও পাঠ করেছি—তবে তাতে কিছুই জানা হয় নি। আপনি বলুন। অধিকারীর কাছ থেকেই দিব্য প্রসঙ্গ শুনতে হয়। আপনি সেই সঙ্গে আমাকে শ্রীকৃষ্ণ-সাধনার দীক্ষা দিন, সেই প্রেমরসের ভাগী করুন—যা আপনাকে এমন ভাবে জারিত করেছে।'

মাথা নাড়লেন পরমেশ্বর।

'না, এত দ্রুত এসব কাজ করতে নেই বৎস। বৎসই বললাম, যদিচ আমার বিশ্বাস তুমি আমার প্রণম্যই হবে একদা। আগে তাঁর কথা জানো, চিন্তা করো—তাঁকে ভগবান বলে ভাবতে পারো কিনা মনে মনে বিচার করো—তারপর দীক্ষার প্রশ্ন উঠবে, তার পূর্বে নয়।'

তারপর ঈষৎ গাঢ়স্বরে বললেন, 'আমি অনেকদিন ধরেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করছিলাম, কিন্তু সে বিপুল, অনন্ত, সাক্ষাৎ-ব্রহ্ম বৃত্তান্তর যেন কূল পাচ্ছিলাম না। বলতে গেলে দৈব নির্দেশেই এখানে এসেছি। কারণ, তোমাকে দেখামাত্র যেন বিপুল এক উদ্দীপনা অনুভব করেছি। কেন, কিসের সে প্রেরণা, তা আজও জানি না। তবে তার ফলে এই এক মাস কালে সে পুঁথি শেষ হয়েছে। তোমাকেই প্রথম পাঠ করতে দেব সে গ্রন্থ। তুমিই উত্তম পাঠক, ঐ অমৃততত্ত্বের উত্তম আধার।'

তারপর, ক্ষণকাল মৌন থেকে পুনশ্চ বললেন. 'সেই গ্রন্থ পাঠ করার পরও, তুমি অন্তত দুই মাস কাল এ নিয়ে চিন্তা করবে। আমি আগামী কালই এ স্থান ত্যাগ করব, এ পুস্তক তোমার কাছেই থাক, পারো তো কাউকে দিয়ে একটা নকল করিয়ে নিও।'

'তার পর?' বিশ্বেশ্বর ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, 'আবার কবে আপনার দর্শন পাবো?'

'তুমি বলছিলে না, পিতৃকৃত্য করতে গয়াধামে যাবে? এই গ্রন্থ শেষ হলে তুমি শুভদিন দেখে গয়া যাত্রা ক'রো। ইহলোকের এ একটা প্রধান ঋণ, প্রধান কর্তব্য--পিতৃকৃত্য সম্পূর্ণ করা। আমিও ঐ দুই মাস কাল পরে গয়াধামে তোমার সঙ্গে মিলিত হবো। যদি তখনও তোমার এই প্রবল ইচ্ছা থাকে—এবং শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়—সেই পুণ্যক্ষেত্রেই তোমাকে দীক্ষা দেবো। তবে তুমি তৎপূর্বে ভাল ক'রে ভেবে দেখো, নিজের মনের প্রকৃত অবস্থা বোঝার

চেষ্টা ক'রো।'

॥ ৮ ॥

ভাল ক'রে ভেবে দেখার, নিজের মনের প্রকৃত গতি ও ঈপ্সা,—বিচার করার কোন চেষ্টা করেন নি বিশ্বেশ্বর, একথা বললে পুরোপুরি সত্য বলা হয় না।

আসলে সে অবস্থাই আর তাঁর ছিল না। পরমেশ্বর পুরীর গ্রন্থপাঠ করার পর—তিনবার আত্মস্ত পড়েছিলেন উনি—এমনই একটা বিহ্বল আচ্ছন্ন অবস্থা হয়েছিল বিশ্বেশ্বরের যে, আর কোন কিছু চিন্তা বা বিচার করার শক্তিই ছিল না। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বরসে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিরাট পুরুষ অথচ প্রেমময়; সমস্ত জগতের প্রতি তাঁর অপরিসীম করুণা, পীড়িত লাঞ্ছিত মানুষকে ত্রাণ করার জন্য, পাপীদের দমন করার জন্যই তাঁর বিরাট ও প্রায়-সর্বনাশী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আয়োজন—এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্য।

পরমেশ্বর প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন—ইতিপূর্বে যে সব মহামানবদের আমরা অবতার বলে অভিহিত করেছি—তাঁরা ঈশ্বরের অংশমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্ববিভূতিময়, সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিস্থিতিলয়ের নিয়ন্তা শুধু নন—তিনিই পরম কারণ। যাঁর ইচ্ছামাত্রে এই অন্তহীন বিপুল বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে; এই বিশ্ব যার মধ্যে লীন অথচ যিনি অনায়াসে তার মধ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে পারেন; যিনি একাধারে পুরুষ ও প্রকৃতি, অথচ অবলীলাক্রমে দুই পৃথক সত্তায় রূপান্তরিত হ'তে পারেন—সেই শ্রীকৃষ্ণ মানুষের ঐকান্তিক প্রেমে, সহজ ভালবাসায় ধরা দিয়েছেন, দিয়ে থাকেন। তিনিই পরম প্রভু অথচ বার বার যেন স্বেচ্ছায়, সানন্দে সাগ্রহে ঐকান্তিক প্রেমে সেবকদের সেবকত্ব করেছেন।

এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য—বিরাটতম চরিত্রের এই জটিলতা, নানা পরস্পরবিরোধী তথ্যকে পরমেশ্বর যুক্তিগ্রাহ্য ক'রে তুলেছেন—সে পরমপুরুষের বিরাটত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না ক'রে।

এবং এক আকাঙ্ক্ষিত বিরাট আশ্বাসকে বিশ্বাস্য করেছেন।

ঠিক যে আশ্বাস বিশ্বেশ্বর চাইছিলেন—সেইটেই দিয়েছেন। পরম প্রেমের সঙ্গে পরম প্রেমের যে মহামিলন কল্পনা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ঠিক সাহস হচ্ছিল না খুঁজে পাচ্ছিলেন না তার নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র—সেই মিলনেরই

সন্ধান দিয়েছেন।

আর কোনদিকে তাকাবেন না বিশ্বেশ্বর, আর বৃথা অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবেন না। তাঁর পথ তিনি পেয়ে গেছেন।

দূর তীর্থযাত্রার দীর্ঘ পথে আরও অনেক লোক তাঁর দৃষ্টিপথে পতিত হ'ল। তাদের দুঃখদুর্দশা, সর্বোপরি তাদের ধর্মাচরণের বিভ্রান্তি তাঁর ব্যথিত হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করল।

এরা সরল, এরা সৎপথে জীবন অতিবাহিত করতে চায়, ভগবানকে ডাকতে চায় কিন্তু নানা পথ, নানা মত, নানা নায়কের পরস্পরবিরোধী নির্দেশে—পাণ্ডিত্যের জটিলতায় দিশা পায় না।

এদের ব্যথা নিজের অন্তর্গূঢ় দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করেন, করুণাভরা অন্তরে অনুভব করেন—এদের বেদনা ও অসহায়তা।

দেখছেন, শুনছেন, অনুভব করছেন—তত্রাচ সমস্ত পথটাই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন।

তাঁর সঙ্গী—আত্মীয় বান্ধব ও ছাত্ররা তাঁর মুখে শাস্ত্রবাক্য শুনতে চান; বিশেষ তাঁদের যাত্রাপথে আরও কিছু কিছু তীর্থ ও বহু বিখ্যাত জনপদ পড়ছে—তাদের ইতিহাস বা মাহাত্ম্য—এই প্রায় সর্বজ্ঞ পণ্ডিতের কাছ থেকে শ্রবণ করার একান্ত আগ্রহ ও ঔৎসুক্য তাঁদের—কিন্তু বিশ্বেশ্বরের এসব আর ভাল লাগে না।

পাণ্ডিত্য প্রদর্শন, অর্থাৎ তর্ক বা বিচার কিম্বা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতে যেন এক প্রকার অরুচি জন্মেছে তাঁর। তিনি চান নির্জনে নির্বাক থেকে পরম চিন্তায় মগ্ন থাকা—যার আলোচনা অধিকারী ব্যতীত আর কারও সঙ্গে করা যায় না।

এ মনোভাব সত্ত্বেও তীর্থকৃত্যে কোন ত্রুটি ঘটে না।

ফল্গুতে স্নান, গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান ও ব্রাহ্মণসেবা প্রভৃতি যা কিছু করণীয় সবই করেন। সেই সময়টা অন্যমনস্কতা পরিহার ক'রে পিতৃদেবকে একাগ্র স্মরণ করার চেষ্টা করেন। পারেনও, নিজের অতিমানবিক মনোবলে।

পিতৃকৃত্য সমাপ্ত হ'তেই সংবাদ পেলেন পরমেশ্বর পুরী গয়াধামে এসে পৌঁছেছেন। যেন ওঁর ঐহলৌকিক কর্তব্য সমাপ্ত হওয়ার জন্যই নিকটে

কোথাও অপেক্ষা করছিলেন।

অতঃপর বিশ্বেশ্বর নিশ্চিন্ত হয়েই এই সাধুসঙ্গে কটা দিন অতিবাহিত করবেন, সেইটেই স্বাভাবিক।

তিনি নিজে রন্ধন ক'রে সাধুকে ভিক্ষা দেন—পরে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করেন। তদ্ব্যতীত অবশিষ্ট সময়টুকু, দৈহিক প্রয়োজনের সামান্য কাল বাদ দিয়ে—তাঁর সঙ্গে ভগবদালোচনাতেই কাটে। রাত্রের নিদ্রাকে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপিত ক'রে নিয়েছেন বোধহয় এক প্রহরের বেশী তাতে ব্যয় করেন না।

আর, যতই আলোচনা করেন, যতই এ তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করেন—ততই যেন বিশ্বেশ্বরের আকুলতা বৃদ্ধি পায়। শ্রীমদ্ভাগবত তিনি পাঠ করেছেন—কিন্তু পুরীজীর নব আলোকপাতে, দৃষ্টির স্বচ্ছতায় তার সত্য পূর্ণতর জ্যোতিতে প্রতিভাত হয়।

প্রত্যুত সকল শাস্ত্রেই—বিশ্বেশ্বরের শাস্ত্রজ্ঞানের যেটুকু অহঙ্কার ছিল তা চূর্ণ করে দিয়ে—(যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও হয়ত কিছু অহঙ্কার থেকেই যায় বৈরাগ্যপথ-যাত্রীরও) সে শাস্ত্রজ্ঞানে যেন নবীন আলোকপাত করলেন। গতানুগতিক ব্যাখ্যার পথে না গিয়ে নিজের সহজ বোধশক্তি ও নির্মল বিচার বুদ্ধি দিয়ে গ্রন্থের প্রকৃত মর্মোদ্ধারের পথ দেখালেন।

কিন্তু, বিশ্বেশ্বরের যা আসল উদ্দেশ্য—দীক্ষাগ্রহণ—সে প্রসঙ্গ যেন এইসব মধু অপেক্ষা মধুরতর আলোচনায় গৌণ হয়ে পড়েছিল।

সহসা—একটি সাধারণ, অতি সামান্য ঘটনার অসামান্য আঘাতে তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন।

সাধারণ, তবে বড় বিচিত্রও।

সাধুজীকে, স্বীয় মনোনীত মনোমত গুরুকে নব নব সুখাদ্যে ভিক্ষা দেবেন—এই ইচ্ছাতে তিনি ইদানীং প্রত্যহই রন্ধনকার্যে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন।

কোন্ বস্তুর সঙ্গে কোন্ বস্তুর বা মশলার সংমিশ্রণে ব্যঞ্জন অধিক স্বাদু হয়—প্রচলিত পদ্ধতি ছাড়াও অন্য কি ভাবে পাক করলে সেই স্বাদে উপনীত হওয়া যায়—তারই নব নব, নানাবিধ পরীক্ষা।

যে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান, সে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই তার প্রতিভার চিহ্ন

রাখবে—এ স্বাভাবিক, বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্রেই বা তা হবে না কেন ?

একদিন তিনি নিজ বাসাবাড়ির গৃহসংলগ্ন পাকশালায় এমনি নানাবিধ আয়োজনে ও পরীক্ষায় ব্যস্ত—একটি স্থানীয় অধিবাসী বালক এসে প্রাঙ্গণে, তাঁর অনতিপ্রশস্ত রন্ধনস্থানের সামনে এসে দাঁড়াল।

অল্পবয়সী, শ্যামবর্ণ, কৌপীনের মতো একখণ্ড বস্ত্রমাত্র পরনে, সর্বাঙ্গে ধূলা—যেমন এদেশীয় দরিদ্র চাষীঘরের গ্রাম্যবালক হয়—তেমনিই। হাতে একটি গোচালনার পাচনবাড়ি।

ছেলেটি একদৃষ্টে ওঁর দিকে চেয়ে আছে দেখে উনি সস্নেহে প্রশ্ন করলেন, 'কী দেখছ ? খাবে কিছু, ক্ষিদে পেয়েছে ?···একটু অপেক্ষা করো তো রন্ধন শেষ ক'রে সাধুজীর জন্যে অগ্রভাগ সরিয়ে রেখে তোমাকে বসিয়ে খাইয়ে দিই।'

ছেলেটা পিচ ক'রে খানিকটা থুথু ফেলে বললে, 'না, আমার দরকার নেই। আমি তোমার খাবারে নজর দিচ্ছি না, শুধু তোমার কাণ্ডটা দেখছি।'

'কাণ্ড ? কাণ্ড আবার কি দেখলে এর মধ্যে ?' বিশ্বেশ্বর প্রশ্ন করেন।

'দেখছি জিভের একটু তোয়াজের জন্যে কী ভূতের মতোই না খাটছ ! একমুঠো ভাত, তাই বা কেন—একমুঠো চাল খেলেই তো দিন চলে যায়—তার জন্যে এত মেহনতের দরকারটা কি ?'

'না না, একা আমার জন্যে করছি নাকি !' ঈষৎ কি অপ্রতিভ বোধ করেন বিশ্বেশ্বর ? বলেন, 'এক খুব ভাল বড় সাধুকে ভিক্ষা দেবো বলেই—'

ছেলেটা এবার বেশ শব্দ করেই হাসে। বলে, 'মুখে বলছ ভিক্ষা—চোখে দেখছি রাজারাজড়ার মতো খাওয়া। আর সেই বা কি রকম সাধু যার এত জিভের তার, এত লালসা ভাল ভাল খাওয়ার ? সাধুরা তো শুনেছি প্রাণ ধারণের জন্যেই কিছু খান !'

'না না, তাঁর আহারের লোভ নয়, আমারই সাধুসেবা করার লোভ !'

'মানে সাধুটাকে বিপথে নিয়ে যেতে চাও, এই তো !' যেন তিরস্কারের সুর বাজে ছেলেটির কণ্ঠে, 'তা বেশ তো, ওখানে তো দেখছি ক্ষীর তৈরী ক'রে রেখেছ বেশ খানিকটা, ওই তো যথেষ্ট। ওর চেয়ে ভাল খাবার আর কি আছে ? একাধারে জীবনধারণের ভাল জিনিস, অথচ খেতেও ভাল লাগে খুব।···অনেক রকম ভাল ভাল খাবার একসঙ্গে খেলে, কোনটারই তো স্বাদ পাওয়া যায় না ঠিক মতো—পেটে গিয়েও গোল বাধায়। যা সবচেয়ে ভাল

তাই একটু সাধুকে দিলেই তো হয়! তা নয়, তোমারও ভাল খাবার লোভ আছে—প্রসাদ তো পাবেই জানো—বাহাদুরী নেবার লোভও কম নয়।'

এই বলে—যেন একটু চরম অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে ছেলেটা আবারও খানিকটা থুতু ফেলে চলে যায়।

ছেলেটা চলে গেলে অনেকক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে বসে রইলেন বিশ্বেশ্বর। রন্ধনে যেন আর রুচি বা আগ্রহ রইল না। ছেলেটির কথাই ভাবতে লাগলেন। সে যখন কথা কইছিল তখন তাকে উত্তর দেবার দিকেই মন ছিল তাঁর, উত্তর দিয়ে তার অভিযোগ খণ্ডন করায়—এইবার ভাল ক'রে ভাবতে গিয়ে অপরিমাণ্ এক বিস্ময় বোধ হ'ল।

কে এ ছেলেটি? বয়সে তো বালক মাত্র—অথচ এমন প্রবীণ ব্যক্তির মতো কথা বলে গেল!

এ দেশে এই শ্রেণীর ছেলেরা—কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহে হয়ত বিদ্যাচর্চা করে—কিন্তু গ্রাম্য রাখালবালক—এদের তো অক্ষর পরিচয় মাত্র নেই, কোন সৎপ্রসঙ্গ শোনারও বোধ করি সুযোগ পায় না, এমন প্রাজ্ঞর মতো কথা কোথা থেকে শিখল!

তবে কি, তবে কি—এও দৈব প্রেরিত! এ কি তাঁর বিধাতারই সতর্কীকরণ!

এ বিদ্রূপ তাঁর প্রাপ্যই ছিল বুঝি!

অমৃতের সমুদ্র সম্মুখে থাকতে তিনি সাধারণ এক দীর্ঘিকায় নিমজ্জিত আছেন, পথের ধারের আকর্ষণে পথের শেষ—পরম লক্ষ্য যা—ভুলে বসে আছেন!

সত্যই তো এ কী ছেলেখেলায় ডুবে আছেন তিনি।

একবার মনে হ'ল এ হয়ত গুরুরই পরীক্ষা। তিনি ইচ্ছা করে ভুলিয়ে দিচ্ছেন।

দীক্ষার কথা গুরু ত কদিনে ওঠেও নি একবার।

তত্ত্বরসেই আবিষ্ট নিমজ্জিত হয়ে আছেন।

বিশ্বেশ্বর রন্ধনের বিবিধ বিচিত্র উপকরণ সরিয়ে রাখলেন। সামান্য কী একটা প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যঞ্জন ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়েছিল আর কোন

ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করলেন না, শুধুই অন্ন পাক শেষ ক'রে পুরীজীর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

পুরীজী তাঁর ভাবান্তর দেখে বিস্মিত হলেও তা প্রকাশ করলেন না। বিশ্বেশ্বর তাঁর পাদপ্রক্ষালন ক'রে দিয়ে নিজের উত্তরীয়ে পা মুছিয়ে আসনে বসালেন। অতঃপর সেই অতি সাধারণ ভোজ্য অন্ন, একটা ব্যঞ্জন ও ক্ষীরের পাত্র সম্মুখে ধরে দিয়ে গাঢ় ও আবেগকম্পিত কণ্ঠে প্রভাতের অপরিচিত গ্রাম্য রাখাল বালকের আকস্মিক আগমন ও কথোপকথনের বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণনা ক'রে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, 'আর বিলম্ব করবেন না প্রভু, এবার দীক্ষা দিয়ে আমাকে সাধনার পথে কিছুটা অগ্রসর ক'রে দিন!'

সাধু হাসলেন। বললেন, 'তুমি দীক্ষার প্রসঙ্গ না তুললেও আমি কথাটা ভুলি নি। তোমাকে পরীক্ষাও করি নি, তার প্রয়োজন নেই। শুধু মাত্র প্রস্তুত করছিলাম। বীজবপনের পূর্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হয়—জানো তো—ভূমি কর্ষণ, তাতে সার প্রদান ইত্যাদির দ্বারা। সেই ভাবেই তোমার অন্তর-ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করছিলাম, ভূমির উর্বরাশক্তিরও পরিমাপ হচ্ছিল সেই সঙ্গে। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নেই। শুভদিন আমি স্থির ক'রেই রেখেছি। তুমিও প্রস্তুত হও মনে মনে।'

তারপর একটু নীরব থেকে বললেন, 'তবে এ বড় সাংঘাতিক পথ বিশ্বেশ্বর—এ পথে যেতে হ'লে সম্পূর্ণ নিঃস্ব নিঃসঙ্গ হয়ে চলতে হয়। নির্দয় নির্মম হয়ে। সংসার সম্বন্ধে এমন কি কর্তব্যবোধও বিসর্জন দিতে হয়। তিনি একাগ্রতাই চান। সর্ববন্ধন মুক্ত হয়ে—স্নেহ প্রেম দয়া সব ত্যাগ করে লঘু হয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। এও একরকম মৃত্যু, সাংসারিক জীবনের শেষ।...পারবে তো এতটা নিরাসক্ত হতে? গৃহে তোমার স্নেহময়ী মাতা আছেন, তরুণী সুন্দরী জায়া, তাদের কথা ভেবে দেখেছ?'

'ভাবা আমার পূর্বেই হয়ে গেছে। আপনি মৃত্যুর উপমা দিচ্ছিলেন না? আমার দৈহিক মৃত্যু ঘটলে যা হ'ত তাদের—এক্ষেত্রেও তাই হবে।' ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন বিশ্বেশ্বর, 'যাঁর পায়ে আমাকে সমর্পণ করব, করতে চলেছি, তাঁর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ, নিজস্ব যা কিছু আছে সবসুদ্ধ নিঃশেষে নিবেদন করব, এ-ই তো আমার সঙ্কল্প।' আত্মীয়তার বন্ধন তো তুচ্ছ, মানুষের যা সকলের চেয়ে বেশী প্রিয়—অহঙ্কার—জ্ঞানের, পাণ্ডিত্যের, প্রতিষ্ঠার—প্রেম প্রীতি

বাৎসল্য সব সুদ্ধই তাকে সঁপে দেব, দিতে চেষ্টা করব—তারপর আর কিছু ভাবব না, কোন দিকে চাইব না, যা ভাববার, যা করবার তিনিই করবেন—এই তো আমার সাধনা হবে, তাই না?'

বলতে বলতে তাঁর দুই চক্ষুর প্রান্ত প্লাবিত ক'রে দরবিগলিত ধারে অশ্রু নামল।

গুরুর চক্ষুও শুষ্ক রইল না, বলাবাহুল্য।

তিনি নীরবে দুই হাত তুলে নমস্কার জানালেন—ইষ্টকে অথবা ভাবী শিষ্যকে, ঠিক বোঝা গেল না।

॥ ৯ ॥

মৃদু, খুব মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত—যেন বহু-দূরাগত কার মেঘমন্দ্র রবে—বীজমন্ত্রটিতে কী ছিল তা বিশ্বেশ্বর জানেন না, কিন্তু তাঁর মনে হ'ল মুহূর্তমধ্যে তাঁর সমস্ত কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেল।

চিন্তা ভাবনা কল্পনা ধারণা—এতদিনের আহরিত জ্ঞান, বিদ্যাচর্চা—বিচার-বিতর্ক জয়পরাজয় এক প্রবল আলোড়নে, এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় সব ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় চলে গেল, তলিয়ে গেল কোন্ অতলে।

মনে হ'ল তাঁর জীবনের মূল সুদ্ধ নাড়া দিল ঐ শব্দটি।

সত্যিই কি তাঁর জন্মান্তর ঘটল!

ইষ্টমন্ত্র প্রদানের সময়, বীজমন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে—পুরীজী সাধনার কিছু কিছু প্রক্রিয়া পদ্ধতির কথাও বলে দিয়েছিলেন। ধ্যান ও জপের বিভিন্ন সময়, কখন কিভাবে ধ্যানে বসলে মন অতি সহজে ও সত্বর ইষ্টসমাহিত হ'তে পারে, সে ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হ'তে পারে; সন্ধ্যা ও প্রভাতের কিছু সময় জপের জন্য নির্দিষ্ট রাখলেও, সম্ভব মতো অবসরে বা কর্মে অবিরাম জপ করাই সঙ্গত; শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বরসআস্বাদনে ধ্যানপূজা অপেক্ষা নিরন্তর জপের চেষ্টা, তাঁর নামকীর্তনই শ্রেয়—এসব তাঁকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

অবশ্য সেই সঙ্গে আরও বলেছিলেন, 'তবে তোমার প্রতি এ আমার উপদেশও নয়, নির্দেশও নয়, গুরু হিসাবে একটা কর্তব্য পালন মাত্র। তোমার এসবের কোন প্রয়োজন হবে না, তুমি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অগ্রসর, তোমাকে আমি কোন

নিয়মের নিগড়ে বাঁধতে চাই না। আমি জানি তুমিই নিয়ম সৃষ্টি করবে, তুমি যে আচরণ করবে, যে উপদেশ দেবে, যে পথ নির্ধারণ করবে—তাই শ্রেয়, তা-ই সত্য। তৎসত্ত্বেও লৌকিক কিছু আচার-আচরণ পালনের চেষ্টা করা ভাল, নইলে অন্য অনেক অক্ষম ব্যক্তি, অনুপযুক্ত—তোমাকে অনুকরণ করার চেষ্টা ক'রে সাধারণের সম্মুখে অসত্যাদর্শ স্থাপন করতে পারে। আমাদের রসের সাধনা, শ্রীকৃষ্ণের সেবারসে নিমজ্জিত থাকার—তবে এর মধ্যেও কিছু কঠোরতার প্রয়োজন আছে।'…

দীক্ষাগ্রহণের পরও কিছুদিন গয়াধামে ছিলেন বিশ্বেশ্বর, সে কেবল অধিক-সংখ্যক সঙ্গীদের গয়াত্যাগের অপেক্ষায়। এখানে আসার সময়ও তিনি কিছুটা স্বতন্ত্র ছিলেন, অনাবশ্যক কথাবার্তার মধ্যে যোগ দিতেন না, নিতান্ত প্রাকৃত-প্রসঙ্গ আলোচিত হ'তে দেখলে ত্বরিতগতিতে অগ্রবর্তী হতেন অথবা ক্লান্তির অকথিত অজুহাতে পিছিয়ে থাকতেন—ঐ দলের সঙ্গে ব্যবধান রচনা ক'রে।

কিন্তু এখন যেন অধিকলোকের সংসর্গই অসহ মনে হচ্ছে। ওঁর বিলম্ব দেখে—সংসারী যারা, একান্ত ভাবে ইহজীবনাশ্রয়ী, তারা গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যস্ত হবে তা তিনি জানতেন। হ'লও তাই। কিছু লোক পূর্বেই ফিরেছে, পরমেশ্বর পুরীর সঙ্গে নিত্য এত কি কথা বুঝতে না পেরে—যে কয়েকজন ওঁর সঙ্গাভিলাষী ছিল তারাও অনেকে আরও প্রায় পক্ষকাল অপেক্ষা করে চলে গেল। দুই চারিজন দরিদ্র সেবক, কৃষক শ্রেণীর লোক, তারা শাস্ত্র জানে না, তত্ত্বে তারা আগ্রহী নয়—তারা ওঁকেই জানে, ওঁর সাহচর্য লাভে, ওঁর সেবা করেই মুগ্ধ; উনি এই দীর্ঘপথ একা যাবেন তা তারা ভাবতেও পারে না। ঘরসংসার, সেখানকার নিত্য অভাব অভিযোগ—এসবের চিন্তা পরিহার ক'রে ওখানেই স্থানীয় গৃহস্থবাড়ি ভিক্ষা ক'রে দিন কাটাতে লাগল, ওঁর প্রত্যাবর্তনেচ্ছার প্রতীক্ষায়।

এই সঙ্গীগুলিকে ত্যাগ করার ইচ্ছাও ছিল না বিশ্বেশ্বরের। এরা সরল, ওঁকে দেখে এদের ভক্তি হয়েছে—তিনি হরিনাম তথা কৃষ্ণনাম করতে বলেছেন তাই করছে। এ জীবনের এত দুঃখ কষ্টের হেতু বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বৈষম্য এবং মানুষের অজ্ঞানতা—বৃহত্তর স্বার্থবুদ্ধির অভাব—এ উনি বলেছেন বলেই বুঝেছে। কিছু মূর্খ বা পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ পরস্পর-বিরোধী মতের দ্বারা তাদের চিন্তায় ধারণায় বিহ্বলতা আনছে, এক প্রকার কুয়াশার সৃষ্টি করছে—

সেসব তথ্য যে এরা ঠিক বুঝতে পারে তা নয়, উনি বলছেন বলেই বিশ্বাস করে।

তবু তারাও নবদ্বীপ প্রত্যাবর্তনের পথে কিছু হতাশ হ'ল।

এ যাত্রায় উনি কোন উপদেশও দেন না, যুক্তির দ্বারা ধর্মের মূল সত্যও বোঝানোর চেষ্টা করেন না। যেন কী এক আচ্ছন্নতার মধ্যে ওঁর দিনরাত কাটে। কী ভাবেন, কী জপ করেন—কখনও কাঁদেন, কখনও দূর দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে স্থির হয়ে বসে থাকেন; পাক-শাকেও কোন আগ্রহ নেই। সঙ্গীরা রন্ধনের উত্তম স্থান নির্বাচন ক'রে, নদীজল দ্বারা সে স্থান ধৌত ক'রে, রন্ধনের সমস্ত আয়োজন ক'রে ওঁকে আহ্বান করলে কোন দিন উঠে যন্ত্রচালিতের মতো রন্ধন করেন—তাও নিজের আহার তনুরক্ষার মতো এক মুষ্টি অন্ন—কোন দিন স্থির হয়ে বসেই থাকেন। সেবকরা কেউ ব্রাহ্মণ নয়, ওঁকে নিজেদের রন্ধন করা কোন দ্রব্য দিতে সাহস হয় না, দুধ ভিক্ষা পেলে তাই একটু এনে দেয়—তাও জোর ক'রে খাওয়াতে হয়—কোথাও বা কিছু ফলমূল। অভাবে শুধুই একটু গুড় আর জল হয়ত।

দীক্ষার পর যে কদিন গয়াধামে ছিলেন সে কদিনও এই ভাবই লক্ষ্য করেছে ওরা। এমন কি গুরুকে ভিক্ষা দেবারও কোন আগ্রহ নেই, গুরু নিজে না এলে উনি তাকে দর্শন করতেও যেতেন না। আহারে আগ্রহ নেই, রুচি তো নেইই।

দিনরাত কি ভাবেন, কি করেন—ওঁর সাধনা বা পূজাপাঠ কখন হয় কিছুই ওরা বোঝে না। ও কদিনও বুঝত না। এখনও বোঝে না। উনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন কিনা, এ মস্তিষ্কের কোন ব্যাধি কিনা—এ চিন্তাও দেখা দেয় তাদের মনে।

কেবল যখন তারা প্রত্যূষে বা সন্ধ্যায় হরিনাম করে, তখন যেন উনি কিছুটা উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন, ওদের সঙ্গে নিজের মধুর গম্ভীর কণ্ঠ যোগ করে উচ্চরবে নাম গান করেন, এমন কি এরা পরিশ্রান্ত হয়ে নিরস্ত হওয়ার পরও বহুক্ষণ পর্যন্ত একাই সে নামগান চালিয়ে যান।

স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পরও অবস্থার যে বিশেষ উন্নতি হ'ল তা নয়, এবং আকুলতা ও আবেগ এবং চিন্তা আরও বৃদ্ধি পেল।

ইন্দ্রাণী দেবী দীর্ঘকাল পরে তাঁর হারানিধি ফিরে পেলেন বটে—মাধবী দেবী তাঁর উপাস্য দেবতা—কিন্তু যে বিশ্বেশ্বর বিদেশে গিয়েছিলেন, তিনি যেন আর ফিরলেন না।

জননীকে প্রণাম করেন, পরিজন সেবকদের কুশল প্রশ্ন করতেও ভুল হয় না, স্মিত হাস্যে অন্তরালবর্তিনীর প্রণামও গ্রহণ করেন গৃহের মধ্যে গিয়ে—কিন্তু স্বাভাবিক কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা কিছুই আর পূর্বের মতো দেখা যায় না।

দুই-চারিদিন বিশ্রামের পর ইন্দ্রাণী সাংসারিক নানাবিধ সমস্যার কথা তুলতে যান, বিশ্বেশ্বর কিছুক্ষণ নির্বাক ও অন্যমনস্ক ভাবে শোনার পর বলেন, 'ও যা হয় তুমি করো মা, যা ভাল বোঝ—আমার আর এসব ভাল লাগছে না।'

ইন্দ্রাণী ক্ষুণ্ণ হন, চিন্তিত হন, অথচ এ ঔদাসীন্যর কারণও বুঝতে পারেন না। এটা শারীরিক না মানসিক ব্যাধি, গয়ায় পিতৃকার্য করতে গিয়ে কোন প্রেতের প্রভাবে পড়ল কিনা—এ চিন্তাও হয়।

তবে দীক্ষার সংবাদ তিনি পূর্বেই পেয়েছেন, অগ্রাগত যাত্রীদলের নিকট থেকে। অতবড় সাধু যাকে দীক্ষা দিয়েছেন—তার ওপর প্রেতের প্রভাব পড়বে কি ক'রে!

বধূ মাধবীর বিস্ময় দুশ্চিন্তার সঙ্গে বেদনাও যুক্ত হয়। ক'মাস পূর্বের কিশোরী এখন উদ্ভিন্ন-যৌবনা, মুকুলিকা এখন অর্ধপ্রস্ফুটিতা। তাঁর অন্তরের প্রেম ও শ্রদ্ধার ডালি নিয়ে অনন্যচিত্ত হয়ে এই প্রত্যাগমনটিরই প্রত্যাশায় ছিলেন দীর্ঘকাল।

কিন্তু এ কে ফিরে এল?

মনে হয় জীবন্ত কিন্তু প্রাণহীন কোন ব্যক্তি।

প্রণয় সম্ভাষণ না হোক, কিছু অন্তরঙ্গ স্নেহমধুর কথোপকথন আশা করেছিলেন বৈকি মাধবী।

কিছু শুনবেন ওঁর কথা, ওঁর বিরহ ব্যথা, আশা ও স্বপ্নের কথা…কিছু শোনাবেন নিজের এই দেশ ভ্রমণের বিবরণ, যাতায়াতের পথের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা; পথের প্রান্তবর্তী দেবতার কথা, গুরুদেবের কথা—এবং নিভৃতে এমন আশাও পোষণ করেছিলেন, অবচেতনে অন্তত যে, উনিও এই বালিকা

বধূটির কথা কখনও কখনও চিন্তা করেছিলেন—এই অত্যাশ্চর্য রোমাঞ্চকর বার্তা শোনাবেন।

এসব প্রত্যাশার, দুরাশার সুখস্বপ্ন রাত্রি প্রভাতের ন্যায় বাস্তবতার রূঢ় আঘাত লেগে মনের কোন্ দূর দিগন্তে বিলীন হ'ল।

এমন কি পূর্বে যেটুকু স্নেহের নিদর্শন পেতেন, তাও আর পেলেন না। শয়ন করতে এসে পূর্বাভ্যাস মতো পদসেবা করতে বসলেন, তখনও স্বামী কোন সম্ভাষণ করলেন না; কিছু জানতেও চাইলেন না, কিছু জানালেনও না—নীরবে নির্জীব কোন পুত্তলিকার মতো পদসেবা নিয়েই যেতে লাগলেন, যা ওঁর একান্ত স্বভাব-বিরুদ্ধ। পূর্বে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সস্নেহে আকর্ষণ করে পাশে শুইয়ে দিতেন, আজ সেকথা মনে পড়ল না। বোধ করি তাঁর অস্তিত্বই অনুভব করলেন না উনি।

এক এক সময় সন্দেহ হয় সেই ব্যক্তিই ফিরেছেন তো?

আবার পরক্ষণেই নিজেকে তিরস্কার করেন।

সেই দিব্য কান্তি—বরং—দীর্ঘপথ অতিক্রান্ত করার কঠোর শ্রম ও অনিয়ম সত্ত্বেও—যেন শতগুণে বর্ধিত; সেই আয়ত চক্ষু, সেই সুমধুর হাসি। হাসি এবার ক্বচিৎ কখনও লক্ষিত হচ্ছে, তবু মাধবীর চোখে পড়েছে বৈকি। সে হাসির মাধুর্যে কৌতুক নেই, আছে মানবোত্তর কোন প্রসন্নতা।...

দুই একদিন এই ভাবে কাষ্ঠবৎ থাকার পর বোধ করি সহসাই বিশ্বেশ্বর সচেতন হলেন যে তাঁর পদতলে আরও একটি প্রাণী পড়ে থাকে, সে প্রায় সমস্ত রজনীই বিনিদ্র অতিবাহিত করে। তিনি এবার অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। শয়নের সময়টাই সংক্ষেপ ক'রে আনলেন।

মাধবীর যন্ত্রণার নিরসনে তাঁর অক্ষমতা বুঝেই - স্ত্রীর সঙ্গে অতি সাংসারিক বা লঘু বিশ্রম্ভালাপ আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—অন্তত এখন তো তিনি একান্ত অপারগ—এই ব্যবস্থা।

যথাসময়েই শয়নকক্ষে আসেন কিন্তু শয্যায় যান না। মাটির উপর একটি আসনে স্থির হয়ে উপবিষ্ট থাকেন। প্রথম প্রথম মাধবী ওঁর জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন কিন্তু বিশ্বেশ্বর তাঁকে অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণে নির্দেশ দিলেন, 'তুমি শয়ন করো, আমার বিলম্ব হবে।'

একেবারেই স্থির হয়ে বসে থাকেন, সম্মুখের প্রদীপটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ

ক'রে। প্রায় নিষ্পলক সে দৃষ্টি।

মাধবী বহু রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন, তারপর উনি কখন এসে সন্তর্পণে শয্যা গ্রহণ করেন তা তিনি জানতেও পারেন না। আবার এক এক দিন সম্ভবত সুগভীর ক্লান্তিতেই সেই মেঝের উপরেই শুয়ে পড়েন, উত্তরীয়টা খুলে বিছিয়ে নেবার কথাও মনে পড়ে না।

শুধু যে পূর্বজীবনের সঙ্গীদের পরিহার করেছেন বিশ্বেশ্বর তাই নয়—সে সব অভ্যাসও।

গঙ্গাতীরে বহু সময় অতিবাহিত করা আবাল্য অভ্যাস ; নিত্য কেশবের গৃহে যাওয়া ; অধ্যাপনা অধ্যয়ন—কিছুতেই আর রুচি নেই তাঁর।

আসলে পরিচিতদের কাউকেই ভাল লাগছে না। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার অর্থই বহু বৃথা বাক্যব্যয়, বহু অলস জল্পনা, নানা অবান্তর প্রসঙ্গ। মানুষের জীবনের যা চরম লক্ষ্য, অন্তত ওঁর নিজের বিশ্বাসমতো—তা তিনি জানতে পেরেছেন। সেখানে পৌঁছবার পথ দীর্ঘ, ভ্রম-আশঙ্কাসঙ্কুল, কষ্টকর, কণ্টকময়, বাধা-বিকীর্ণ। এখন একমনে সেই পথের কথাই চিন্তা করতে চান উনি, এ সময়ে অন্তঃসারশূন্য উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা, অথবা খ্যাতি যশ প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় আলোচনা, পরচর্চা—বড় বিরক্তিকর মনে হয়।

সেই কারণেই আজকাল তিনি গৃহদেবতার মন্দির কক্ষে অধিক সময় অতিবাহিত করেন। এ মন্দির যেন তাঁর আশ্রয়স্থল বহির্জগৎ থেকে আত্মগোপন করার। এখানে এসে সহজে কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে—পার্থিব জগতে, সংসারের অজস্র অপ্রীতির মধ্যে টেনে আনতে সাহস করবে না।

অবশ্য এক এক সময় মনে হয়—এ কি এক ধরনের প্রবঞ্চনা হচ্ছে না ?

এখানে বসে থাকেন ঠিকই, কিন্তু এ সময় কি জানকীনাথের পূজা বা ধ্যানে বা মননে নিমগ্ন থাকেন ?

না, বরং এক এক দিন সে কথা ভুলেই যান। শঙ্কিতা ইন্দ্রাণী লক্ষ্য করেন—দেবতার স্নান পূজা আরতি বাল্যভোগ নিবেদন কিছুই হয় না—চোখ বুজে বসেই থাকেন, শুধু দুই চক্ষু দিয়ে মধ্যে মধ্যে অবিরল ধারে জল ঝরে পড়তে থাকে—আকুলতায় !

এই সব সময়ে জননী ওঁর ধ্যানে চিন্তায় বাধা দিতে বাধ্য হন।

চমকিত বিশ্বেশ্বর চক্ষু উন্মীলিত করা মাত্র নিজের অপরাধ বা ত্রুটি বুঝতে পারেন, জননীর কাছে ও গৃহদেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে করণীয় কর্মে মনোনিবেশ করেন।

আবারও কখন হয়ত হাত থেমে যায়, মন্ত্রোচ্চারণ হয়ে ওঠে না। ভোগের স্থান মার্জনা করতে এসে মাধবী দেখেন তখনও পর্যন্ত বাল্যভোগই অনিবেদিত।

অথচ এ সবটাই ইষ্টের ধ্যান বা চিন্তা নয়। কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাও।

কিছুদিন ধরেই জানকীনাথ রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে একটা বিতর্ক চলছে মনে মনে।

মধ্যে মধ্যে ধ্যানে ইষ্টকে ঐ জানকীনাথের পটের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেন। রামচন্দ্র শ্যামল সুন্দর, শ্রীকৃষ্ণও তাই। তবে এক হ'তে বাধা কি? ত্রেতার রামচন্দ্র দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে জন্মেছেন—সেই রূপ সেই মূর্তি নিয়ে—এইটেই তো স্বাভাবিক। তবু ওঁর মন ভরে না কেন?

গুরুদেব বলেছেন অন্য অন্য অবতারে ঈশ্বরের অংশমাত্র প্রকাশ পেয়েছে—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর, মানবদেহ ধারণ ক'রে মানবলীলা আস্বাদনের ইচ্ছাতেই এই মূর্তি পরিগ্রহ তাঁর। কোন কোন গ্রন্থেও এই মত আছে। এই সব পঠনে ও শ্রবণেই কি এই দ্বিধার সৃষ্টি হয়? যখন মানবদেহই ধারণ করেছেন তখন অবতারের দেহকে কল্পনা করতে দোষ কি?

আবার একসময় ওঁর মন যেন বলে তিনি আরও সুন্দর।

সে রূপের বর্ণনা হয় না, মানুষের সীমিত জ্ঞানে বুদ্ধিতে তার ধারণা জন্মে না, তা কল্পনা করা যায় না।

তিনি এই মানসিক আলোড়ন ও সংশয়ের মধ্যেই এক এক সময় কখন যেন এক অনির্বচনীয় সেবারসে নিমগ্ন হয়ে যান। কল্পনা করেন তিনি দাসরূপে—কখনও বা নিজেকে দাসী বলেও কল্পনা করেন—সেই পরমপ্রিয়র সেবা করছেন, কখনও পদসেবা, কখনও অঙ্গমার্জনা; কখনও বা তাঁকে স্কন্ধে বহন করছেন; কখনও বা মনে হয় মাল্যচন্দন বস্ত্রে রাজবেশে সজ্জিত করছেন। আবার কখনও মনে হয় সেই পরমপুরুষ ওঁকে আলিঙ্গন করছেন, আর—আর ওঁকে চুম্বনও করছেন।

এমন উপলব্ধি হয় কদাচিৎ। এক আধ লহমার জন্য। কিন্তু যখন এ চিত্র মানস কল্পনায় চিত্রিত হয় তখন কী এক অনির্বচনীয় আনন্দরসে শরীর মন

আপ্লুত হয়ে যায়! তিনি যেন ইহজগতে নেই, ইহজীবনে নেই ; তিনি যেন বিগলিত হয়ে যাচ্ছেন, কোন্ এক পরম সত্তায় লীন হয়ে যাচ্ছেন—

তবু এই সমস্ত সময়গুলোতেও সে মূর্তি সম্যক ধ্যানে আসে না কেন? কেন মানসপটে স্পষ্ট পরিপূর্ণ রূপে দেখতে পান না?

তিনি যাকে দেখেন, মনে হয় যাকে দেখছেন, সে একটা আব্‌ছা অস্তিত্ব মাত্র। তার অবয়ব আছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গও আছে কিন্তু সে কেমন তা বলতে পারবেন না।

তাইতেই এত আকুলতা, এত অন্যমনস্কতা।

অবশেষে এক সময় নিজেই আত্মসচেতন হয়ে ওঠেন। নিজের স্পর্ধা তথা নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে লজ্জিত ও অপরাধী বোধ করেন।

এই যে দিবাস্বপ্ন, কল্পনাবিলাস—তাঁর সেবকরূপে নিজেকে চিত্রিত করার চেষ্টা—এ তো আত্মপ্রতারণাই।

অহমিকার তরুমূলে জলনিষেকের জন্য আত্মপ্রতারণা।

বহু একাগ্র সাধক বহু বর্ষের সাধনায়—কেউ বা জন্মজন্মান্তরেও—এই স্তরে উঠতে পারেন না, উনি দীক্ষাপ্রাপ্তি মাত্র সেই স্তরে পৌছনোর স্বপ্ন দেখছেন!

গুরুদেব বার বার ওঁকে যোগ্য আধার, অগ্রসর ইত্যাদি বলাতেই তাঁর এই অহমিকার সৃষ্টি হয়েছে। ধিক্।

'উদ্বাহুরিব বামনঃ' উনি এখনই হাত বাড়িয়ে সেই দেহধারী দেহাতীতর রূপকে ধ্যানে পেতে চাইছেন—যিনি সেই অদ্বিতীয় বিরাট সত্তা—অনাদি অনন্ত, কারণাতীত গুণাতীত প্রভৃতি কোন পরিচিত শব্দে যাঁকে বোঝানো যায় না, যাঁকে বর্ণনার ভাষা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নি।

না, এখনও বহু পরীক্ষা বাকী। যোগ্যতার বহু প্রমাণ উপস্থাপিত করার।

তিনি যে সঙ্কল্প নিয়েছেন—নানা ভাবে নিপীড়িত অধঃপতিত, বিপথগামী দেশবাসীকে ঈশ্বরাভিমুখী করতে ; তাদের সহজ অথচ সত্যসাধনার পথ প্রদর্শন করতে, পাণ্ডিত্যের অভিমান ও তর্কবিতর্ক থেকে, জ্ঞানের অজ্ঞানতা থেকে, অর্ধ-জ্ঞানের ধূম্রজাল থেকে তাদের রক্ষা ক'রে তাদের প্রত্যক্ষত ঈশ্বরকে অবলম্বন করার শিক্ষা দিতে—সে সঙ্কল্পই বা এত শীঘ্র ভুলে গেলেন কি ক'রে!

পূর্ণ অজ্ঞানতা অনেক শ্রেয়, তা সত্যের জ্ঞানের আলোকপাত মাত্রে বিদূরিত

হয়; জ্ঞান-বিহ্বলতা, সংশয়, তত্ত্ব, তর্ক প্রভৃতি কুহেলিকা—এরা সত্যের আলোক প্রবেশে বাধা দেয়। ঈশ্বর নিয়ে তর্কবিতর্ক, জ্ঞানের প্রতিযোগিতা মানুষের মন থেকে তাঁকে বহুদূরে ঠেলে দেয়।

উনি তো সেই কর্মেই আত্মনিয়োগ করতে মনে মনে প্রতিশ্রুত—একই পথে অজ্ঞানকে অর্দ্ধজ্ঞানকে দূর ক'রে মানুষকে সহজ সরল সাধনায় উত্তরিত করবেন, যাতে তারা লোভ লালসা দ্বন্দ্ব প্রভৃতি জাগতিক অশান্তি থেকে মুক্তি পায়। এমন আত্মিক শক্তি লাভ করে যাতে মানব-জীবনের অঙ্গীভূত ঐসব বিষ-জ্বালা অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে।...

ঈশ্বরে বিশ্বাস, সহজ সরল বিশ্বাসে আত্মীয় জ্ঞানে তাঁকে ভালবাসার চেষ্টা—তাঁর নাম গান করতে করতেই জন্মাবে।

সে বিশ্বাস, সে ভালবাসা সহস্র বক্তৃতা ও শাস্ত্রবাক্যের পরস্পরবিরোধী কচ-কচিতে আসবে না, অহরহ তাঁর নাম কীর্তনে, নাম জপেই আসবে। কারও সাহায্যে নয়—নিজেই একদিন তা লাভ করবে।

তবু একটা রূপ চাই, একটা আকার।

প্রতীক একটা কিছু, সম্মুখে একটা অবলম্বন।

শ্রীকৃষ্ণই সেই প্রতীক। তাঁরই নামগানের মধ্য দিয়ে মানুষ তাঁকে লাভ করতে পারবে।

এই নাম প্রচারই হোক ওঁর ব্রত, ওঁর সাধনা। হয়ত বা ওঁর সিদ্ধিও।

নিজে ব্রহ্মে বিলীন হওয়া, নির্বিকল্প সমাধি তো ওঁদের কাম্য নয়—নামরস প্রেমরস আস্বাদনই তো ওঁদের লক্ষ্য। সে কথা না ভুলে যান।

উনি যেমন অকস্মাৎ দুরবগাহতা ও মৌনতার ব্যবধান রচনা ক'রে সকলের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন, তেমনিই অকস্মাৎ আবার সকলের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

শুধু নিরাশ করলেন ছাত্রদেরই।

তারা এতদিনেও আশা ত্যাগ করে নি। এবার উনি করজোড়ে তাদের বললেন, 'অধ্যাপনা আর আমার দ্বারা হবে না, ওতে আর আমার রুচি নেই। তোমরা আমাকে মার্জনা করো। অন্য শিক্ষক বা গুরু তোমরা নির্বাচন ক'রে নাও। তোমাদের প্রতি আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা রইল।'

প্রবল ব্যক্তিত্বে অসম্ভবও সম্ভব হয়। বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্রে আর একবার সে সত্য প্রমাণিত হ'ল।

যেখানে এ-ভাবের নামকীর্তন একেবারেই প্রচলিত ছিল না, তান্ত্রিক সাধনার গোপন রহস্যাবৃত অনুষ্ঠানই যেখানের বৈশিষ্ট্য ; পাণ্ডিত্যের বা তদনুরূপ আড়ম্বরের দ্বারা সাধারণ মানুষকে ভীত অভিভূত-করার চেষ্টা—উচ্চবর্ণে ও নিম্ন-বর্ণে বিপুল ব্যবধান রক্ষা ক'রে অধিকসংখ্যক মানুষকে অবদমিত রেখে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার—সেখানে এরূপ সর্বালিঙ্গনকারী নামযজ্ঞের আয়োজন সফল হবে—কেউ ধারণাও করতে পারে নি।

প্রথম প্রথম ওঁর পরিচিত ব্যক্তি ও বন্ধুরাই অনেকে সন্দেহের চোখে দেখে-ছিলেন। দু'চারজন সামান্য লোককে নিয়েই শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্তন তথা হরিনাম গান আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু সেই সাধারণ সামান্য লোকের সংখ্যা শীঘ্রই অসামান্য হয়ে উঠল।

বিশ্বেশ্বরের দেবদুর্লভ কান্তি, তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, এবং—সর্বোপরি দৃপ্ত বলিষ্ঠতা লোককে আকৃষ্ট ও আবিষ্ট করার এমনই এক শক্তি তাঁকে দিয়েছিল যে—উপমাটা অবশ্য এক্ষেত্রে ঠিকমতো প্রযোজ্য নয়—আলোকাভিমুখী পতঙ্গের মতোই ধাবিত হ'তে লাগল সকলে।

বিশ্বেশ্বরের দীর্ঘ দেহ, সাধারণ যে কোন মানুষের মাথার উ র জেগে থাকে তাঁর মাথা। আর তেমনি মিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠস্বর। ভগবান যেন ওঁকে এই কার্যের জন্যই প্রস্তুত ক'রে পাঠিয়েছিলেন—এই সকল লোকোত্তর বৈশিষ্ট্য দিয়ে।

এর পর আসতে আরম্ভ করলেন তাঁর সহাধ্যায়ী ও বন্ধুরা। এতদিন এঁরা কিছু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, এবার এই জয়যাত্রার কলেবর দিন দিন বৃদ্ধি পেতে দেখেই হোক বা বিশাইয়ের হরিনামের প্রতি প্রীতির আন্তরিকতা দেখেই হোক —তাঁরা ওঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। সেও সংখ্যায় বড় কম নয়। বন্ধুত্বের মধ্যে কোন দিনই বাছবিচার ছিল না বিশাইয়ের। পথের ধারে বসে যে দরিদ্র সহপাঠী কলার খোলা, থোড়, মোচা ইত্যাদি বিক্রী করে তার সঙ্গেই যেন কৌতুকক্রীড়া ছিল আরও বেশী। শুধু বাল্যে নয়, প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরও যথেষ্ট। তার কাছ থেকে এটা ওটা কেড়ে নিয়ে আসতেন, সে অনুনয় বিনয় ক'রে নিবৃত্ত

করার চেষ্টা করত, আবার অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে সে বস্ত ফেলে চলে আসছেন দেখলে সে বন্ধুই আবার ছুটে গিয়ে গছিয়ে দিয়ে যেত।

সে সম্ভবত এই উপদ্রব উপভোগই করত। এ তো এক রকমের সামাজিক স্বীকৃতি।

এই সব বন্ধুরা এবার যোগ দিলেন ওঁর হরিনামের দলে। কেশব এলেন, রঘুনাথ এলেন, নৃসিংহ এলেন—আরও বহু সহাধ্যায়ী বা বন্ধু এসে যোগ দিলেন। নিজেদের তীব্র ঈশ্বর প্রেম থাকুক বা না থাকুক, শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বলে বুঝতে পারুন বা না পারুন—তাঁরা বিশ্বেশ্বরের আন্তরিকতায় মুগ্ধ।

'এত বড় পণ্ডিতের এই পরিবর্তন, এ তো সামান্য কথা নয়। ইনি যখন বলছেন, তখন এ সত্যই। আমাদের বিচারের আবশ্যক নেই।' এই তাঁদের মনোভাব।

তার চেয়েও যেটা উল্লেখ্য—বিশ্বেশ্বরের বিশেষ জয়লাভ বলতে হবে—প্রবীণ পণ্ডিত ব্রহ্মস্বরূপ ভট্টাচার্য, যিনি বেদান্তে সুপণ্ডিত এবং একান্ত ভাবে অদ্বৈতবাদী, সেজন্য লোকে তাঁকে বেদান্তাচার্য বলে উল্লেখ করত—বিশ্বেশ্বরের পিতৃবন্ধুও বটে—এই ধরনের ভাবে-ভেসে-যাওয়া সাধনা তাঁর কাছে এতকাল পরিহাসের বস্তু ছিল, জ্ঞানমার্গ ব্যতীত অন্য কোন পথে বিশ্বাস করতেন না—তিনিও সেই ভাবেই ভেসে এলেন, নিজে থেকে এসে এই নামকীর্তনেই যোগ দিলেন।

প্রথম তর্ক করতেই এসেছিলেন, এসেছিলেন নিরস্ত করতে—জ্ঞানী ব্যক্তিকে অজ্ঞানবৎ আচরণ থেকে নিবৃত্ত করতে, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের ক্ষুরধার যুক্তির সঙ্গে সনম্র মিনতিতে শুধু মুগ্ধ নয় যেন বিগলিত হয়ে গেলেন।

অবশ্য বয়সে প্রবীণ এবং সুপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি চিরদিনই বিশ্বেশ্বরকে স্নেহ করতেন। এত অল্পবয়সে সকল শাস্ত্রে পারঙ্গমতা লক্ষ্য করে গৃহিণীকে বলতেন, 'এ বালক সাধারণ নয়, অলৌকিক শক্তিধর এ।' আর সেই কারণেই, বালকের সঙ্গে হলেও, শাস্ত্রাদি নিয়ে সমানে সমানে আলোচনা করতেন।

ব্রহ্মস্বরূপ ভট্টাচার্য ছাড়া আর যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এলেন, বস্তুত শেষ পর্যন্ত সহায় হয়ে দাঁড়ালেন—তিনি হলেন শ্রীনিবাস আচার্য।

ইনি ব্রহ্মস্বরূপের মতো জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত না হ'লেও বিদ্বান এবং ধর্মপরায়ণ বলে এঁরও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ইনিও বিশ্বেশ্বর অপেক্ষা বেশ কিছুটা বয়সে বড়। ইনি এসে প্রায় বিশ্বেশ্বরকে গুরুত্বে বরণ করে নিলেন।

দল ক্রমেই বর্ধিত হচ্ছে। দিনেরাত্রে যখন তখন যেন এক বিপুল বাহিনী হরিনাম কীর্তন করতে করতে নবদ্বীপের পথ পরিক্রমা করে। সন্ধ্যার পরই বেশী, কারণ দিবাভাগে যে যার জীবিকার কার্যে ব্যস্ত থাকে, নইলে তাদের সংসার অচল হয়। এরা তো কেউ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী নয়।

এ ছাড়া বিশ্বেশ্বরের ও শ্রীনিবাসের প্রাঙ্গণেও এক একদিন বিরাট জমায়েৎ হচ্ছে। কোথা থেকে কি করে এত আয়োজন হচ্ছে, কে কি এনে দিচ্ছে—তা বোঝা যায় না। আয়োজন কিছু বিপুলই হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। হরিনাম তো শুধু হরিনামই নয়—তার সঙ্গে আহারাদি, প্রসাদ-বিতরণেরও ব্যবস্থা রাখতে হচ্ছে। এ আবশ্যিক নয়, এই লোভেই যে লোক আসছে তাও নয়—ভক্তরা, সাধারণ মানুষ আপনিই মিষ্টান্ন, রন্ধনের নানাবিধ আয়োজন মাথায় করে এনে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে।

ইন্দ্রাণী ও মাধবী এবার যেন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হন। তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে পরিশ্রম করতে লাগলেন। রন্ধনাদির ভার তো তাঁদেরই উপর। অন্য আরও বহু ব্যবস্থা তাঁদেরই করতে হ'ত। তাতেও তাঁরা সুখী। বিশাই যদি এই ভাবেও গৃহবাসী হয়ে থাকে তো সেও ভাল।

আর, হয়ত মনের গভীরে এ আশাও পোষণ করেন দুজনে, ঘরবাসী হয়ে থাকলে একদা সংসারীও হ'তে পারে। বিচিত্র কি!

ভক্ত বা বন্ধুই থাকবে, বিরূপ বা বিদ্বেষী কেউ থাকবে না—এ সংসারে তা সম্ভব নয়।

এসব ক্ষেত্রে, এই অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা দেখে অনেক বন্ধুও শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, সে-ই স্বাভাবিক।

নিমাইয়ের এই প্রতিপত্তি, সমাদর, বিপুলসংখ্যক অনুগামী—বিদ্বেষ ও অসূয়ার এই তো যথেষ্ট কারণ।

তবে, এ ছাড়াও কিছু ছিল।

নবদ্বীপে জ্ঞানী ও পণ্ডিত যাঁরা—অন্য স্থানের অপেক্ষা এখানে তাঁরা সংখ্যায় অনেক বেশী তা অনস্বীকার্য—তাঁরা অধিকাংশই তান্ত্রিক সাধনায় বিশ্বাসী। এঁদের সাধনা নিশীথরাত্রে, নিভৃতির মধ্যে। কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চ-মকার এঁদের করণীয় কিন্তু বেশীর ভাগ এই তথাকথিত সাধকরা এটাকেই

প্রধান, মুখ্য ক'রে নিয়েছেন। বিশেষ মদ্য ও মৈথুন বড় প্রিয়—ভ্রষ্টাচারী কপটদের কাছে তো বটেই—এক শ্রেণীর অর্ধসাধকদের কাছেও।

এই দল ক্রুদ্ধ হবে এ তো অবধারিত। যাঁরা শুধু কুকর্মের জন্যই এ সাধনাকে অবলম্বন করেন নি, এর অন্তর্নিগূঢ় সত্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী—তাঁরা বিরক্ত হলেন।

বিশ্বেশ্বরের এক শিক্ষক এসে একদিন তিরস্কার করে গেলেন। এলেন ওঁর এক সহাধ্যায়ী ব্রহ্মানন্দ—যিনি এই বয়সেই সাধনায় অনেক অগ্রসর হয়ে গেছেন।

পিতৃপিতামহের রীতিপদ্ধতি ত্যাগ ক'রে এ তোমার কি অনাচার? লেখাপড়া শিখেছ, অধ্যয়ন যেমন তেমনি অধ্যাপনাও তোমার অবশ্য কর্তব্য। গৃহে জননী, যুবতী স্ত্রী, সংসারধর্মও অবশ্য পালনীয়। তুমি এমন ভিখারীর মতো পথে পথে নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছ—তোমার কি মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটল? তাহলে চিকিৎসা করাও, কোন প্রবীণ বৈদ্য ডেকে।

তাঁদের এই বক্তব্য।

এর উত্তরে করজোড়ে বলেন বিশ্বেশ্বর, 'আমি জানি না এ কাজ কে করাচ্ছে। আমার বুদ্ধি চেতনা চিন্তা কিছুই আমার স্ববশে নেই। আমার অন্তরে বসে বৃহৎ কোন শক্তি, বোধ করি বিশ্বের সমস্ত কার্যের যিনি নিয়ন্তা, তিনিই এ কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। তিনিই চালক, আমি চালিত। সুতরাং আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন।'

এঁরা সকলেই বিশ্বেশ্বরকে উন্মাদদশাপ্রাপ্ত সাব্যস্ত করে জননী ইন্দ্রাণী দেবীকে উত্তম চিকিৎসা করানোর উপদেশ দিয়ে গেলেন। কেউ বললেন ব্রাহ্মী বা মধ্যমনারায়ণ তৈলের কথা, কেউবা সোজাসুজি চন্দ্রহংসিকার* ব্যবস্থা দিয়ে গেলেন।

এঁদের এতজনের কথা শুনে ইন্দ্রাণীও যে ভয় পান নি তা নয়—কেবল মাধবীর দৃঢ়তাতেই তিনি স্থির রইলেন। মাধবী বললেন, 'কেন মা আপনি বিচলিত হচ্ছেন। ওঁর আচরণে উন্মাদের কি লক্ষণ দেখলেন? উনি গৃহদেবতার পূজা-সেবায় কি অবহেলা করেছেন? আপনার সঙ্গে কথাবার্তা যা বলেন তা কি আপনার অস্বাভাবিক মনে হয়?...ওঁকে তো জানেন, বাধা দেবেন না, ব্যস্ত করে তুলবেন না, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে।'

---

* ছোট চাঁদর—এর পাতার রস ঘোরতর উন্মাদের মাথায় দেওয়া হয়।

ইন্দ্রাণী কথাটা বুঝলেন। তবে পূর্ণ আশ্বস্ত হলেন বেদান্তাচার্যর কথায়। তিনি বললেন, 'তোমার পুত্র এখনই সাধনার উচ্চমার্গে উন্নীত হয়েছে, ঈশ্বরের কৃপাপ্রাপ্ত সত্যকার অধিকারী ব্যতীত এত অল্পকালে এতদূর অগ্রগতি সম্ভবে না। এ উন্মাদ নয়, একে যারা উন্মাদ বলে তারা নির্বোধ এবং অন্ধ। সাধারণ মনুসন্তান থেকে এ ছেলে এতই উন্নত—যে এর আচরণের পরিমাপ করা, সম্যক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা তাদের সাধ্যাতীত। আপনার এই পুত্রই যথার্থ তার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে, আপনার গৌরবস্থল হবে। এর জননীরূপে আপনার নামও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। একে লালন করুন, সাহায্য করুন—ব্যস্ত হবেন না, ওকে উদ্‌ব্যস্ত করে তুলবেন না।'

স্ত্রী বা জননী শান্ত হলেন বটে—কিন্তু যাদের অন্তরে মাৎসর্য প্রবল – তারা শান্তি পাবে কিসে ?

বিশ্বেশ্বরের ভক্ত ও অনুগামীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে বিপুল আকার ধারণ করল। ওঁর গৃহে বা শ্রীনিবাসের গৃহে—যেদিন যেখানে ভগবৎপ্রসঙ্গ ও নাম-কীর্তনের ব্যবস্থা থাকে—যেন বিপুল মহোৎসবের আয়োজন হয়। ভক্তরা মাথায় ক'রে বয়ে আনেন তার উপকরণ—কোন বস্তুর অভাব ঘটে না। আর যখন পথ-পরিক্রমায় যাত্রা করেন তখন বোধহয় অর্ধক্রোশ দীর্ঘ এক বিপুল-দেহ অজগর চলেছে।

ঘৃতের মশাল, খোল করতাল প্রভৃতি নানা বাদ্যযন্ত্র, উদ্দাম নৃত্য, সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হরিনাম-ধ্বনি বিদ্বিষ্ট ঈর্ষীদের কর্ণে গলিত সীসকের মতো অনুভূত হয়, এ দৃশ্যে তাদের চক্ষু অন্ধ হবার উপক্রম হয়।

এরা—বিশেষ ক'রে কপটী তান্ত্রিকের দল, এবার ওঁকে দমন করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করল।

বহু লোক মিলে কাজীর কাছে গিয়ে নালিশ করল—এরা নাকি নাগরিকদের শান্তিভঙ্গ করছে, অন্য ধর্মাবলম্বী বা ভিন্ন সাধনমার্গীদের ঈশ্বরচিন্তায় ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে। কাজী এই নাম-মহোৎসব বন্ধ করতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের চরিত্র-মাধুর্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন, বরং একটা আত্মীয়বৎ সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

প্রহারাদির উদ্যোগও হ'ল কিছু কিছু। এরা হরিনামের অন্তরালে মদ্যমাংস

ব্যভিচার চালায় তাও প্রমাণ করার চেষ্টা হ'ল। এমন কি স্ত্রীলোকঘটিত দুর্নামেরও ব্যবস্থা বাদ গেল না।

কিন্তু পর্বতগাত্রে প্রত্যাহত সমুদ্র-তরঙ্গের মতোই এসব আঘাত ফিরে গেল —ব্যর্থ হয়ে, পাষাণ গলাতে বা টলাতে পারল না।

এর সঙ্গে নানাবিধ কুৎসা রটনাও চলছিল বৈকি!

কিন্তু সে চলছিল নেপথ্যে; তার বৃত্তান্ত একেবারে যে বিশ্বেশ্বরের কর্ণগোচর হয় নি তা নয়—তবে তিনি এমন এক নেশায় মত্ত ছিলেন যাতে কারও কোন অনভিপ্রেত প্রসঙ্গই—তাঁর কর্ণে প্রবেশ করলেও মর্মে পৌছত না। তিনি এত সব গ্রাহ্যও করতেন না।

তথাপি, একটা দিনের এক কদর্য ঘটনায় বিচলিত—এবং চিন্তিতও—না হয়ে পারলেন না।

কোন এক বিশেষ ক্ষণে এক একটি ঘটনা বা সংবাদ বা বাক্য—মানুষের মনে এমন আঘাত করে যে তার জীবনের গতিই পরিবর্তিত হয়ে যায়—বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায় তার জীবনযাত্রায়, তার ফল হয়ত সমস্ত পরিবারকেই অল্পবিস্তর ভোগ করতে হয়—কখনও বা সমগ্র বংশের ইতিহাস বহুদিন পর্যন্ত সে ক্ষণের চিহ্ন বা ফলাফল বহন করে।

সেদিনের সে তুচ্ছ ঘৃণার্হ এই ঘটনাও, শুধু বিশ্বেশ্বর ইন্দ্রাণী বা মাধবী নয়—কেবলমাত্র সেই কাল নয়, কিছু সংখ্যক দেশবাসী নয়—বহু শতাব্দী ধরে কোটি কোটি লোকের জীবনে, বস্তুত জাতীয় ইতিহাসেই তার ছাপ রেখে গেছে। সম্ভবত অনাগত বহু শতাব্দী সে ঘটনার ফলাফল বা তার ইতিবৃত্ত বহন করবে।···

একদা প্রাতঃকালেই, সবেমাত্র গৃহদেবতার প্রাভাতিক পূজা ও বাল্যভোগ নিবেদন সমাপ্ত ক'রে পূজাগৃহের বাহিরে এসেছেন বিশ্বেশ্বর; জননী নিজের সন্তানের বাল্যভোগের আয়োজনে ব্যস্ত, অকস্মাৎ অনাহূত ভাবে এক মধ্যবয়সী অধ্যাপক বিনা আমন্ত্রণেই ওঁদের অঙ্গনে প্রবেশ করলেন।

অধ্যাপক বটে, নিজেকে বিশিষ্ট সাধক বলেও প্রচার করেন, কিন্তু অধ্যাপনা বিষয়ে তাঁর যে খুব সুনাম আছে তা নয়। তবে বিখ্যাত নৈয়ায়িক বংশের সন্তান ব'লে তাঁকে কেউ একেবারে উপেক্ষা করতেও সাহস করেন না।

বিচারসভায় কিম্বা অধ্যাপক বিদায়ে আমন্ত্রণ জানাতেই হয়।

তিনি ভিতরে এসে - তখনও - পট্টবস্ত্র-পরিহিত বিশ্বেশ্বরকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন, তার পর দুই হাত কোমরে দিয়ে কিছুক্ষণ যেন সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে উঠলেন, 'বাঃ বাঃ, যেন বালার্ক দ্যুতিতে উদ্ভাসিত দেবমূর্তি দেখলাম ! নাঃ বাবাজী, সার্থক তোমার জন্ম, সার্থক বিশ্বেশ্বর নাম।'

তারপর, বিস্মিত শ্রোতা বা দ্রষ্টাদের আরও যেন কিছু বিহ্বল করতেই, কিছুক্ষণ নাটকীয় ভঙ্গীতে ওঁর দিকে চেয়ে সহসাই, অবগুণ্ঠিতা ইন্দ্রাণীর দিকে ফিরে বললেন, 'না বৌঠান, আপনি যে রত্নগর্ভা তা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের দাদা সজ্জন সাধু ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে যাকে প্রতিষ্ঠা বলা হয় তা লাভ করতে পারেন নি—অবশ্য তেমন কোন চেষ্টাও করেন নি বোধহয় সে যোগ্যতা অর্জনের জন্য। সে ত্রুটি আপনার সন্তান বহুগুণ শক্তি ও যোগ্যতার দ্বারা সংশোধন ক'রে নিয়েছেন !

'দেখুন, বিদ্বান অনেকেই আছেন, আমাকেও—হেঁ হেঁ—আত্মঅহমিকা প্রকাশ করছি না, অনেকেই বিশিষ্ট পণ্ডিত বলে মান্য করেন—কিন্তু বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধির এমন দুর্লভ যোগাযোগ তো আর কারও দেখলাম না এতটা বয়সে। এ যোগাযোগ ঘটে কদাচ, দৈবাৎ। আপনার পুত্র, সেই অনন্যসাধারণ সৌভাগ্যের অধিকারী।'

বলে একটু থামলেন অধ্যাপক মহাশয়। বোধ করি অধিকতর প্রস্তুতির জন্য। অথবা বিশ্বেশ্বরের সংশয়চকিত, বিস্মিত ও ঈষৎ বিহ্বল অবস্থাটা উপভোগ করার জন্যই।

বিশ্বেশ্বর এ অধ্যাপকটিকে বিলক্ষণ চেনেন। তিনি যে কেবলই এ প্রভাত-কালে তাঁর প্রশংসা করতে আসেন নি—সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র ছিল না। এ আগমন কোন আক্রমণেরই ভূমিকা। শুধু সেই আক্রমণটা কোন্ দিক থেকে কেমন করে আসছে—সেইটে ঠিক অনুমান করতে না পেরেই কতকটা তাঁর এই বিহ্বল ভাব !

অবশ্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতেও হ'ল না। তিনি চোখের একটা বিশেষ ভঙ্গী ক'রে বললেন, 'পাড়ার সব ইতরবুদ্ধির লোকেরা বলে—ছোকরা আচ্ছা জাহাবাজ বটে। পরের অর্থে উত্তম আহার, মূল্যবান বস্ত্রাদি আহৃত হচ্ছে, সংসারে কোন অভাব নেই, বরং সম্পদ উথলে পড়ছে ; গৃহে সুন্দরী যুবতী

ভার্যা, কোন প্রকার সম্ভোগেই তো বাধা নেই। এই হরিনামই দেখছি এ যুগের উত্তম ব্যবসায় !'

'আমি তাদের বলি', কণ্ঠস্বর ঈষৎ অন্তরঙ্গ করার চেষ্টা ক'রে বলতে থাকেন, 'তোরা সূক্ষ্মমাত্র মূর্খই নোস, তোরা নির্বোধ, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন। বাবাজী জাহাঁবাজ নন—সে আমরা কাদের বলি, যারা মিথ্যাচরণ জুয়াচুরি প্রভৃতির দ্বারা অপরের বিষয়সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠা কি প্রাপ্য যশ প্রভৃতি আত্মসাৎ করে—ছলেবলে কৌশলে। বাবাজী কোন উদ্যম করছেন না, কোন প্রকার তঞ্চকতা করছেন না, মিথ্যা কথার প্রয়োজন হচ্ছে না লোকে স্বেচ্ছায় ভোগ্যবস্তু পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে, দিয়ে—দিতে পেরে—যেন কৃতার্থ হচ্ছে। তবু তো আমি বাবাজীকে সাধুবাদ দিই তাঁর সংযমের জন্য। তিনি ইচ্ছা করলে এই সুযোগে একাধিক নারীও সম্ভোগ করতে পারতেন—সে বিষয়ে তিনি নির্বিকার, অতি বড় নিন্দুকও সে অপবাদ দিতে পারবে না।'

এই পর্যন্ত দীর্ঘ বক্তৃতা সেরে, যেন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'না বাবাজী, তুমি কারও কোন কুৎসা রটনায় কর্ণপাত ক'রো না। এ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু—ভূমি স্ত্রী স্বর্ণ গোধন ইত্যাদি—সর্বথা বীর্যভোগ্যা নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধিভোগ্যা। মহাবীরও যদি বুদ্ধিমান না হয়, সে কিছুই পায় না। তুমি তো কোন অন্যায় করছ না—তুমি তোমার পথে অবিচল থেকো।...

'যাই। প্রথম প্রহর শেষ হ'তে আর বড় বিলম্ব নেই, স্নান পূজা সারতে হবে। বৌঠান, প্রণাম জানালাম এখান থেকেই। তারা, তারা। ব্রহ্মময়ী মা !'

বেশ ধীরেসুস্থে—আঘাতটা যে যথাস্থানে পৌঁচেছে তা বিশ্বেশ্বরের রক্তহীন বিবর্ণ মুখ এবং ললাটের ঘর্মবিন্দু দেখেই বুঝেছেন—ঈষৎ কৌতুক তথা তৃপ্তির হাসিতে আনন রঞ্জিত ক'রে—এঁদের গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন অধ্যাপক।

॥ ১১ ॥

বাক্য-বাণ শব্দটির সঙ্গে অবশ্যই পরিচয় ছিল বিশ্বেশ্বরের কিন্তু তার সম্যক অর্থ এতকাল বোঝেন নি, এই প্রথম বুঝলেন।

অর্জুননিক্ষিপ্ত শরের মতোই তার বর্ম ভেদ ক'রে মর্মে প্রোথিত হওয়ার শক্তি যে এত প্রচণ্ড, এ শর যে এত বিষাক্ত—যে বিষের কাছে আশীবিষের

বিষজ্বালাও তুচ্ছ—আজ প্রথম উপলব্ধি ঘটল তাঁর।

তাঁর গত কয়েক মাসের চিত্তপ্রশান্তি, অহরহ নামজপ নামগানের আনন্দ—নষ্ট হয়ে গেল এই কটা কটু বিষাক্ত বাক্যের আঘাতে।

এতক্ষণের পূজাধ্যানের তৃপ্তি, প্রভাতের এই নির্মলতা, চারিদিকের বৃক্ষলতা থেকে ভেসে আসা কত কি পুষ্পসুবাস, পক্ষীকূজনের সুমধুর সঙ্গীত, শিশিরসিক্ত বৃক্ষপল্লবে প্রতিফলিত নবীন সূর্যের আলো—সমস্ত কে যেন একটা কৃষ্ণ যবনিকা দিয়ে আবরিত ক'রে দিল। মানুষের নীচতায় কিছুক্ষণের জন্য নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে গেল ওঁর।

মানুষের অনুমান বা কল্পনা যে এত কদর্য হতে পারে, অপরের আচরণের যে এমন কলুষিত কদর্থ করা যায়—সেটাই তো বিশ্বেশ্বরের কাছে অবিশ্বাস্য রকমের বিস্ময়ের কারণ! উনি যে জগতে এতকাল এই বাইশ তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত কাটিয়ে এসেছেন সেখানে যে ষষ্ঠরিপুর বা মাৎসর্যের সঙ্গে পরিচয় একেবারে ঘটে নি তা নয়—গ্রন্থাদিতেও তার একটা পরিচয় অবশ্যই ঘটেছে—তবে সে ঈর্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যশ প্রতিষ্ঠা প্রাধান্য নিয়ে—তার মধ্যে এই ধরনের ঘৃণ্য মনোভাব কখনও প্রকাশ পেতে দেখেন নি উনি; বা সে মনোভাব প্রকাশের এই ঘৃণ্যতর প্রচেষ্টাও।

বিশ্বেশ্বর যেন ক্লান্ত হয়ে অবসন্ন ভাবে সম্মুখের একটা সিঁড়িতে বসে পড়লেন।...

মাধবীও ওঁর মানসিক অবস্থা—দৈহিকটা তো দেখতেই পাচ্ছেন· বুঝেছেন ও ব্যাকুলও হয়েছেন কিন্তু শ্বশ্রূমাতা সম্মুখে থাকতে তাঁর কিছু করার উপায় নেই। মাধবী বিপন্ন ও কাতর মুখে তাঁর দিকেই চাইলেন।

অবশ্য তার প্রয়োজন ছিল না।

ইন্দ্রাণী প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ব্যস্ত হয়ে এসে বিশ্বেশ্বরের উত্তরীয় খুলে নিয়ে তাই দিয়েই বাতাস করতে করতে বললেন, 'যে যেমন মানুষ সে তেমনি কথাই বলবে। সাপ বিষ ছাড়া আর কি ওগরাতে পারে বল। এ নিয়ে তুই ব্যস্ত হোস নি, কি দুঃখ বোধ করিস নি। নীচ ব্যক্তির ইতর আক্রমণে ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিচলিত হন না, উপেক্ষা করেন। নিশীথ অন্ধকারে নিশাচর মানুষ বা প্রাণী সূর্যকে যথেষ্ট গালাগালি দেয়—কিন্তু সূর্যের উদয় ঘটলে তারাই গুহা কি কোটর খুঁজতে পথ পায় না। নীচ যদি উচ্চভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।

আমার বাবা-মা বা ওঁর কাছে চিরদিন এই শিক্ষাই পেয়েছি। পথের কুকুর কামড়ালে মানুষ তাকে কামড়াতে চেষ্টা করে না। আর, তাছাড়া, যে কোন বড় কাজ করতে গেলেই এই ধরনের নিন্দা সহ্য করতে হয়। এতেই নিজের কর্মপ্রচেষ্টা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সংঘর্ষে ধাতু অধিকতর শাণিত হয়—প্রকৃতির এইই তো নিয়ম। তুমি ওঠো. মুখে জল দাও। মনে মনে তাঁকেই ডাকো—তোমার ইষ্টকে—তিনিই এই সব কণ্টক-জ্বালা তুচ্ছজ্ঞান করার শক্তি যোগাবেন।'

মায়ের কথায় তখনকার মতো ঈষৎ সান্ত্বনা লাভ করলেন বিশ্বেশ্বর, তবে তখনই কিছু আহারে প্রবৃত্তি হ'ল না। নিজেকে যেন অত্যন্ত অশুচি বোধ করছেন। তিনি সেই অবস্থাতেই উত্তরীয় পট্টবস্ত্র সুদ্ধ গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন।

তারপর অবশ্য জলযোগাদি, দ্বিপ্রহরে গৃহদেবতার ভোগনিবেদন, সর্ব কার্যই যথানিয়মে চলল। ভক্ত বা বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথনেও কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করল না কেউ—কেবল যারা অন্তরঙ্গতম,—জননী ও জায়া বুঝলেন প্রভাতের আঘাত কী গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তাঁর মনে।

কে জানে এর পরিণাম কি দাঁড়াবে—এই অজ্ঞাত আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে রইলেন দুজনেই।

পরিণামের একটা লক্ষণ সন্ধ্যার পূর্বেই দেখা গেল। নিত্য কীর্তনে ছেদ পড়ল আজ। বিশাই বন্ধু ও ভক্তদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ জানালেন, তাঁরা ওঁকে বাদ দিয়েই আজ পথপরিক্রমা করুন—অথবা শ্রীনিবাস অঙ্গনে গিয়েই কীর্তনের কাজ সম্পন্ন করুন। উনি আজ বড় ক্লান্ত, কিছুকাল একা থাকতে চান।

এবং পাছে এ নিয়ে পীড়াপীড়ি অনুরোধ-উপরোধের চাপে আধিক্য ঘটে—এই আশঙ্কায় সকলের অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ ক'রে বহুদিন পরে গঙ্গাতীরের এক নির্জন বৃক্ষতলে গিয়ে বসলেন।

আজ তাঁর নিজের সঙ্গে বুঝি একটু বোঝাপড়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই যে এতদিন—যেন একটা নেশার ঘোরে—আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন, দিনরাত্রির স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলেন—অগ্র পশ্চাৎ, লক্ষ্য বা পথ সম্বন্ধে কোন বিশদ চিন্তা না ক'রেই—এবার তাতে কিছু বিরতি আবশ্যক। কোথাও একটু স্থির হয়ে

থেকে নিজের জীবনের এক প্রকার অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন এই অধ্যায়ের পর্যালোচনা না করতে পারলে স্বস্তি বা শান্তি পাচ্ছেন না।

অধ্যাপকটির কুৎসিত বিষাক্ত ইঙ্গিতে প্রথমে ঘৃণা পরে অপরিসীম ক্রোধ জন্মেছিল মনে। কিন্তু স্থিতধী বিশ্বেশ্বর সারাদিনের চেষ্টায় মনের এই বিরূপতা ও উষ্মাজনিত উত্তেজনা দমন করেছেন। এবার বিচার আরম্ভ হয়েছে মনে মনে। এখন এমনও বোধ হচ্ছে ইষ্ট বুঝি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েই এই নির্মম আঘাত করেছেন—ওঁকে নিজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিতে।

অবশ্য অধ্যাপকটি যা বলেছেন তা মিথ্যা, ঈর্ষা-নিঃসৃত। তিনি অপরের নাম করে যা বলেছেন তা হয়ত নিজেরই মনোভাব। কিন্তু কিছুটা কি সত্য নেই এর মধ্যে?

সে সত্য ঐ ঈর্ষা, অধ্যাপক কুলকলঙ্ক ব্যক্তিটির অজ্ঞাতসারেই উদ্ঘাটিত হয়েছে বিশ্বেশ্বরের মনে।

সত্যই তো, জগতের তাপিত লাঞ্ছিত পীড়িত মানুষকে পরিত্রাণ করার, সত্য পথ দেখাবার যে স্বেচ্ছাবৃত ব্রত তাঁর—সে কি তিনি বিস্মৃত হয়ে বসে নেই। হরিনাম করছেন সত্য কথা, শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করছেন, তাঁর নাম শোনাচ্ছেন, কিছু-সংখ্যক লোককে সে নাম উচ্চারণে উদ্বোধিত করছেন। কিন্তু সে ক'জন? এই জনপদের হয়ত বা দুই তিন কি পাঁচশত নাগরিক। যাদের কাছে কৃষ্ণপ্রেমের আলোক পৌঁছে দেবার ব্রত তাঁর—তাদের থেকে বরং আরও দূরেই চলে যাচ্ছেন না কি?

আর এখানকার লোকরাই বা কি দেখছে!

ঈশ্বরের নাম করার প্রত্যক্ষ ঐহিক পুরস্কার। সু-আহার্য, সূক্ষ্মবস্ত্র—সুখে ও আরামে জীবন অতিবাহিত করার নানা বস্তু ভারে ভারে আসছে, নিত্য দীয়তাং ভুজ্যতাং চলছে। তাঁর সঙ্গে যারা নামগান করছে তারাও সে সুফলে বঞ্চিত হচ্ছে না।

আর এগুলি যারা যোগান দিয়ে যাচ্ছে তারা অধিকাংশই সাধারণ গৃহস্থ বা দরিদ্র ব্যক্তি—তাঁরা কি এ নামগানের, এই নিয়ত হরিনামে গান কীর্তনের মর্ম ও প্রয়োজন বুঝছে? তারাও হয়ত ঐ প্রত্যক্ষ পুরস্কারেরই কথাই চিন্তা করছে।

না, কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের আশা রেখে ঈশ্বরকে ডাকা চলবে না। সর্ববিধ আশা-আকাঙ্ক্ষা, লোভ-লালসা ত্যাগ ক'রে, সর্বরিক্ত হয়ে, অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রে তাঁকে ভজনা করতে হবে—সেই কিম্বদন্তীর ব্রজবাসিনীদের মতো। স্ত্রীলোকের সর্বাপেক্ষা অত্যাজ্য যে বস্তু - লজ্জা, শেষ পর্যন্ত তাও বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ আচ্ছাদন বিবর্জিত অবস্থায় যারা তাঁর কাছে পৌছেছিল—তাদের দয়িত সেই পরমপুরুষের কাছে।

সে শিক্ষা কি এই এত স্বাচ্ছন্দ্য, এত সেবা, এত আরাম—জননীভার্যা পরিবৃত হয়ে গৃহসুখে কাল কাটাতে কাটাতে অপরকে দেওয়া সম্ভব?

ভিখারী হয়ে ঐসব মূঢ়, নিঃস্ব, মূক, চিরসহিষ্ণু লোকের দ্বারে গিয়ে ঈশ্বরের নাম-প্রেম ভিক্ষা না চাইলে কি সে শিক্ষা লোকের অন্তরে পৌছবে? লোকে দৈহিক সুখভোগের আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে শিখবে?

বিবস্বান সূর্য যদি দূর আকাশেই জ্যোতিঃ বিকীরণ করতেন তাহলে কি এই মাটিতে জীবলক্ষণ দেখা দিত। সে সূর্য মর্তের মৃত্তিকায় নেমে এসেছেন বলেই প্রাণীদের জন্ম হচ্ছে, ফল ফলছে ফুল ফুটছে—তাদের জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য-পানীয়ের সৃষ্টি হচ্ছে।

না, বুঝি নিজের সম্বন্ধে এ উপমাও অহমিকাপ্রসূত। দীনাদপি দীনরূপে, সর্বত্যাগী ভিক্ষুকরূপে মানুষের দ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এক প্রাণী হিসাবে। অকিঞ্চন ভিক্ষুক হয়ে প্রেমভিক্ষা চাইতে হবে।

অর্থাৎ সন্ন্যাসীরূপে।

সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন তিনি।

জননী ব্যথা পাবেন; প্রেমময়ী একান্ত-নির্ভরশীলা কিশোরী বধূর হয়ত জীবনই নাশ হবে।

সে দুঃখ কি ওঁর প্রাণেও বাজবে না?

কিন্তু উপায় কি!

সাংসারিক জীবনের সকল ভোগ সকল বন্ধন সকল বিবেচনা, স্নেহ দয়া মায়া—সর্বস্ব ত্যাগ ক'রেই তো সন্ন্যাস নিতে হয়।

এ দেহে থেকেও এ দেহকে ত্যাগ করতে হবে। সাংসারিক অর্থে মৃত্যু ঘটলে তবেই সন্ন্যাসী হওয়া যায়।

কোন কথা কারও কথা চিন্তা করার প্রশ্ন সেখানে নেই। প্রয়োজন নেই।

মৃত্যুই তো সকল প্রয়োজনের সমাপ্তি।

সন্ন্যাস নিতে গেলে মৃত্যুর সেই সীমানা পার হয়েই তো যেতে হয়। সে অবস্থায় মৃত্যুর অধিকার আর থাকে না—তাই কোন কিছুর, কোন সম্পর্কেরও অধিকার থাকে না।

॥ ১২ ॥

মন স্থির করলেও তখনই সে সঙ্কল্প কারও কাছে প্রকাশ করলেন না।

শুধু আত্মজনই নয় – বন্ধু, ভক্ত, অনুগামীরাও বাধা দেবার চেষ্টা করবে। এমন কি বোধহয়, যারা এখনও বিরূপ বা বিদ্বিষ্ট তারাও ব্যস্ত হবে। গালাগালি দেবার, বিদ্রূপ করবারও যোগ্য পাত্র চাই, যে দীন, নিত্যধিক্কৃত তাকে বিদ্রূপ ক'রে হাস্যাস্পদ করার চেষ্টা করলে মন ভরে না। তেমন যোগ্য পাত্র এ শহরে বিশ্বেশ্বরের মতো কে আছে!

আর মুখে যাই বলুন ভিন্নমতাবলম্বী পণ্ডিত বা সাধকরা—অন্তরে অন্তরে এই যুবকটিকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন, হয়ত ঈষৎ গর্বও বোধ করেন এ তাঁদের আত্মীয় বা আত্মীয়তুল্য বলে। স্নেহ তো করেনই। নতুবা তিনি ভ্রান্ত পথে যাচ্ছেন বলে তাঁদের এ ব্যাকুলতা কেন!

সঙ্কল্প কারও কাছে ব্যক্ত করলেন না তার আরও কারণ—কোন কার্যের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প যতই দৃঢ় হোক, তার অগ্রপশ্চাৎ সকল দিক বিবেচনা না ক'রে কোন কার্যে অগ্রসর হওয়া যে মূর্খতা—তা ভাবাবেগে যতই বিচলিত হোন—বিশ্বেশ্বর একবারও ভোলেন নি। জীবনের ধারায় একটা বিরাট পরিবর্তন আনার পূর্বে অন্তত কয়েকটা দিন স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করা কর্তব্য।

তেমন ভাবে চিন্তা করার জন্য নির্জনতা প্রয়োজন। বিশ্বেশ্বরও তাই যথাসাধ্য জনসমাগম পরিহার ক'রে জনহীন প্রান্তরে বা গঙ্গাতীরে চিন্তা-সমাহিত অবস্থায় কাল অতিবাহিত করতে লাগলেন।

বাধা অনেক। এ সংসারে বুঝি ইচ্ছামতো কিছুই করা যায় না, সংসার ত্যাগ করাও না।

কিছুদিন পূর্বে কাটোয়ার মধুসূদন ভারতী নবদ্বীপে এসেছিলেন। বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানী ও উচ্চমার্গের সাধক, তাঁর খ্যাতি পূর্বেই শোনা ছিল। তিনি

ভিক্ষাগ্রহণ করলে গৃহ পবিত্র ও সংসার সার্থক হবে—এই জ্ঞানে বিশ্বেশ্বর তাঁকে ভিক্ষাগ্রহণের বা আহারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আহারাদির পর বিবিধ সৎকথা প্রসঙ্গে গৃহীর কর্তব্য ও তার সাধনার অধিকার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ক'রে অবশেষে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চাই, আপনি দেবেন ?'

'না।'

'না কেন ?' বিশ্বেশ্বর নিরতিশয় বিস্মিত বোধ করেন, 'আমি তো বয়ঃপ্রাপ্ত।'

তর্কে প্রবৃত্ত শিশুর অজ্ঞানতা দর্শনে যেমন অভিভাবকরা প্রসন্ন কৌতুক হাস্য করেন—মধুসূদন তেমনই ঈষৎ হাস্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'এ সংসারে জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উপরে কতকগুলি দায়িত্ব বর্তায়। কুলপ্রথা রক্ষা, কুলদেবতার সেবা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা এবং স্বীয় বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা—যাতে পূর্বপুরুষের পিণ্ডব্যবস্থা লোপ না পায়—এ তাদের অবশ্যকর্তব্য।'

'কিন্তু ঈশ্বরকে পাওয়ার প্রশ্ন যেখানে—সেই পরম ও শ্রেষ্ঠ কারণে তপস্যা—অন্য সমস্ত কিছু ; ভোগ, দায়িত্ব, কর্তব্য, বিচার-বিবেচনা, লজ্জা ভয় এমন কি ক্ষুধা-তৃষ্ণার চিন্তাও ত্যাগ না করলে যাকে পাওয়া যায় না শুনেছি—সেখানেও কি এসব প্রশ্ন উঠবে ?'

প্রশ্নের সরল উত্তর দিলেন না, বা দিতে পারলেন না মধুসূদন ভারতী মহারাজ। বললেন, 'গৃহে তোমার বিধবা মাতা, তাঁর অন্য কোন সন্তান নেই। কিশোরী বধূ আছেন, তিনি অদ্যাপি সন্তানবতী হন নি—তুমিই তাঁদের একমাত্র আশা ও আশ্রয়স্থল। বর্তমান অবস্থায় এঁরা অত্যাজ্য। এ ক্ষেত্রে কোন সদ্‌গুরুই তোমাকে সন্ন্যাস দেবেন না।'

দৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলি উচ্চারণ ক'রে মধুসূদন মৌনাবলম্বন করেছিলেন সেদিন।···

এখন সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতী মহারাজের সেই নিষেধ মন্তব্যটিই আগে মনে পড়ল।

আরও স্মরণে এল—স্বয়ং শঙ্করাচার্যের সন্ন্যাস গ্রহণ করার জন্য একপ্রকার মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার কথা। জননীর অনুমতি গ্রহণের জন্য তাঁকেও ছলনার সাহায্য নিতে হয়েছিল—এই কিম্বদন্তী।

অর্থাৎ সন্ন্যাস নিতে গেলে জননী ও জায়ার অনুমতি গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

কিন্তু—

তাঁরা কি দেবেন? দেওয়া কি সম্ভব?

অথচ সে অনুমতি না নিয়ে যদি গৃহত্যাগ করেন, কোন সৎ-গুরুর চরণাশ্রয় লাভ ঘটবে না।

গুরু সন্ন্যাস দেওয়ার পূর্বে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন—সংসারে কে কে আছে এবং কি অবস্থায় আছে। সেখানে মিথ্যা বলাও চলবে না।

তবে বিশ্বেশ্বরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সন্ন্যাস তিনি নেবেনই। তাঁর যা আশা আদর্শ—তা সংসারাশ্রমে থেকে সফল কি সার্থক হওয়া সম্ভব নয়।

দুটি আকাঙ্ক্ষা তাঁর। ঈশ্বরকে লাভ করা, প্রত্যক্ষভাবে যেমন নারী তার দয়িতকে লাভ করে—সেই ভাবে। এবং ঈশ্বরের সেই প্রত্যক্ষ স্বরূপ, নরদেহধারী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য সাধনা, আর সে সাধনার সে আকুলতার অমৃতরস—দুঃখী, সন্তপ্ত, প্রপীড়িত, রিক্ত সুখসৌভাগ্যাদি সর্ববঞ্চিত পথভ্রষ্ট অজ্ঞান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

তা দিতে গেলে আগে নিজেকে তার অধিকারী হ'তে হবে—পরিপূর্ণ পাত্র সে অমৃত লাভ করতে হবে—নচেৎ তা অপরকে দিতে পারবেন কেন?

সে অমৃত কঠোর তপস্যালভ্য বস্তু। সে তপস্যা সে সাধনা সংসারে থেকে—ভোগের মধ্যে, প্রাচুর্য এমন কি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকে করার উপায় আছে কিনা তা তিনি জানেন না। তেমন কোন পন্থা বা আদর্শ তিনি অন্তত দেখতে পাচ্ছেন না, কারও কাছে শোনেনও নি।

অতএব—হয় সন্ন্যাস নয় এ দেহ বিনষ্ট করা—এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কোন কোন মানুষ আছেন যাঁরা অ-পরাজয়ের সহজাত বর্ম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা কোন বাধা বা প্রতিকূলতাতেই পথভ্রষ্ট বা সঙ্কল্পচ্যুত হবার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। বিশ্বেশ্বর আচার্য সেই শ্রেণীর মানুষ।

খ্যাতি যশ প্রতিষ্ঠার মোহ, সম্ভোগের নানা উৎকৃষ্ট উপকরণ যাঁকে বাঁধতে পারে নি—তাঁকে সামান্য দুটি স্ত্রীলোক বেঁধে রাখবে কি ক'রে!

না। তা পারবে না। পৃথিবীতে সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। আর

সে ব্যতিক্রম শুরু হয় কোন একজন মানুষকে দিয়েই।

ক্রমে ক্রমে সকল দিক বিবেচনা ক'রে বিশ্বেশ্বর স্থির করলেন তিনি সেই আপাত অসাধ্য কার্যই সাধন করবেন। ভার্যা ও জননীর অনুমতি নিয়েই গৃহত্যাগ করবেন।

মিথ্যাচরণ, ছলনা কি তস্করবৃত্তির সাহায্যে তাঁর এই বহু আকাঙ্ক্ষিত নবজন্মের সূচনা হতে দেবেন না।

তবু কার্যটা হয়ত অত অনায়াসসাধ্য হ'ত না– যদি ইন্দ্রাণী দেবী নিজেই প্রসঙ্গটা উত্থাপন না করতেন।

শুধু তো তিনিই নন, অনেকেই বিশ্বেশ্বরের এই আকস্মিক ভাবান্তরে উদ্বিগ্ন হয়েছেন। তাঁরাই আরও প্রতিদিন ইন্দ্রাণীকে অধিকতর চিন্তিত ক'রে তুলছেন।

এই বিপুল, নিত্য বর্ধমান নাম-মহোৎসবের প্রবর্তনা ক'রে নিজ শক্তিতে তাকে লালন ও পুষ্ট ক'রে—সহসাই তিনি সে উৎসবে এমন নিরুৎসুক বা বীতস্পৃহ হলেন কেন? কেনই বা বন্ধুবান্ধব এমন কি আচার্যদেব—যাঁকে অদ্বৈতবাদ থেকে এই ভক্তিবাদে উত্তরণ করাই বিশ্বেশ্বরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিজয়লাভ বলে মনে করেন অনেকে—তাঁর বা তাঁদের সঙ্গও পরিহার ক'রে চলছেন কেন বিশাই? কি হ'ল তাঁর? শারীরিক অসুস্থতা? মনোবৈকল্য? অথবা এই বিশ্বাসের উপরই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন?

ইন্দ্রাণীর নিজেরই উৎকণ্ঠিত বোধ করার, ব্যাকুল হবার যথেষ্ট কারণ ছিল—এদের এই প্রায়-সামগ্রিক অনুযোগে ও অবিরাম প্রশ্নে আর স্থির থাকতে পারলেন না।

একদা দ্বিপ্রাহরিক আহারাদি ও সামান্যমাত্র বিশ্রাম সেরে বিশ্বেশ্বর তাঁর অধুনা-অভ্যস্ত অজ্ঞাত যাত্রায় বেরোচ্ছেন–ইন্দ্রাণী তাঁকে ডেকে নিজের কাছে বসালেন। তাঁর তখনও আহার হয় নি, তবে বধূকে পূর্বেই খাইয়ে দিয়েছেন, নিজের জন্য কোন ব্যস্ততা নেই।

ইন্দ্রাণী বললেন, 'বিশাই, তুই কি ঐ ঈর্ষা নীচ লোকটার কথাতেই এত বিচলিত হলি!'

যেন চমকে ওঠেন বিশ্বেশ্বর, 'কে বলেছে মা?'

'কোন কোন সত্য অপরের কাছে শোনার প্রয়োজন হয় না। তোমার এ ভাবান্তর, এই বিষাদ ও সর্ব বিষয়ে ঔদাসীন্য—বোধ করি এ গৃহের জড় পদার্থগুলিরও লক্ষ্য করতে অসুবিধা হয় নি। তুমিই এই আশ্চর্য নামযজ্ঞের সূচনা করলে - আজ তা এই বিবিধ গৌরবশালিনী নগরীরও গৌরববৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠেছে ; এমন কি স্বয়ং কাজী সাহেবকেও একরকম পরাজিত ক'রে এই মহা-মহোৎসব পালনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছ—এখন আর তাতে তোমার বিন্দুমাত্র রুচি বা আগ্রহ দেখি না।...তুমি তোমার অনুরাগী ও ভক্তদের সাহচর্য—কিশোর যুবা বয়স্ক নির্বিশেষে ত্যাগ করেছ। তারা তোমার এই উপেক্ষাকে ক্রোধ বা বিরক্তির লক্ষণ ভেবে নিরতিশয় দুঃখিত হয়েছে। অকারণেই নিজেদের অপরাধী ভাবছে।'

এই পর্যন্ত ব'লে—একটু যেন নিশ্বাস নেবার জন্য বা অতিরিক্ত আবেগ সম্বরণের জন্য অল্পক্ষণ থামলেন ইন্দ্রাণী, পরক্ষণেই আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'তোমার আহারে রুচি চলে গেছে, কোন মতে- দেহ ধারণের জন্যও তত নয় যতটা আমাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য- একটু প্রসাদ মুখে দাও। ফলে দিন দিন কৃশ ও মলিন হয়ে যাচ্ছ, এই বয়সেই ললাটে বলিরেখার চিহ্ন দেখা দিচ্ছে। অমন লক্ষ্মী-প্রতিমা বধূর মানসিক অবস্থার দিকে তোমার ক্ষণমাত্র দৃষ্টি নেই। সেও নিজেকে কোন্ অজ্ঞাত কারণে তোমার কাছে অপরাধী চিন্তা ক'রে অস্থির হয়ে পড়েছে। তোমারই অমঙ্গল আশঙ্কায় উদ্গত অশ্রু দমনের চেষ্টা করছে—কিন্তু পারছে না। এ সব ঘটনার মূল যদি সেই নীচ লোকটার ঘৃণ্য ব্যবহার না হয়—তাহলে এ ভাবান্তরের কারণটা কি তাই বলো!'

অনেক, অনেকক্ষণ নীরব থেকে - ইন্দ্রাণীর মনে হ'ল এক যুগ—বিশ্বেশ্বর ধীরে ধীরে বিষণ্ণকণ্ঠে বললে, 'মা, আমি বড় দুঃখী!'

আর যাই হোক - ঠিক এ উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না ইন্দ্রাণী। তিনি চমকিত হয়ে উঠলেন, আবেগে উত্তেজনায় বিস্ময়ে যেন তাঁর বাক রোধ হয়ে এল। কোনমতে বললেন, 'তার—তার অর্থ? তুমি দুঃখী! এই বয়সে এতখানি প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি, এত লোকের এই প্রীতি শ্রদ্ধা, গৃহে প্রেমময়ী সুন্দরী বধূ—কান্তি, বুদ্ধি, মেধা ঈশ্বর বুঝি ঢেলে দিয়েছেন—তথাপি তুমি দুঃখী! আরও কি চাও? তুমি কি আর্থিক সম্পদ কামনা কর? এত দিন পরে কি সেটাই তোমার কাম্য হয়ে উঠল? তা হলেও—তোমার যা যোগ্যতা,

উপার্জনেও তো কোন অসুবিধা থাকার কারণ নেই। তবে দুঃখ কিসের ?'

বিশ্বেশ্বর নতমুখে—মায়ের চোখের দিকে চাইবার বুঝি সাহস নেই—বললেন, 'মা, আমি ঐশ্বর্যই চাই, অপরিমাণ অতুলনীয়—কিন্তু তুমি যে অর্থে ভাবছ—আর্থিক সম্পদ—সে অর্থে নয়। আমি চাই এমন সম্পদ যা ইহলোকে নর-দেব-ঋষি সকলের কাছেই দুর্লভ। মা, যে কোন বস্তু আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করে—একাগ্র অনন্যমনা হয়ে—সেটা না পেলে তার যে দুঃখ যে অভাব-বোধ, শূন্যতা—তা আর কিছুতে পূরণ হয় না ; সে দুঃখের অবসান ঘটে না। তেমনি এক তীব্র কামনা আমার—আমি ঈশ্বরকে পেতে চাই মা ! তাঁকে না পেলে আমার এ জীবন এ দেহ বৃথা, অর্থহীন।'

ইন্দ্রাণী তবুও বুঝি ঠিক বুঝতে পারেন না।

বলেন, 'কিন্তু সে তো আরও অনেকেই চায় বাবা। এ তো কোন নতুন কথা নয়।'

'না, সে চাওয়া আমি চাই না। আরও বহু ভোগ্যবস্তুর সঙ্গে অন্যতম হিসাবে, কিম্বা জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে অজ্ঞাত অন্ধকার অনিশ্চিত পরবর্তী জীবনের পাথেয় হিসাবে বা সেখানেও স্বর্গবাসের সুখভোগ নিশ্চিত করতে যে ঈশ্বরকে চাওয়া—সে চাওয়াতে আমার বড় ঘৃণা মা। কোন বড় সাধককে গুরুত্বে বরণ ক'রে সহজে ঈশ্বরকে লাভ করার চেষ্টা—সমান অবজ্ঞেয়। তেমন ক'রে ভগবানকে চাওয়াতে আমার রুচি নেই।'

'তবে ?' ইন্দ্রাণী ঠিক যেন বুঝতে পারেন না ওঁর কথাগুলো।

'আমি তাঁকে আপন ক'রে পেতে চাই মা। অন্তরঙ্গ ভাবে—প্রেমিকের মতো ক'রে চাই। রক্তমাংসের মানুষের মতো তাঁকে আমি চাই—তাঁকে সেবা করতে, তাঁকে আলিঙ্গন করতে, তাঁর ভালবাসা পেতে।'

'কিন্তু সে কি কখনও হয়। শাস্ত্রকাররা বলেন, তিনি এই অখিল বিশ্বের সর্বত্র অণুপরমাণুতে মিশে আছেন—তিনি অনন্ত, অনাদি, তাঁর আরম্ভ নেই শেষও নেই। আকারও নেই, একটা অদৃশ্য অবর্ণনীয় অপার্থিব শক্তি। তিনি এই সামান্য পৃথিবীর একটি মানুষকে ধরা দিতে আসবেন—দেহ ধারণ ক'রে ! এ তুমি ভাবতে পারলে কি ক'রে !'

'করেছেন মা ইতিপূর্বে। যুগে যুগে বার বারই তিনি বা তাঁর শক্তির এক অংশ দেহ ধারণ ক'রে এই মাটির পৃথিবীতে এসেছেন—তাঁর ইচ্ছাতেই সৃষ্ট

এই মানুষদের শাসন করতে, রক্ষা করতে। মানুষকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন—কিন্তু মানুষ যখনই সে স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, এক একজন যখন বহু জনের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করে বা তাদের সর্বপ্রকারে বঞ্চিত লাঞ্ছিত দলিত করে—তখনই অবতারের আবির্ভাব ঘটে। এও তো তোমার শাস্ত্রেই আছে। তা ছাড়াও হয়েছে। অংশ নয় পূর্ণরূপেই অবতীর্ণ হয়েছেন। স্নেহে প্রেমে করুণায় যুদ্ধে রাজনীতিতে—পূর্ণ কিন্তু মানবোত্তর এক মানব রূপে। মানুষের আর্তক্রন্দনে, বহু লোকের ঐকান্তিক একাগ্র প্রেমে স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন—তাঁরই সৃষ্ট জীবের এই লীলারস আস্বাদন করতে। গোপীদের প্রেমে, রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতীর প্রেমে, দ্রৌপদীর সখ্যে—ধরা দিয়েছেন। তাদের তপস্যায়, অমানুষিক সাধনায় মর্ত্যে নেমে এসেছেন—তাদের কামনা সার্থক করতে।'

'তোমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে বিশাই। পুরাণে বলে, তাঁরা যে জন্মে যে দেহে তপস্যা করেছেন সে জন্মে সে দেহে পান নি। সে পূর্ব দেহের তীব্র আকাঙ্ক্ষা কি তৃপ্ত হয়েছে? সে দেহের সে জন্মের অনুভূতি এ জন্মে থাকা সম্ভব নয়। কথাগুলো ভাল ক'রে ভেবে ছাখো।'

'তাঁরা এক জন্মে পান নি বলে কেউ পাবে না—তা আমি স্বীকার করি না। প্রেমের সর্বস্ব-ত্যাগ-করা আকুলতা থাকলে তিনি অবশ্যই ধরা দেবেন। সেই আকুলতা সেই ত্যাগই আমি আনতে চাই। সেই তপস্যা।'

'সেটা কি ভাবে হবে?'

'সন্ন্যাস নিতে হবে মা। কঠোর তপস্যা সন্ন্যাস ছাড়া হয় না।'

'সন্ন্যাস!' এবার যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠেন ইন্দ্রাণী, 'না না, এ কি বলছিস। ও-কথা বলিস নি। ও সর্বনেশে কথা মুখে আনিস নি। ও আমি কোনমতেই হ'তে দেব না!'

হাসেন বিশ্বেশ্বর, কেমন একরকমের করুণ হাসি। বলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ মা। সর্বনাশের কথাই। সর্ব-নাশ করতে না পারলে ইহলোকের যা কিছু বন্ধন, যা কিছু চিন্তা—সকলের বিনাশ না ঘটাতে পারলে সন্ন্যাস গ্রহণই তো মিথ্যা হয়ে যায়। দয়া মায়া স্নেহ প্রেম জন্মজ সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, কাম-কামনা—অর্থ যশ প্রতিষ্ঠা—সমস্ত। সেই জন্যেই তো সন্ন্যাস নিতে চাইছি মা। সব কিছু ত্যাগ করতে না পারলে তাঁকে চাইব কোন্ লজ্জায়!'

এবার কেঁদেই ফেলেন ইন্দ্রাণী, 'আমার যে আর কেউ নেই বাপ !···আমার মুখের ওপর এত বড় কথা বলতে পারলি ! তোর পিতৃপুরুষের ঋণ স্মরণ কর্। জল-পিণ্ড থেকে তাঁদের বঞ্চিত করবি ? আর ঐ অজ্ঞান মেয়েটা—এখনও বালিকা সে—ওর কথাটাও চিন্তা কর্। ওকে একটা সন্তান না দিয়ে তুই কোথায় যাবি !'

'মা, তোমর৷ সমস্ত জীবনটাই যেন একটা তন্দ্রার ঘোরে যাপন করছ। যে নিয়ম চলে আসছে আবহমান কাল ধরে তার আবরণ ভেদ ক'রে স্বচ্ছ নির্মোহ চোখে কখনও জীবনের সত্য দিকটা ছাখো না। সন্তান লাভ কি খুব সুখের ? মূত্রস্থান থেকে বীর্য স্খলিত হয়ে সন্তানের জন্ম সম্ভব হয়—কেউই নির্মল চিত্তে সন্তান কামনায় স্ত্রীতে উপগত হয় না, হয় কামের তাড়নায়—সে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ও ঐ মূত্রস্থান দিয়ে। সে জন্মে অজ্ঞান হয়ে—অজ্ঞানই থাকে। ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, অকিঞ্চিৎকর গণ্ডীবদ্ধ জীবন, তাই নিয়ে কলহ বিতর্ক বিতণ্ডার অন্ত থাকে না। অভিমানে অন্ধ হয়ে থাকে।

'মা, যৌবনে নবশক্তি-সচেতন হয়ে নিজেকে প্রায়-ঈশ্বর ভাবে মানুষ, তার পর বৃদ্ধ বয়সে যখন তাদের পুত্র-পৌত্ররা অবহেলা উপহাস করে, তখন কী পর্যন্ত দৈহিক কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে ভাব দেখি ! কটা দিনের জীবন মা, কত দিন তার এই সব মূল্যহীন ভোগ করার শক্তি থাকে। অথচ তার জন্যেই মানুষ হেন কুকর্ম নেই যা করে না। সামান্য ভূখণ্ডের জন্য পুত্র পিতাকে হত্যা করে, পিতা পুত্রকে। রাজ্যসীমা বৃদ্ধির জন্য অনায়াসে রক্তবন্যার সৃষ্টির করে নৃপতিরা। এ তো পুঁথি পুরাণে বিস্তর পড়েছ, চোখেও দেখছ কিছু কিছু। তবে সন্তানের জন্য এত হাহাকার কেন ? তোমার প্রতিবেশীদের মধ্যে যাঁরা বার্ধক্যে পৌচেছেন তাঁদের দুর্দশা তো তোমার দেখতে বাকী নেই। তবে আপনজন চাও কেন ? এ সংসারে আপনজন কেউ নেই, কেউ আপন নয়। সকলেই নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের ঘানিতে চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে—তার বাইরে কিছু জানে না—কিছু পায় না। তবে কেন একটা মিথ্যাকে এমন ভাবে আঁকড়ে রাখো।'

এসব কোন যুক্তিই, মস্তিষ্কে কেন কর্ণে প্রবেশ করারও বুঝি অবস্থা নয় ইন্দ্রাণীর। তিনি আকুল হয়ে রোদন করতে লাগলেন।

এও জানেন বিশেশ্বর। এ রোদনে তাই তিনি বাধা দিলেন না, সান্ত্বনা

দেবার চেষ্টা করলেন না—নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন—প্রাথমিক আবেগ প্রশমনের।

ক্রন্দন সম্বরণ করতে অবশ্যই বহু বিলম্ব হ'ল। অবশেষে একসময়—বধূর কথা স্মরণ ক'রেই সম্ভবত, সে দূর গৃহাভ্যন্তর থেকে এ দৃশ্য দেখলে আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠবে—কোনমতে নিজেকে কিছুটা প্রকৃতিস্থ ক'রে আনলেন ইন্দ্রাণী।

পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে বুঝলেন ওঁর এ আকুলতা এ বিলাপ তাকে কিছুমাত্র বিচলিত বা সঙ্কল্পভ্রষ্ট করতে পারে নি। তিনি বললেন, 'তাহলে—তুমি যদি সংসার ত্যাগ করবে বলে কৃতসঙ্কল্প হয়ে থাকো—তাহ'লে যাও। সন্ন্যাস নিলে বুঝি নারীহত্যার পাতক অর্শায় না!'

বাক্যের এ কণ্টকাঘাতেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল না বিশ্বেশ্বরের। তিনি বললেন, 'না মা, তোমার অনুমতি না পেলে যাবো না। যেতে পারবও না, তা তো তুমি জানই। শুধু তোমার কেন, স্ত্রীর অনুমতি না পেলেও সন্ন্যাস পাওয়া যাবে না। তবে—যা সত্য তাই বলছি—গৃহে থাকলে আমার দেহটাই থাকবে, জীবনের বড় উদ্দেশ্য, সর্বাপেক্ষা তীব্র আকাঙ্ক্ষা যদি চরিতার্থ করার, সফল করার উপায় না হয়—তাহ'লে মন ভেঙে যাবে চিরদিনের মতো। যা পড়ে থাকবে তা কিছু অস্থি মাংস ও চর্মের সমন্বয়, জীবন্ত কঙ্কাল। আর তোমার যা প্রধান কামনা, বংশ রক্ষা—সেও আমার দ্বারা সম্ভব হবে না আর। ও প্রবৃত্তিই জন্মাবে না কোন দিন।'

শিউরে উঠলেন ইন্দ্রাণী। একটা প্রবলতর আঘাতও বোধ করলেন।

ছেলে এমন কথা বলতে পারল তাঁকে! দেহটাই থাকবে, না, দেহও নয়—শুধু অস্থিচর্মের একটা জড়পিণ্ড! শবের মতো অবস্থা হবে ওর। হয়ত শবেই পরিণত হবে সে অচিরে।

এমন সাংঘাতিক কথা কি ক'রে বলল সে!

সে এতই পর হয়ে গেছে!

তাই যদি হয় ওকে ধরে রেখে কি করবেন।

সহসা—এই আঘাতেই যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন ইন্দ্রাণী দেবী। প্রাণপণ চেষ্টায় অশ্রু সম্বরণ করলেন।

অমানবিক মনের জোরে তাঁর স্বভাব-গাম্ভীর্য ও মর্যাদা বোধ ফিরিয়ে

আনলেন।

তিনি এই বিশ্বেশ্বর আচার্যেরই মা। তাঁর চরিত্রবলই ছেলে পেয়েছে। আজ এ যেন তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে, নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তার সঙ্গেই তাঁর সংঘর্ষ বেধেছে···!

কিছু সময় লাগল, তা তো লাগবেই।

তিনি ধীরে ধীরে, গম্ভীর, প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'তেমন ভাবে তোমাকে ধরে রাখতে চাইব না, তা তো তুমি জানই। পুত্রের সুখই সর্বথা জননীর কাম্য। আমিও নিজের ধারণার কাছে—বিশ্বাসের কাছে তোমাকে বলি দিতে চাই না। যাও, তুমি নিজের পথেই যাও। আমি তোমাকে আশীর্বাদই করছি, তুমি সফল হও, সিদ্ধি লাভ করো। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ইন্দ্রাণী, এখন দ্রুতবেগে ঠাকুরঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দেবতার আসনের সম্মুখে লুটিয়ে পড়লেন।

শয়ন দেবার পর কোন কারণে দেব-গৃহে প্রবেশ করতে গেলে বারকয়েক হাততালি দিয়ে ঢুকতে হয়। সে কথাও মনে পড়ল না। ছেলে যে—তিনি যেখানে বসে ছিলেন সেইখানে মাথা দিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করছেন—তাও লক্ষ্য করলেন না।

॥ ১৩ ॥

জননীকে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার ক'রে বোঝানো যায়—বালিকা স্ত্রীকে কি বলে বোঝাবেন?

এই প্রশ্নটাই অবশিষ্ট দিনটা পীড়া দিতে লাগল। নির্জন গঙ্গাতীরে গিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ক'রেও যেন কোন পথ দেখতে পেলেন না। বরং একটা অস্বস্তি ও শঙ্কার ভাব নিয়েই গৃহে ফিরে এলেন।

সন্ধ্যারতি, রাতের শীতল, শয়ন-আরতি—সর্বপ্রকার সেবাই ক'রে গেলেন, তবে সে যন্ত্রের মতোই। অভ্যস্ত হাত এবং মুখ কাজ ক'রে গেল—এইমাত্র। তার সঙ্গে মস্তিষ্ক বা মনের কোন যোগ রইল না।

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ, থমথম করছে। জননী একটিও কথা কইছেন না,

সেটা অবশ্য আশাও করেন নি বিশ্বেশ্বর। আরতির সময় একুশ দীপের আলোতে মার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন—নিরুদ্ধ রোদনে তাঁর দুই চক্ষু জবাফুলের মতোই আরক্ত হয়ে উঠেছে।

বুকে কি একটা তীক্ষ্ণ তীব্র আঘাত অনুভব করলেন না ?

তাঁর দেবীসমা জননী, একাধারে পিতা ও মাতার কর্তব্য ক'রে গেছেন। পুত্রের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। পুত্রকে সাংসারিক দায়িত্ব এবং ঝঞ্ঝাট থেকে যতটা সম্ভব আচ্ছাদিত ক'রে রেখেছেন চিরকাল। ছেলে যাতে গৃহবাসী থাকে এই আশায় কীর্তন উপলক্ষে কত না পরিশ্রম করেন হাসিমুখে। সেই মার বুকে শেল দিয়েছেন। সে শেলের আঘাত নিজের বুকেও কি কম বেজেছে !

কিন্তু উপায়ও তো ছিল না। অথবা এই তো পরীক্ষা।

যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে উদ্যত তাকে প্রথমেই দুর্বল হয়ে পড়লে চলবে কেন !···

আহারে রুচি ছিল না, শুধু মার মুখ চেয়েই প্রতিদিনের মতো বসতে হ'ল। মা যে বধূকে আহার্য সাজিয়ে দিয়ে বাকী সব তুলে রাখলেন - অর্থাৎ এবেলা উপবাসীই থাকবেন, একটু প্রসাদও মুখে দেবেন না—তাও লক্ষ্য করতে হ'ল। তবে এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করতেও সাহসে কুলোল না। মা কি বললেন তার ঠিক কি। সে বেদনার কথা শুনে হয়ত উনি আরও বিচলিত হয়ে পড়বেন। আর, গৃহত্যাগ করলে তো এমন বহুদিনই উপবাসী থাকবেন মা—তখন তো আর উনি সান্ত্বনা দিতে কি সাধ্য-সাধনা করতে আসবেন না। সন্ন্যাস নিতে গেলে পিছনের দিকে আর তাকানো যায় না।···

ক্লান্ত, অবসন্ন একটু বা আশঙ্কিত মন নিয়েই শয়নকক্ষে গেলেন বিশ্বেশ্বর।

সেখানেও একটা আঘাত পেলেন তিনি। অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয়।

তবে এ সম্পূর্ণ ভিন্ন আঘাত। বিস্ময়ের আঘাত। প্রবল বিস্ময়।

গৃহে এসে যথা-অভ্যস্ত উত্তরীয় খুলে আলনায় রেখে আসনের দিকে যাবেন—মাধবী এসে ওঁর দুটি হাত ধরলেন।

হাসি হাসি মুখ তাঁর। শুধু তাই নয়—দুঃসাহসিনীর কণ্ঠেও অন্য দিনের মতো লজ্জার জড়িমা নেই, দৃষ্টি থেকে ভয় ও মিনতির সে সংমিশ্রণও যেন মুছে গেছে। তিনি সহজ (যে ভাব এতদিনে কখনও দেখেন নি বিশ্বেশ্বর)

স্পষ্ট কণ্ঠেই বললেন, 'অত ভয় পাচ্ছেন কেন? ভাবছেন আমি সন্ন্যাস নেওয়ায় বাধা দেব, কান্নাকাটি করব?'

বিশ্বেশ্বর সহসা কোন উত্তর দিতে পারলেন না—এতই বিস্মিত ও বিমূঢ়বৎ হয়ে গেছেন।

মাধবীই আবার বললেন, 'আপনি আমার দেবতা, আমার ইষ্ট, আপনার সুখেই আমার সুখ, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আপনি যাতে সুখে থাকেন, শান্তি পান—আমি তাতে বাধা হবো কেন?'

বিশ্বেশ্বর যেন নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করতে পারেন না।

,তুমি ঠিক বলছ মাধবী? জেনে বুঝে বলছ তো?'

'জেনে বুঝেই বলছি। আমিও সন্ন্যাস নেব আপনার সঙ্গে, আপনার সঙ্গেই থাকব। তাতে দুঃখ বোধ করব কেন?'

বিশ্বেশ্বর এবার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের কারণটা বুঝতে পারেন। বালিকার পক্ষে এ সব কথা জানা বা বোঝা সম্ভব নয় বলেই সে এত নিশ্চিন্ত উৎফুল্ল আছে—বিরাট মিথ্যার উপর অসম্ভব, অবাস্তব প্রসাদ রচনা ক'রে।

শান্ত ধীর কণ্ঠে পত্নীর মুখখানি নিজের দিকে তুলে ধরে বলেন, 'তুমি একটু ভুল জেনেছ, সন্ন্যাসীর জীবনে স্ত্রীসংসর্গ, স্ত্রীলোকের সাহচর্য সঙ্গ—বিষবৎ পরিত্যাজ্য।'

প্রভাতের প্রফুল্ল শতদল যেন নিমেষে সন্ধ্যার আভাস পায়, শুষ্ক মলিন হয়ে ওঠে।

উৎকণ্ঠিত অবিশ্বাসের সুরে বলেন, 'কেন, সন্ন্যাসিনী কি হয় না! শুনেছি কুম্ভ স্নানে শত শত সন্ন্যাসিনী আসেন, আমার পিতামহ নিজে দেখে এসেছেন।'

'সন্ন্যাসিনী কে আছেন জানি না, তবে তপস্বিনী হতে বাধা নেই। কিন্তু তাঁদেরও পুরুষের সঙ্গ সংসর্গও এইরূপই নিষিদ্ধ। এমন কি গুরু ব্যতীত অপর সাধুর সঙ্গও। এক অবধূত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর একত্র বাসের ব্যবস্থা আছে, কোন কোন তান্ত্রিক উত্তরসাধিকা নিয়েও সাধনা ক'রে থাকেন - তবে আমার সন্ন্যাস তেমন নয়। ইহজীবনে সমস্ত বন্ধন বাসনা কামনা ত্যাগ ক'রে নিজের শ্রাদ্ধ নিজে ক'রে এ সন্ন্যাস নিতে হয়, এখানে স্ত্রী কেন মার সাহচর্যও সম্ভব নয়।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রায় হতাশ কণ্ঠে বলতে যান মাধবী, 'কেন

সীতা দেবী যে গিয়েছিলেন স্বামীর সঙ্গে চীরবল্কল পরিধান করে—'

'না, সীতা দেবী চীরবল্কল পরিধান করেন নি। তাহলে আর রাবণ যখন তাঁকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে তখন তিনি পরিহিত অলঙ্কার ফেলতে ফেলতে যাবেন কি করে? রামচন্দ্রকেই চীরবল্কল গ্রহণ করতে হয়েছিল—পিতৃসত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে। সীতা দেবীর তো তেমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাছাড়া রামচন্দ্র সন্ন্যাস নেন নি, চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে বাস করার কথা—এইমাত্র, তিনি ফিরে গিয়ে সিংহাসন গ্রহণ করবেন এ স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি তিনি ভরতকে দিয়েছিলেন।'

এবার কান্নায় ভেঙে পড়েন মাধবী। সহসা যেন মনে হয় তাঁর পায়ের নিচের মাটি সবে যাচ্ছে, তিনি কোন অন্ধ গহ্বরে একা—কেউ কোথাও নেই তাঁর, থাকবে না। জীবনে আলো বলতে কিছু থাকবে না।

বিশ্বেশ্বরের গৃহে স্থান লাভ ক'রে সাধারণ ঐ বয়সী কিশোরী মেয়েদের অপেক্ষা অনেক বেশী জ্ঞান আহরণ করেছিলেন সত্য কথা—দিবারাত্রি নাম-সঙ্কীর্তনে মত্ত হওয়া দেখেও বুঝেছিলেন যে এ লোক অধিকদিন সংসারে থাকবেন না—এবং তাঁর ধারণা তিনি সেজন্য নিজেকে প্রস্তুতই করেছেন।

তবু বালিকা বালিকাই। তাঁর পক্ষে, যে অবস্থা আগে আর কারও দেখেন নি, সে অবস্থার কথা কল্পনা করা কি চিন্তা করাও তো অসাধ্য। শিক্ষা কি জ্ঞানই বা এর মধ্যে কতটুকু আয়ত্ত করা সম্ভব। সুতরাং তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠবেন, নিজেকে অসহায় বোধ করবেন, এ-ই তো স্বাভাবিক।

মার ক্ষেত্রে যেমন, স্ত্রীর বেলাতেও তেমনি—নীরব হয়ে রইলেন বিশ্বেশ্বর। প্রতীক্ষা করতে লাগলেন এই দুঃখের, সম্পূর্ণ আশাভঙ্গের এই বেদনার প্রাথমিক প্রবলতা নিঃশেষিত হবার।

নিজেকে যে ঈষৎ অপরাধী বোধ করতে লাগলেন না—তাও নয়।

মা বয়স্কা, তিনি কারও কাছে রীতিমতো পাঠগ্রহণ না করুন—পণ্ডিতগৃহের কন্যা, পণ্ডিতবংশের বধূ—শুনে শুনে, প্রত্যক্ষ দেখে অনেক কিছু শিখেছেন। একে সন্ন্যাসের মর্ম, সাধনার তত্ত্ব, তাঁর মনের বিচিত্র গঠন, তাঁর আশা—এসব কি বোঝানো যাবে? জ্ঞান দিলেই হয় না—যে পাত্রে দিচ্ছেন সে আধার কতখানি তা বিবেচনা ক'রে দেখা প্রয়োজন।

এ বালিকা তাঁর কাছে পায় নি কিছুই, তবু তাঁকে ভালবাসে। অথচ তিনি

স্বার্থপরের মতো নিজের কথাই কেবল চিন্তা করছেন। এ মেয়েটা কি পেল, কি পাবে তা ভাবছেন না।

কিন্তু তাঁরও যে আর উপায় নেই। তিনি কিছুতেই যাকে সংসার করা বলে, তা করতে পারবেন না। এর যা প্রাপ্য, এ কেন, এই বয়সের সব মেয়ে যা আশা করে তা দিতে পারবেন না। সুতরাং সান্ত্বনা দেবারও কোন উপায় নেই তাঁর। কীই বা বলবেন, ভবিষ্যতের কোন্ আশার চিন্তা ক'রে বুক বাঁধতে বলবেন!

বুঝি এমনিই হয়। ওঁর যিনি ইষ্ট, যাঁকে পাবার জন্যই এমন সর্বগ্রাসী আকুলতা ওঁর—তিনিও এমনি করেই বহুকে কাঁদিয়েছেন। সেই কান্নার মধ্য দিয়ে, বিরহের মধ্য দিয়েই তারা তাঁকে পেয়েছে কিনা কে জানে।

এটুকু জানেন শুধু—ওঁকেও এমনি ক'রে কাঁদতে হবে দীর্ঘকাল।

বিশ্বেশ্বরের অনুমান এবারও অভ্রান্ত প্রমাণিত হ'ল।

বহুক্ষণ, প্রায় তিন দণ্ডকাল নীরব আকুল রোদনের পর ধীরে ধীরে আপনিই শান্ত হয়ে এলেন মাধবী—একান্ত শ্রান্ত হয়েই। সে কান্নার কোন উচ্চ শব্দ নেই তবু, অথবা সেই জন্যই, মনে হয়েছিল হৃদয় বা দেহ এত নিরুদ্ধ আবেগ সহ্য করতে পারবে না, প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে।

ওঁর সে যন্ত্রণা দেখে বিশ্বেশ্বরও যথেষ্ট যন্ত্রণা বোধ করছিলেন, তবে তিনি জানতেন যে একসময় শারীরিক শক্তির অভাবেই মাধবীকে বিরত হতে হবে, সেই আশাতেই সে দুঃসহ দুঃখ সহ্য করছিলেন।

শান্ত হবার পরও কথা বলতে দেরি হ'ল।

কী বলবেন, কি বলা উচিত, কি করবেন—কিছুই গুছিয়ে ভাবতে পারছিলেন না। অবশেষে সেই কথাই বললেন, 'তাহলে আমি কি করব? বিবাহের পর থেকে সর্ব বিষয়ে চিন্তাভাবনা আপনার পায়ে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম, আপনিই বলুন আমার কি গতি হবে, আমি কি করব!'

বিশ্বেশ্বর মিষ্টকণ্ঠে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গিনী হ'তে চাইছিলে সন্ন্যাস নিয়ে—সে আমার তপস্যায় সাহায্য করার জন্যই, তাই নয় কি?'

ঠিক যেন কথাগুলো বুঝতে পারেন না মাধবী, বক্তব্যের গতি কোন্ পথে যাবে। আর এখন যেন ভাবারও শক্তি নেই। কিছুক্ষণ বিহ্বল ভাবে চেয়ে

থেকে বলেন, 'কি জানি। আমিও তপস্যা করব ভেবেছিলাম।'

এবার একটু অসহায় বোধ করেন কি বিশ্বেশ্বর ?

একটু থেমে বলেন, 'কিন্তু আমি যে তোমার সাহায্য চাই। তুমি দয়া না করলে আমার সাধ তো কোনদিনই পূর্ণ হবে না !'

এই দয়া শব্দেই তড়িৎ স্পর্শ ঘটল। অকস্মাৎ আকুল ও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মাধবী, বললেন, 'ছি ছি, এ কি বলছেন ! আপনাকে দয়া করব, করতে পারি, বললে যে আমার অপরাধ হয়। আপনার কোন আজ্ঞা পালন করতে পারব সে তো আমার সৌভাগ্য।'

'তাহলে কথা দিচ্ছ আমাকে ?'

এবার ঈষৎ যেন অনুযোগের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চান মাধবী, 'কথা নিয়ে বাক্যবন্ধ করার কথা আপনি ভাবতে পারলেন কি ক'রে ! আপনি যা বলবেন তা আমি শুনব না, এ তো আমি ভাবতেই পারি না। আপনি ছাড়া আমি যে কোন দেবতা ঈশ্বর কাউকে জানি না, আপনিই আমার ভগবান !'

'তাহলে আমার অনুরোধ, তুমি এখানেই থাকো। আমি সংসার সাংসারিক বন্ধন সম্পর্ক ত্যাগ করতে উদ্যত ঠিকই—কিন্তু কর্তব্যের বন্ধন বড় কঠিন যে। মা স্ত্রী এদের অনুমতি না নিলে সন্ন্যাস দেবেন না গুরু। বংশগত গৃহদেবতা, তাঁরও সেবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আদেশ গ্রহণেই কর্তব্য শেষ হয় না। মার আদেশ নিয়েছি, কিন্তু সে কতকটা বলপূর্বক ভয় দেখিয়ে নেওয়া। সে ক্ষেত্রে তাঁর পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং গৃহদেবতার সেবা—এর কিছু সুব্যবস্থা না দেখে চলে গেলে আমাকে প্রত্যবায়ভাগী হতে হবে। তুমি যদি এই ভার নাও, তাহলেই আমাকে যথার্থ মুক্তি দেওয়া হয়।'

ভীতি এবং সংশয়—যুগপৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে মাধবীর মুখে, চোখের দৃষ্টিতে। তিনি বিহ্বল কণ্ঠে বলেন, 'কিন্তু আমি কি পারব ? আমি যে এখনও সংসারের কিছুই জানি না—মার সেবা করতে পারব—তবে বাইরের দিক—?'

'তার জন্য চিন্তা ক'রো না। তুমি মাকে দেখো তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত। এখানে আমার বন্ধু অনুরাগী যাঁরা আছেন, তাঁরা তোমাদের উপবাসী থাকতে দেবেন না। পুরাতন সেবকরা আছে, তারা প্রাণ দিয়ে দেখবে। দেবসেবা আর তোমাদের দু'মুঠো প্রসাদ—এ হয়েই যাবে।'

বহুক্ষণ নীরব থেকে মাধবী বললেন, 'বেশ, আপনার আজ্ঞা আমি মাথা

পেতে নিলাম। আর কোন আদেশ আছে? আমার সম্বন্ধে আর কোন অনুজ্ঞা?…আমি কি এখানে থেকেও আপনার সাধনার পথ অনুসরণ করতে পারি না?'

আবেগে এবার মাধবীর দুটি হাত চেপে ধরেন বিশ্বেশ্বর। বলেন, 'তুমি আমাকে বাঁচালে। এই কথাটাই কি ক'রে বলব তাই ভাবছিলাম। আমিও তাই চাই। গৃহে থেকেও সাধনা হয়—মেয়েরা, বিবাহিতা মেয়েরাও তপস্যা করতে পারে এই আদর্শ তুমি স্থাপন করো।'

চকিতে একবার যেন ভ্রূকুঞ্চিত হয় মাধবীর।

কিন্তু কণ্ঠে কোন উষ্মা কি ব্যঙ্গ প্রকাশ পায় না। শান্ত ভাবেই বলেন, 'মেয়েদের গৃহে থেকে সাধনা সম্ভব হ'লে পুরুষের হবে না কেন?'

'আমি থাকলেই দম্পতি। স্বামী-স্ত্রী। কাছাকাছি থাকব, আমি যুবক, তুমি যুবতী—দেহের ধর্ম পীড়ন করতে থাকবে। প্রতিনিয়ত সেই যুদ্ধ করতে করতে কোনমতে নাম জপ যদি বা হয়, সন্ন্যাস কেন, তপস্যাও সম্ভব হবে না।'

'আমি যদি অন্যত্র যাই?'

'সে তো আরও অশান্তি। তখন সংসারের দায়িত্ব, মা, গৃহদেবতা। তা ছাড়াও আছে। গৃহে থাকলে বহু লোক নিত্য আসা যাওয়া করবে—বহু বন্ধু, বহু ভক্ত, বহু অনুরাগী। লক্ষ কোলাহল। বিভিন্ন অরুচিকর প্রসঙ্গ। সংসারের বিষ সঙ্কীর্তনে দূর হয় না। আমি যে সব ছাড়তে চাই। সব না ছাড়লে তাঁতে সমস্ত মন অর্পণ করা যায় না, সেজন্য নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব, আশ্রয়হারা হয়ে কঠোর সাধনার প্রয়োজন।'

'কিন্তু আমি যে সাধনার কিছুই জানি না। আমি কি করে কি করব?'

'আমি তোমাকে দীক্ষা দিয়ে যাবো মাধবী। ইষ্টমন্ত্র স্বামীর নিকট হতে নেওয়াই শ্রেয়—যদি না একই সঙ্গে তা গুরুর কাছ থেকে নেওয়া যায়। আর তপস্যা? শ্রীকৃষ্ণ আমার ইষ্ট, তুমি আমাকে ইষ্টর মতো মনে করো—আমাতে শ্রীকৃষ্ণে যেদিন তোমার মনে এক হয়ে যাবে—বুঝবে তোমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে। তোমার পক্ষে নাম জপ করা আর তাঁর চিন্তা ধ্যান—সর্ব কর্মে সকল ভাবনায় তাঁকে স্মরণ করা—এই-ই যথেষ্ট তপস্যা। আর সেইখানেই তোমায় আমায় নিত্য মিলন। আমি যেখানেই থাকি এই একই চিন্তা দুজনের এই একই মন্ত্রজপ—এই কথাটা চিন্তা ক'রো, আমার দেহাতীত উপস্থিতি অনুভব করবে।…

আগামীকালই শুভ লগ্ন আছে, তুমি প্রত্যূষে স্নান ক'রে এখানেই এসো, এই ঘরেই আমি তোমাকে দীক্ষা দেব।'

আর কোন কথা বললেন না মাধবী কিন্তু যখন গলায় আঁচল দিয়ে স্বামীর দুই পায়ে মাথা রেখে প্রণাম ক'রে আবার মুখ তুললেন—বিশ্বেশ্বর দেখলেন তাঁর দুই চোখ থেকে পুনশ্চ জলের ধারা নেমেছে।

মাধবী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মুছে গাঢ়কণ্ঠে বললেন, 'না না, দুঃখের নয়, এ আমার আনন্দের অশ্রু। আপনি আমার সঙ্গে নিত্য মিলন স্বীকার করেছেন, আমার সঙ্গে ইষ্ট-সাধনা ভাগ ক'রে নেবেন—এই চিন্তাই আমাকে আজীবন বিচ্ছেদ সহ্য করার শক্তি যোগাবে।'

তারপর ঈষৎ থেমে একটু যেন অধিকতর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'তবে একটা ভিক্ষা, যেদিন যাবেন আমাদের না জানিয়েই যাবেন, চোখের সামনে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন চিরকালের মতো হয়ত বা—হয়ত অতটা সহ্য হবে না, ভেঙে পড়ব হয়ত, হয়ত মনের এই এখনকার সঙ্কল্প আশ্বাস স্থৈর্য কিছুই কাজে আসবে না। আর মা ও—হয়ত মাথা কুটবেন, উন্মাদের মতো আচরণ করবেন—আপনি দুঃখ পাবেন তাতে।'

'তাই হবে মাধবী। আজ বুঝছি তুমি আমার প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ!'

॥ ১৪ ॥

সন্ন্যাস নেবার পর কটা দিন যেন এক ঘোরের মধ্যে দিয়ে কাটল বিশ্বেশ্বরের।

সে ঘোর বা আচ্ছন্নতা ক্রমশ এক প্রবল দ্বন্দ্বে পরিণত হ'ল।

সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছা এতদিনের, এ কদিন শুধু সেই কথাই চিন্তা করেছেন একমনে, যেন একটা জিদকেই লালন করেছেন অবিরাম।

এখন সেই সন্ন্যাস পাওয়ার পর—পুরো মনটা কি দিতে পারছেন তপস্যায়?

যে সব অনভিপ্রেত চিন্তা জোর ক'রে মন থেকে অপসারিত করার চেষ্টা করছেন সেই সব চিন্তাই পুনঃ পুনঃ অধিকতর শক্তি সঞ্চয় ক'রে মনে আসছে।

মনে হচ্ছে তাঁর দেবীর মতো জননী, নিবেদিতপ্রাণা কিশোরী বধূ—সেদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ ক'রে উন্মুক্ত দুয়ার, শয্যা শূন্য দেখে না জানি কি আছাড়-পিছাড়িই খেয়েছেন!

এই অল্প বয়সেই বহু লোক বহু ধরনের লোক, দেখেছেন তিনি—অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান বিশ্বেশ্বর জানেন যে অনুমতি দেওয়া, আবেগের বশে তাঁকে নিশ্চিন্ত করার যতই চেষ্টা করুন না কেন—মা স্ত্রী এঁরা, এই সর্বকালের জন্য গৃহত্যাগে, চিরদিনের মতো তাঁদের পরিত্যাগ ক'রে যাওয়ার আঘাতে ভেঙে পড়বেনই। তখন আর ভদ্র শিক্ষিত বংশের সংস্কার, স্থৈর্য কিছুই থাকবে না। এই শ্রেণীর আঘাতে যে দুঃখ তা যখন বাস্তব হয়ে দাঁড়ায় তখন গ্রাম্য নারীতে ও নগর-যোষিতায় কোন পার্থক্য থাকে না। চিরন্তন নারীর হাহাকার একই, সর্বদেশে, সর্বকালে।

ওঁদের ভরণপোষণের অভাব হবে না, তবু সে কথাও মনে হয় বৈকি।

অবশ্য এ সবই সাময়িক। ক্ষণেকের চিন্তা ক্ষণেকেই মেলায়—লীয়ন্তে হৃদিকুথায়।

সন্ন্যাসীর এ সব চিন্তা নিষিদ্ধ, ইষ্ট ব্যতীত অন্যমনস্ক হ'তে নেই—এই জ্ঞানে বার বার মানসিক বন্ধন'চন্তা ছিন্ন করার চেষ্টা করেন, তবু কোথায় অবচেতনে অশান্তি একটা থেকেই যায়।

কেন, কি করলে তিনি অনন্যমনা হয়ে এতদিনের ঈপ্সিত তপস্যায় নিজেকে নিয়োগ করতে পারেন?

অবশেষে আর দ্বন্দ্ব সহ্য করতে না পেরে মধুসূদন ভারতীকে একদিন বলেন, 'শুনেছি সন্ন্যাসীর পক্ষে তীর্থভ্রমণ বা হিমালয়ে গমনই প্রশস্ত। আপনি আজ্ঞা দিন আমি ব্রজমণ্ডলের দিকে যাত্রা করি।'

মধুসূদন কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তীর্থযাত্রা কালে তোমার চিন্তা বা মানসিক অস্থিরতাকে কি এ স্থানে রেখে যেতে পারবে?'

লজ্জা পেলেন কৃষ্ণপ্রাণ ভারতী—বর্তমানে বিশ্বেশ্বরের এই নামকরণ হয়েছে—মাথা নিচু ক'রে জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'সেখানে শুনেছি শ্রীভগবানের নিত্য-লীলা আজও বহমান, সেখানের বাতাসে গোপীগণের তদ্গতপ্রাণতা, সেখানের ধূলিকণা তাঁর পদরজঃপূত—সেখানে গেলেও কি আমার চিত্ত স্থির হবে না—?'

তার পর, মাথা তুলে তখনও নির্বাক মধুসূদনের দৃষ্টি তেমনি স্থির নিবদ্ধ দেখে কতকটা বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে আপনিই বলুন, এখন কি করব?'

মধুসূদন বললেন, 'আমার মনে হয় কয়েকদিনের জন্য তোমার শান্তিপুর গমনই শ্রেয়। শুনেছি আচার্যদেব, শ্রীনিবাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন, তোমার পূর্বাশ্রমের মাতৃদেবী ও ভার্যা অনাহারে অনিদ্রায় এবং নিরন্তর রোদনে মৃতপ্রায়। তুমি শান্তিপুরে গেলে তাঁরা আসতে পারবেন, তোমার জননীও তোমাকে দেখে এই আশ্বাস লাভ করবেন যে হয়ত ভবিষ্যতেও এই ভাবে মধ্যে মধ্যে পুত্রের দর্শন লাভ করবেন, অন্তত যোগাযোগ—সংবাদ আদানপ্রদান থাকবে। আর তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছেন, কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করেছেন জানলে তুমিও চিন্তার সূত্র থেকে মুক্ত হয়ে তপস্যায় সম্পূর্ণ মনোসংযোগ করতে পারবে। প্রয়াগের পর থেকেই গাঙ্গেয় পশ্চিমাংশকে যমুনা বলে গণ্য করা হয়। প্রত্যহ সেখানে স্নান ক'রে ইষ্ট ধ্যান করলে ব্রজমণ্ডলের পরিবেশ অনুভব করতে পারবে।'

'আবার গৃহের নিকট, পূর্ব-পরিচিতদের মধ্যে?' উদ্বিগ্ন বিষণ্ণ কৃষ্ণপ্রাণ বলে ওঠেন।

'কেন, তাতে কি তোমার বৈরাগ্য বিপন্ন হবে? তোমার বৈরাগ্য, তীব্র ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষা কি এত ভঙ্গুর! আর, এ সবই শ্রীকৃষ্ণের গৃহ, ভক্তজন মাত্রেই আত্মজন। তোমার আমার গৃহ বলে কিছু নেই। দেখ, তোমার যা অভিরুচি। আমি যা বললাম তোমার কল্যাণের জন্যই।'

সেই আদেশ বা উপদেশ মতোই নবীন সন্ন্যাসী পদব্রজে যাত্রা করলেন। একা, নিঃসঙ্গ। নিঃসম্বল। একবস্ত্র।

কোন্ দিকে যাচ্ছেন সে জ্ঞান নেই, আহারাদি সম্বন্ধেও কোন সচেতনতা বা আগ্রহ নেই। হয়ত শেষ পর্যন্ত শান্তিপুরে পৌছানোই হ'ত না—যদি না অনুরাগীজনেরা, তাঁরই সন্ধানে বহির্গত তাঁর বন্ধুরা তাঁকে দেখে ফেলতেন।

চেনা প্রায় অসম্ভব, অমন সুন্দর কান্তি ধূলিধূসর, অনাহারে অনিদ্রায় দেহ শুষ্ক ও শীর্ণ, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি বিলুপ্ত—এই কি সে অনিন্দ্যসুন্দর বিশ্বেশ্বর আচার্য?

বাষ্পাচ্ছন্ন-দৃষ্টি বন্ধুরা তাঁকে স্নান করিয়ে নূতন গৈরিক বহির্বাস পরিয়ে দিলেন। একবস্ত্রেই এ কয়দিন ছিলেন, স্নানান্তে অশৌচকালের মতোই সিক্তবস্ত্র দেহের উত্তাপে ও বাহিরের বাতাসে শুষ্ক হ'ত; ব্রহ্মস্বরূপ বুঝিয়ে দিলেন যে

বহির্বাস দণ্ড কমণ্ডলু সবই একসময় জীর্ণ দশাপ্রাপ্ত হ'তে বাধ্য, সে ক্ষেত্রে নবগ্রহণ যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন মিথ্যা এই মলিনবস্ত্রে থাকার প্রয়োজন কি?

আচার্যদেবের বাটির বহিরঙ্গনেই আশ্রয় গ্রহণ করলেন কৃষ্ণপ্রাণ। তাঁর শুভ আগমন সংবাদ শুনে চারিদিক থেকে অগণিত ভক্ত ছুটে এল তাঁকে দর্শন করতে। নবদ্বীপ প্রায় শূন্য ক'রে তাঁর অনুরাগীরা এসে পৌছলেন। তাঁদের স্থানের জন্য চিন্তা নেই, আহারের উৎকণ্ঠা নেই, ওঁকে দেখেই শান্তি—তারপর তো প্রান্তর বৃক্ষতল রইলই।

আচার্য ওঁর সংবাদ পাওয়া মাত্র ইন্দ্রাণী দেবীকে তা পৌছে দিয়েছিলেন, এক্ষণে তাঁকে আনয়নের জন্য নৌকা প্রেরণ করলেন।

ইন্দ্রাণী দেবী ত্রস্তে-ব্যস্তে যাত্রা করলেন বৈকি!

তিনি যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই ছুটে এলেন নৌকার কাছে। কিন্তু জলে নেমে নৌকা আরোহণ করতে গিয়ে সহসাই সচেতন হয়ে উঠলেন—আর একটি প্রাণী সর্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত ক'রে তাঁর পিছনে পিছনে এসেছে।

তাঁরই পুত্রবধূ বালিকা মাধবী।

গত কয়েকদিনের অবিরাম ক্রন্দনে, অনাহারে, অনিদ্রায় তার সেই স্বর্ণলতার মতো তনু বিশুষ্ক, শ্বেতচম্পকবৎ গাত্রবর্ণ তাম্রাভ, দুটি আয়ত চক্ষু কোটরগত।

দেখে মায়া তো হয়ই, নিজেকে যেন অপরাধী বোধ করেন ইন্দ্রাণী।

তিনি সস্নেহে আবাহন করতে যাচ্ছেন, আচার্যের প্রেরিত লোকটি সবিনয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে জানাল, সন্ন্যাসীর পূর্বদেহের স্ত্রী দর্শন নিষিদ্ধ। এমনিতেই গর্ভধারিণী ব্যতীত কোন স্ত্রীলোককে সম্ভাষণ করার রীতি নেই, তদুপরি পত্নী—নৈব নৈব চ। আচার্যদেব বিশেষভাবে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন।

ইন্দ্রাণী দেবীর বোধ হ'ল আবারও একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলেন।

এই মেয়েটা—এই বয়সেই স্বামীসঙ্গ-বঞ্চিতা—

দূর থেকেই না হয় তাকে দর্শন করত, তাতে এমন কি অন্যায় বা অনাচার ঘটত!

তাঁর মনে হ'ল তিনি এ নৌকা শূন্যই ফিরিয়ে দেন।

প্রয়োজন নেই মিথ্যা ঐ নিষ্ঠুর পুত্রকে দেখে। কিন্তু দেখলেন ঐ লোকটির বাক্যগুলি কর্ণগোচর না হোক বাক্যের মর্মার্থ মাধবীর মস্তিষ্কগোচর হয়েছে। সে নতমুখ আরও নত ক'রে ফিরে যাচ্ছে গৃহের দিকে।

দুঃখ ঠিকই, তত্রাচ পুত্রকে দেখার আকর্ষণ আরও প্রবল।

ইন্দ্রাণী নৌকায় আরোহণ করলেন।

মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকবাস দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্তানকে দেখে জননীর বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে অশ্রু নির্গত হওয়ার কথা, দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে দৃষ্টির অন্তরায়ও ঘটল তথাপি এ সত্যও উনি মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, এই বেশেও ওঁর পুত্র অনন্যসুন্দর ; বরং নবীন সন্ন্যাসের জ্যোতিরাভা তাঁকে অপরূপ, প্রায় কল্পনার দেবতার মতো এক দুর্লভ মহিমামণ্ডিত করেছে ; সূর্যের মতো তেজঃপুঞ্জ অথচ চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ, মনোরম, দৃষ্টির আনন্দদায়ক ক'রে তুলেছে।

এই এতগুলি লোকের মধ্যেও ওঁর পুত্রের সমতুল্য কেউ নেই। তিনি একক, অসামান্য। মানবোত্তর দ্যুতিতে দীপ্যমান।

সন্ন্যাসীপুত্র উঠে এসে জননীর দুই পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল।

মা যেন এতক্ষণ তাঁকে স্পর্শ করতে সাহস করছিলেন না ; এবার বক্ষে বন্ধন ক'রে এতদিনের অদর্শন-যন্ত্রণার কিছুটা প্রশমন করলেন।

হতভাগিনী এবং গৌরবিনী-গৌরব এই বহুজনপূজ্য স্বামীর স্ত্রী হিসাবে পূজনীয়া বলে—বধূর প্রসঙ্গ কোন পক্ষই উত্থাপন করলেন না।

অতঃপর কদিন আচার্যগৃহেই অবস্থান ক'রে ইন্দ্রাণী দেবী নিজে রন্ধন ক'রে পুত্রকে ভিক্ষা দেওয়ালেন। পুত্রের প্রিয় সব ব্যঞ্জন পুনশ্চ তাঁর সম্মুখে পরিবেশন ক'রেই সুখ। ভিক্ষুকের মতো কদলীপত্র ও পত্রপুট ব্যবস্থা—তবু তো পুত্রকে খাওয়াতে পারছেন। নিশ্চয়ই বিশাইয়ের এই কয়দিন পর্যাপ্ত আহার হয় নি, হয়ত আহারই হয় নি বেশির ভাগ দিন। মার হস্তে প্রস্তুত খাদ্য ছাড়া যে বাছার মুখে কোন কিছু রোচে না।

তাই এ পরিবেশনে হাসি ও অশ্রুর আশ্চর্য সম্মিলন, তবে দুঃখের থেকে আনন্দই বেশি। আর আশঙ্কা। এ ভাগ্যও কি বেশী দিন থাকবে!

এধারে বিশ্বেশ্বরের এই নব বেশে পুনরাবির্ভাবের বৃত্তান্ত লোকমুখে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। দিকদিগন্তর থেকে জনসমাগম হয়। দিন দিন সে সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। ফলে আচার্যকে বহিরঙ্গনে বিরাট আটচালার মণ্ডপ প্রস্তুত করাতে হয়। তবে তাদের আতিথেয়তা নিয়ে আচার্যকে খুব একটা বিব্রত হ'তে হ'ল না। স্থানীয় অনুরাগী ও ভক্তের দলই এই জনসমুদ্রের সেবার ব্যবস্থা করতে

লাগলেন। প্রাচীন কালের নৃপতিদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের মতো প্রতিদিনই কিছু কর্মী অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত ক'রে যেতে লাগলেন।

সাধক, পণ্ডিত, সাধারণ মানুষ সে যজ্ঞে একাকার হয়ে এক বিরাট পরিবারের রূপ ধারণ করল।

কী বলবেন একে কবিরা ?

চাঁদের হাট ?

না নীহারিকা পুঞ্জের মধ্যে এক নবোদিত নক্ষত্রের উদয়-উৎসব ?···

দিবারাত্রি সংকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা—এবং প্রসাদ বিতরণ - এর মধ্য দিয়েই সময় কাটে কৃষ্ণপ্রাণের। প্রিয় বন্ধু ও ভক্তদের সঙ্গে আনন্দও লাভ করেন প্রচুর।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটা ক্লান্তিও বোধ করতে লাগলেন। ক্লান্তি, আর সেই সঙ্গে গ্লানিও একটা।

এ কি করছেন তিনি ? এই জন্যই কি মা ও স্ত্রীর বক্ষে মর্মান্তিক শেলাঘাত ক'রে সন্ন্যাস নিলেন তিনি !

এই অধিকতর কোলাহল ও সীমাহীন আলস্যের মধ্যে কেন্দ্রকারণ হয়ে অবস্থান করবেন বলে ?

এ যে তাঁর বিন্দুমাত্র কোন নিজস্ব সময় থাকছে না, থাকছে না এতটুকু নির্জনতা। ধ্যান ধারণা তো দূরের কথা—ইষ্টচিন্তা থেকেই যে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছেন !

গৃহেও তো এই ভাবেই ছিলেন। বরং তখন কিছুটা ধ্যান বা চিন্তার অবসর ছিল, ছিল কিছুক্ষণ আত্মস্থ হয়ে থাকার সুযোগ। কিছুটা বিশ্রামও পেতেন।

তবে আর এত কাণ্ডর কি প্রয়োজন ছিল ?

না, আর না।

অন্য কোথাও যেতে হবে। লোকালয়েই যদি থাকতে হয়—দূর কোন তীর্থে, যেখানে পরিচিতদের অনুগতদের প্রীতি ও শ্রদ্ধার আতিশয্য এমন নিয়ত তাঁকে কঠোর বন্ধনে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারবে না।···

সহসাই একদা তিনি নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন।

এবার ওঁরা অনুগ্রহ ক'রে বিদায় দিন। তিনি নির্জন বাসে তপস্যার প্রয়াস

পাবেন। সন্ন্যাসের কর্তব্যে বিস্তর ত্রুটি ঘটেছে, আর অপরাধ বাড়াবেন না।

এ সঙ্কল্পের কথা শুনে সকলেই যে উদ্বিগ্ন ব্যস্ত বা ব্যাকুল হয়ে উঠবেন সে তো জানা কথাই। অন্তরঙ্গদের তো কথাই নেই। তাঁরা যেন সবেমাত্র কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'তে আরম্ভ করেছিলেন—এ আনন্দ উৎসব, এ প্রিয় সঙ্গ চিরস্থায়ী না হোক, দীর্ঘস্থায়ী হবে, এখনই বিচ্ছেদের কথা চিন্তা ক'রে ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই—এমনি একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল তাঁদের। ফলে চারিদিক থেকে প্রতিবাদ, অনুনয়-বিনয়ের বন্যা এসে যেন কৃষ্ণপ্রাণকে অভিভূত বিচলিত করার উপক্রম হ'ল।

আচার্য শ্রীনিবাস প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় বন্ধুরা অবশ্য এ বৃথা বাক্যব্যয়ে গেলেন না। তাঁরা এতদিন এই তরুণ যুবকটিকে সম্যক চিনে নিয়েছিলেন। এ যেমন কুসুমাদপি কোমল, তেমনি বজ্রাদপি কঠোর হতেও জানেন।

তাঁরা প্রস্তাব করলেন, এ শহরের উপকণ্ঠে অপেক্ষাকৃত কোন নির্জন স্থানে গঙ্গাতীরে তাঁরা ওঁকে কুটির নির্মাণ ক'রে দিচ্ছেন। বিশেষ কোন কারণ ছাড়া তাঁরা সে কুটিরের সান্নিধ্যে কখনও যাবেন না, শুধু নিকটেই ভিন্ন কুটিরে কেউ একজন ক'রে সেবক থাকবে যে নীরবে ওঁর প্রয়োজনগুলি সাধন করবে। ভিক্ষা—উনি সম্মত হলে এঁরা প্রত্যহ এক নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে সে কুটিয়ার একস্থানে নীরবে রেখে চলে আসবেন, অন্যথায় সে চেষ্টাও করবেন না।

এমন কি তাঁরা ওঁর জননীকেও অনুরোধ করবেন—আর যেন তিনি ওঁকে দেখার জন্য ব্যাকুল না হন। নিকটে থাকলে নিত্য সংবাদ পেলে তিনিও সে অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা করবেন। পরন্তু, অন্য কোন তীর্থে বা সুদূর পর্বতে গেলে সংবাদ-সীমার বাইরে চলে যাবেন, সেক্ষেত্রেই মার পক্ষে উদ্বিগ্ন হয়ে সে স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করা স্বাভাবিক।

যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব। কৃষ্ণপ্রাণ এবার একটু বিব্রতই বোধ করলেন।

দিন দুয়েক চিন্তাও করলেন। অবশেষে বললেন, 'বেশ, আমি এ বিবেচনার ভার মার উপরই ন্যস্ত করলাম। এ দেহ তাঁরই দান, তিনি লালন পালন করেছেন, তিনিই মনুষ্যত্ব লাভে—বিদ্যায় শিক্ষায় প্রবুদ্ধ করেছেন। সাধনাই করি আর তপস্যাই করি—সিদ্ধিলাভ ঘটুক আর নাই ঘটুক—যতদিন এ দেহ থাকবে তাঁর ঋণ তো অস্বীকার করতে পারব না। এ বিষয়ে তিনি যা আদেশ করবেন আমি তা নির্বিচারে পালন করব।'

এ কথায় শুধু সাধারণ অনুরাগীবৃন্দ নন—অন্তরঙ্গ যাঁরা, ওঁর মনের পথ যাঁদের একেবারে অগম্য নয়, তাঁদের মনেও আশার সঞ্চার হ'ল।

মা নিশ্চয় একমাত্র পুত্রকে দূরে পাঠাতে চাইবেন না। আচার্যদেব প্রভৃতির প্রস্তাবই সমর্থন করবেন।

কিন্তু ইন্দ্রাণী দেবী সকলকে চমৎকৃত ও হতাশ ক'রে দিয়ে এক আশ্চর্য আদেশ করলেন।

মাতা যে একমাত্র সন্তানকে সন্ন্যাস গ্রহণে সম্মতি দিয়েছিলেন, তার কারণ পুত্রের মন তিনি জানতেন, নিজের সুখের অপেক্ষা, সংসারের অখণ্ডতা অপেক্ষা—পুত্রের সুখ তার সার্থকতার মূল্য তাঁর কাছে অনেক বেশী।

তিনি অনেকক্ষণ নীরব রইলেন। একবার পুত্রের মুখের দিকেও চাইলেন। সে মুখ নির্বিকার, প্রশান্ত। ওঁর চোখেও কোন অনুরোধ বা অনুনয় নেই, শান্ত সহজ ভাবেই জননীর অভিমতের অপেক্ষা করছেন যেন, যেন সম্পূর্ণ ভাবেই, 'কায়েন মনসা বাচা' আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁর কাছে—

তবু ইন্দ্রাণীর মনে হ'ল তিনি সে চোখে ঈষৎ বেদনা ও হতাশার ছায়া দেখতে পেলেন ক্ষণেকের জন্য। এ কি ব্যর্থতার বেদনা, এতকালের আশা ভঙ্গ হবার হতাশা?

তিনি মন স্থির ক'রে ফেললেন।

বললেন, 'ছেলে আমার নিকটে থাকে, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি থাকতে পারে। কিন্তু ছেলের মন আমি জানি। তার যদি তপস্যায় বিঘ্ন ঘটে তার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। ছেলেকে চোখের দেখার থেকে তার সাফল্য, তার পূর্ণতা, তার গৌরব—অনেক বেশী কাম্য।'

এই বলে একটুখানি থেমে পুনশ্চ বললেন, 'আপনারা তীর্থের কথা বলছিলেন, বেশ তো, নীলাচল ধাম, শ্রীক্ষেত্র প্রসিদ্ধ তীর্থ, চার ধামের এক ধাম। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, ভগবান ওখানে নিত্য আহার করেন, দারুভূতো মুরারি—ওখানে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ।* প্রধান তীর্থ অথচ নিকটে, এই জন্য এ দেশের বহু লোক প্রতি বৎসর বিভিন্ন পার্বণ উপলক্ষে ওদেশে যান, রথযাত্রা, ঝুলন, দোল—প্রায়

---

* একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে—ভগবান নিত্য প্রয়াগে স্নান করেন, পুষ্করে প্রভাত-সন্ধ্যা, বদরীনারায়ণে তপস্যা, দ্বারকায় কাছারী, নীলাচলে আহার, সেতুবন্ধে সায়ংসন্ধ্যা ও বৃন্দাবনে শয়ন করেন।

সারা বৎসরই যাতায়াত চলে। বিশাই যদি ওখানে থাকেন, তাহলে মধ্যে মধ্যে ওঁর সংবাদ পাওয়া শুধু সম্ভব নয়, সহজ হবে। লোকে চোখে দেখে এসে সংবাদ দিতে পারবে। আমার মনে হয় বিশাই যদি ওখানেই সাধনার আসন পাতেন তো আমি কিছুটা শান্তি পাই, আশ্বস্ত বোধ করতে পারি।'

কৃষ্ণপ্রাণ নীরবে সাশ্রু নয়নে উঠে এসে মায়ের দুই পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলেন।

ব্রহ্মস্বরূপ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমাদের অন্য আদেশ আশা করাই নির্বুদ্ধিতা হয়েছে। মা এরূপ না হলে এমন সন্তান হতে পারত না।'

॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণপ্রাণের ইচ্ছা সেই দিন তদ্দণ্ডেই নীলাচল যাত্রা করেন—কিন্তু ভক্তবৃন্দ কিছুতেই তা হ'তে দিলেন না। তাঁরা যুক্তি দেখালেন—অনেকেই তাঁকে দর্শনের জন্য দূর-দূরান্তর থেকে রওনা দিয়েছেন, এখনও অনেকে এসে পৌছতে পারেন নি। সুতরাং অন্তত আর দু-চারদিন তিনি এখানেই আসন রাখুন।

আরও একটি বিষয়েও তাঁর অভিপ্রায় মতো কাজ হ'ল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি একা নিঃসঙ্গ যাত্রা করবেন, দীনহীনের মতো কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে একা গিয়ে শ্রীমন্দিরে পৌছবেন, কিন্তু ভক্তরা বললেন, 'তা হ'তে পারবে না। আপনার কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না পথ চলতে গেলে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্ঞানও থাকে না—এ অবস্থায় পথেই কোথাও দেহরক্ষা করবেন হয়ত, কেউ জানতেও পারবে না। ওঁরা কেউ কেউ সঙ্গে যাবেনই।'

কৃষ্ণপ্রাণ জিদ করতে তাঁরা স্পষ্টই উত্তর দিলেন, 'সুলতানের রাজত্ব এটা, পথ সরকারের, সে পথ দিয়ে আমরা গেলে তুমি বাধা দেবার কে? আমাদের তে তুমি বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছ না। আর আমরা তোমার ভিক্ষালব্ধ অন্নেও ভাগ বসাচ্ছি না। ··আমরাও ভিক্ষা করতে জানি।'

অগত্যা একটা আপস ব্যবস্থা করতেই হ'ল। স্থির হ'ল যে, ওঁর যে পাঁচজন বন্ধু ব্রহ্মচর্যের ব্রত নিয়েছেন, কোন দিন বিবাহাদি করবেন না বা সংসারে লিপ্ত হবেন না, তাঁরাই ওঁর সাথী হবেন। আর একটি লোক ওঁর সেবকের পদ দাবী করল, সে ভয় দেখাল যে বাধা দিলে সে ওঁর সামনেই গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে।

অগত্যা অসহায় কৃষ্ণপ্রাণকে সম্মতি দিতে হ'ল।

শ্রীনিবাসের অন্য একটি গোপন অভিপ্রায় ছিল, তিনি বললেন, 'বহু লোক সংবাদ মাত্র পেয়ে দূরদূরান্তর থেকে এসে তোমাকে দর্শন করে গেল, তোমার উপদেশ, তোমার নামগান শুনে গেল—একটি সর্বরিক্তা বালিকাকে কেন বঞ্চিত করছ! বধূমাতা যদি অবগুণ্ঠিতা হয়ে এসে দূরে বসে থাকেন—তাতে দোষ কি?'

কৃষ্ণপ্রাণ শ্রীনিবাসের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, 'সে বালিকা এই বয়সেই বিনা দোষে বহু দুঃখ পেল, আমার জন্য সে যে ত্যাগ করেছে, করল—তার বোধ করি তুলনা নেই - তদুপরি এখন এই ভাবে অপরাধিনীর মতো এসে দেখে যেতে বললে তাকে অপমান করা হবে না কি? আর, তাতে কি ফললাভ হবে বলতে পারেন? এ তাকে অধিকতর কষ্ট দেওয়া নয় কি? তাছাড়া, এ কদিনে সে প্রাথমিক প্রচণ্ড দুঃখটা একটু সম্বরণ করতে পেরেছে হয়ত—এ ভাবে পুনশ্চ চোখে দেখলে, বিশেষ এই বেশে—সে যন্ত্রণা বহুগুণ বর্ধিত হবে। মা আমার শ্রুতিগোচর ভাবেই অপরকে বলেছেন, সে এখন তপস্বিনীর জীবনযাপন করছে, সাংসারিক সকল দায়িত্ব পালন ক'রে অবশিষ্ট সমস্ত সময় ইষ্টনামজপে অতিবাহিত করে। মাত্র একপ্রহরকাল বিশ্রাম আর দিনান্তে একমুষ্টি মাত্র প্রসাদ এই গ্রহণ করে। কারও সম্মুখে কোন কারণেই অবগুণ্ঠন মোচন করে না। সে দিক দিয়ে সে আমার থেকে এ পথে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছে, বস্তুত সে আমার নমস্যা।...মিথ্যা তাকে পূর্ব সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে নূতন ভাবে তীব্র যন্ত্রণাভোগের কারণ হওয়া কি ভাল হবে? তদ্ব্যতীত পূর্ব দেহের সম্পর্কে সে আমার অর্ধাঙ্গিনী, সব থেকে বেশী আপন—তাকে দূর থেকে একবার দেখে চলে যেতে বলবেন, একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারবে না—এর থেকে তার অবমাননা আর কি হ'তে পারে? না, সে চেষ্টা করবেন না। আমার নবগৃহীত সন্ন্যাস অনেক ভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে বা হচ্ছে—আর আমার মনে ধিক্কার-বোধ জন্মাবেন না।'

ইন্দ্রাণী দেবী পুত্রের যাত্রার পূর্বদিনই গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাঁর শিবিকা আরোহণের সময় কৃষ্ণপ্রাণ উপস্থিতও ছিলেন। প্রণামও করেছেন—সে মর্মান্তিক যন্ত্রণা প্রাণপণে সহ্য ক'রে অমানুষিক মনোবলে সাগরপ্রমাণ অশ্রুর

নির্গমন পথ কপাটরুদ্ধ ক'রে শুষ্ক চক্ষুতেই শিবিকায় উঠেছেন, পাছে পুত্রের যাত্রাপথে অকল্যাণের ছায়া পড়ে। সে যে আর কোন দিন আসবে, আবার দেখতে পাবেন—এ সম্ভাবনা যে নেই ইন্দ্রাণী তা ভালই জানতেন, সেজন্য প্রস্তুতই ছিলেন, তথাপি মার প্রাণ যে কোন যুক্তি সম্ভাব্যতাই হিসেব করে চলে না, তাই দৃষ্টিপথের সীমা অতিক্রম করা মাত্র তিনি শিবিকাতেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।…

আর কে জানে কেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আচার্য-গৃহসংলগ্ন তাঁর আশ্রমদ্বারের সম্মুখে এসে নবীন সন্ন্যাসীও একবার থেমে গেলেন, বোধ হ'ল তাঁর দুই চক্ষু বাষ্পার্দ্র হয়ে এল।

অবশ্য সে অত্যল্প কালের জন্যই, আবার সচকিত হয়ে উঠে একবার শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'হে প্রভু, তোমার পরীক্ষার কি শেষ হবে না?'…

ইন্দ্রাণী দেবী কিছু পরেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন, এবং বধূর কথা চিন্তা ক'রে প্রাণপণে অশ্রুচিহ্ন বিলুপ্ত করার চেষ্টা করতে করতেই শিবিকা থেকে অবতরণ করলেন—কিন্তু ধৈর্যের মূর্তিমতী প্রতিমা তাঁর বধূর দৃষ্টিতে সে চিহ্ন গোপন রইল না।

তিনি নিঃশব্দে কাছে এসে 'মা' বলে একবার মাত্র ডেকে উঠেই—সে অতি-মৃদু কণ্ঠের সম্বোধনও যেন ইন্দ্রাণীর কর্ণে সহস্র আর্তনাদের মতো আঘাত করল—এত দিন পরে শ্বশ্রূর বুকে মাথা রেখে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠলেন।

মা ছিলেন এ ক'দিন পুত্রের নিকটে, তাতেই বুঝি তবু স্বামীর সঙ্গে একটা যোগাযোগ ছিল ওঁর। স্বামী এখানেই আছেন, অতি নিকটে, এই আশ্বাসটা ছিল; এবার সে সামান্য বা কল্পিত যোগসূত্রটুকুও ছিন্ন হল, সম্ভবত চিরদিনের জন্যই – সেটা মাধবীরও বুঝতে অসুবিধা হয় নি।

হয়ত কোন কালে, কোন সুদূর ভবিষ্যতে, ইন্দ্রাণী দেবী নীলাচলে গিয়েও দেখে আসতে পারবেন মাধবীর ইষ্টকে, কিন্তু ওঁর যে সে অধিকারটুকুও নেই!…

কে জানে এই বুকফাটা হাহাকার, তীব্র হতাশার এই বেদনা-প্রকাশ সেই প্রায়-সর্বজ্ঞ সংসারত্যাগীর মনে বেজেছিল কিনা, নামসংকীর্তনের মধ্যে বারেক অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন কিনা—এক লহমার জন্য যতিভঙ্গ ঘটেছিল কিনা!

তার কোন ইতিহাস কোথাও লেখা নেই।

যদি বা তেমন অনিয়ম ঘটে থাকেও—পরদিন প্রভাতে পূর্বজন্মের এ সম্পর্ক

সম্বন্ধে কোন অনুভূতি বা স্মৃতিচিহ্ন প্রকাশ পেল না, ভাবান্তর তো নয়ই।

কৃষ্ণপ্রাণ—যেন মুক্তি পাবার মতো আনন্দেই জন্মভূমি ত্যাগ করে যাত্রা আরম্ভ করলেন। ছটি সঙ্গীর সঙ্গে দ্রুত চলতে লাগলেন সাগর সঙ্গমের দিকে।

পথ চেনেন না, সঙ্গীরাও কেউ চেনে না—সুতরাং এই ভাবে গঙ্গার তীর ধরে চলে সমুদ্রে পড়াই নিরাপদ।

তবে তার পর কি হবে, কোথা দিয়ে কি ভাবে যাবেন তা কেউ জানতেন না।

লোকমুখে অনেক বিপদের কথা শোনা যায়। অনেক নির্যাতন, যন্ত্রণা-দায়ক মৃত্যুর কথাও।

বঙ্গের সুলতানদের সঙ্গে উড়িষ্যার নৃপতিদের দীর্ঘদিনের বিরোধ। সুলতানরা চান উড়িষ্যাকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে—কিন্তু উড়িষ্যারাজের বিক্রমে ও শৌর্যে তা সম্ভব হয় না। তাই দুই দেশের সীমান্তরক্ষীরা তীর্থযাত্রীদের কি সাধারণ পথিকদের উপর নির্যাতন ক'রেই সে গাত্রদাহ নিবারণের চেষ্টা করে। অবশ্য সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ সুবিধাও লাভ হয়।

এ সব কথাই এই অভিনব তীর্থযাত্রা-পথিকদের শোনা ছিল। পরন্তু, পথে যত অগ্রসর হতে থাকেন বহু লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে, অগ্রসর হয়ে এসে অধিক সংখ্যক এই ভয়াবহ কাহিনী শোনান ওঁদের—হয়ত বা কিছু পল্লবিত অতিরঞ্জিত ক'রেই। হয়ত কিছু সম্পূর্ণ অলীকই, বক্তার স্বকপোল-কল্পিত।

সঙ্গীদের যে মধ্যে মধ্যে কণ্ঠ তালু শুষ্ক হয়ে না উঠছিল এমন নয়, রাত্রে, পথ-শ্রম সত্ত্বেও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটছিল—কিন্তু কৃষ্ণপ্রাণ নির্বিকার, তিনি মনের আনন্দে হরিনাম কীর্তন করতে করতে পথ চলছেন। যেদিন যেখানে যা ভিক্ষা জোটে তাই আহার করেন, দেবালয়ে সাধুদের আশ্রমে অথবা গঙ্গাতীরে বৃক্ষতলে নিশিযাপন করেন। তাঁর ব্যাকুলতা দুশ্চিন্তা শুধু সেই দারুভূতো মুরারিকে দর্শনের জন্য—মনে হয় পাখা মেলে উড়ে যেতে পারলে ভাল হ'ত।

মধ্যে মধ্যে যখন বোঝেন সঙ্গীরা বিচলিত হয়ে পড়ছে, তখন বলেন, 'সন্ন্যাসীকে যেমন ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে নেই, তেমনি তীর্থযাত্রাপথে বেরিয়ে ঈশ্বরদর্শনাভিলাষীদেরও পথের বিপদের কথা চিন্তা করতে নেই। যাঁকে পরমব্রহ্মজ্ঞানে দর্শন করতে চলেছ, তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারছ না। তিনি যদি কষ্ট দিতে চান তো দেবেন—সেই তো পরীক্ষা। তবে যদি কারও

প্রাণের বা নির্যাতনের আশঙ্কা দর্শনাকাঙ্ক্ষার থেকে প্রবল বোধ হয়- সে স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারো—আমি একাই বেশ যাবো, সে বরং আরও শ্রেয়, আহার ও বিশ্রামের জন্য অকারণ সময় নষ্ট হবে না।'

এর পর কে আর যাত্রাপথের বিবিধ বিপদের কথা মুখে উচ্চারণ করবে?

কিন্তু সমুদ্র সঙ্গমে 'ছত্রভোগে'* পৌঁছে উপলব্ধি হ'ল "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" এ আশ্বাস কথার কথা নয়।

ভক্তের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ভগবানই ক'রে রেখেছেন।

স্থানীয় জমিদার পূর্বেই লোকমুখে এই এক অসাধারণ নবীন সন্ন্যাসীর তীব্র বৈরাগ্য ও ঈশ্বরদর্শনের আকুলতার কথা শুনেছিলেন। তিনি ওঁদের পৌছবার জন্য অপেক্ষা না ক'রে নিজেই সেবক ও অনুরাগীবৃন্দ নিয়ে অগ্রসর হয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। ভিক্ষা ও বিশ্রামের আয়োজন পূর্বাহ্ণেই করা ছিল—সেজন্য নূতন পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়েছিলেন, স্থানীয় তীর্থস্নান ও দর্শনাদির ব্যবস্থারও কোন ত্রুটি ঘটল না।

সে পর্ব সমাধা হ'লে বিশাল এক নৌকাযোগে রক্ষী ইত্যাদি দিয়ে জলপথেই উড়িষ্যার দিকে রওনা ক'রে দিলেন। তাঁরা ওঁকে উড়িষ্যার বেশ কিছুটা অভ্যন্তর দেশ—বিরজা ক্ষেত্র পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল।

এর পর আর দুশ্চিন্তার কি থাকবে!

পথে অসংখ্য বিখ্যাত তীর্থ পড়ে, বহু দেবস্থানও। সে সব তীর্থে স্নান ও দেবদর্শন করতে করতে যাত্রীর দল দ্রুতপদে নিজেদের পরম লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে লাগলেন।

অবশেষে একসময় সে লক্ষ্যও নিকটে এল বৈকি।

নীলাচলে পৌঁছলেন কৃষ্ণপ্রাণ।

অনেক আশা অনেক আশঙ্কা।

আশার অপেক্ষা কি আশঙ্কা বেশী?

* বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর-মজিলপুরের নিকটবর্তী, পূর্বে এখানেই সমুদ্র ছিল। মহাপ্রভু এখানের অম্বুলিঙ্গ শিব পূজা করেছিলেন।

তা হয়ত নয়—তবু আশা করতেও যেন সাহস হয় না।

কমলপুর গ্রাম থেকেই শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দৃষ্টিগোচর হ'ল।

সন্ন্যাসী যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলেন এবারে।

সকলকে পিছনে ফেলে সেখান থেকে প্রায় দৌড়তে আরম্ভ করলেন। কোন দিকে লক্ষ্য নেই, কারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। নগ্ন পদ কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, পাথরে আঘাত লাগছে—সে অনুভূতিও নেই। পথের লোকেরা যে অবাক হয়ে চেয়ে আছে তা বুঝতেও পারছেন না।

তবে প্রারম্ভেই একটা শুভ সূচনা দেখা গেল।

মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করার পর ধাঁধা লাগার কথা।

অত বড় মন্দির, তার কোথায় গর্ভ-দেউল, কোন্‌টা নাটমন্দির—কোন দিক দিয়ে সে মূলমন্দিরে প্রবেশ করার পথ, কিছুই জানেন না কৃষ্ণপ্রাণ। সিংহদ্বারের সোজাসুজি মন্দির প্রবেশের পথ নয়, সেখানে ভোগমণ্ডপ।

এ সব কিছুই জানা নেই—কিন্তু কাউকে প্রশ্নও করলেন না। পা যেন আপনিই সেই পথ ধরল, যেন মনে হ'ল ওঁর আকুল আকাঙ্ক্ষার ধন, সেই পরম প্রিয় নিজেই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন—অদৃশ্য থেকেও, অন্তরের আকর্ষণে।

তেমনি উন্মত্তের মতো ছুটতে ছুটতে এসে গর্ভগৃহে প্রবেশ করলেন বটে—কিন্তু প্রথমেই একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল তাঁর।

এ কী বীভৎস মূর্তি!

ওঁর ধ্যানের, ওঁর স্বপ্নের সে প্রেমময় মূর্তি কোথায়?

কোথায় সেই নবীননীরদশ্যামকান্তি, গুঞ্জামালাধারী পীতবাস-পরিহিত সুন্দর মূর্তি!

এ তো তারামূর্তি! পাশে শুভ্র-কান্তি দেবাদিদেব। শক্তি ও শিব।

হ্যাঁ, সবই এক।

তা শুনেছেন বহুবার। বহু পণ্ডিত ও সাধকের কাছে।

সেই পরম ব্রহ্মেরই ইচ্ছা অনুসারে তাঁর বিবিধ বিচিত্র রূপে প্রকাশ, পুরুষ ও প্রকৃতি অভিন্ন—এক অবর্ণনীয়, অকল্পনীয় ধারণাতীত মহাশক্তি তিনি—পুরুষ ও প্রকৃতি দুই-ই তাঁর অস্তিত্বের স্বরূপ—এ তো অতি পুরাতন কথা। শুনেছেন, নিজেও বলেছেন কত লোকের কাছে।

তবু নিজের আশাকল্পনার ধনকে, সেই কল্পনায় আঁকা রূপেই যে দেখতে

চায় মানুষ।

হে ঈশ্বর, এ কী রূপে দেখা দিলে তুমি!…

প্রথম দেখার পরই চোখ বুজেছিলেন কৃষ্ণপ্রাণ।

পথের এত ক্লেশ, এতটা দীর্ঘ পথ বিনা বিশ্রামে ছুটে এসেও—কিছুমাত্র অনুভব করেন নি—কিন্তু ক্লান্তি দেহের জন্য এই যৌবনকালে তত বোধ হয় না, যতটা বোধ হয় মনের কারণে। হতাশা ক্লান্তির সহচর। অবসন্ন পদযুগল যেন ভেঙে আসছে এবার, মাথাও আর স্থির থাকছে না, মদ্যপের মতো অবস্থা যেন তাঁর।

এই মন্দিরেই সংজ্ঞা হারাবেন নাকি?…

আবারও বুঝি ভগবানই ভক্তকে রক্ষা করলেন।

মন্দিরের এক রক্ষী তাঁকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে উঠল, 'এ লোকটা কে রে, পাগল নাকি! এখানে মণিকোঠায় দর্শন করতে এসে চোখ বুজে আছে।…না মাতাল, পাও টলছে যে!…যা যা, দূর হ!'

তাতেই যেন সম্বিৎ ফিরল। চোখও খুলতে হ'ল।

আর. মুখ তো ঊর্ধ্বোত্থিত—বিশাল দারুমূর্তির দিকেই নিবদ্ধ ছিল—চোখ মেলতেই এক যেন অলৌকিক ঘটনা চোখে পড়ল।

এ কি দেখলেন?

সত্যিই দেখছেন তো? না কি উত্তপ্ত মস্তিষ্ক আশাভঙ্গের আঘাতে সবটাই কল্পনা করছে।

কোথায় সে ভয়াবহ মূর্তি!

মরি মরি, এই তো সেই পীতবাস, গুঞ্জামালা পরিহিত শ্যামলসুন্দর মূর্তি। এই তো তাঁর ধ্যানের ইষ্ট।

আর সে মূর্তি যেন তাঁর দিকেই করুণাপ্রসন্ন নেত্রে চেয়ে আছে, মুখে ঈষৎ কৌতুকের হাসি। হস্তে অভয়মুদ্রা।

ব্যর্থতার আঘাতে যা হয় নি—সার্থকতার আকস্মিক তীব্র আনন্দে তাই হ'ল। গর্ভদেউলের বহু ভক্তপদধূলিধন্য সেই পাষাণকুট্টিমে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

রাজার সভাপণ্ডিত সর্বেশ্বর আচার্য প্রত্যহই দর্শন করতে আসেন, তবে কিছু বিলম্ব হয়। নিজ গৃহের পূজাপাঠহোম ইত্যাদি না সেরে মন্দিরে আসা বিধেয় নয়। কারণ মন্দিরে সমাগত পুণ্যার্থীদের ভিতর অনেকে তাঁর পরিচয় অবগত আছেন, তাঁরা ওঁকে দেখা মাত্র প্রণামে আর প্রশ্নে ঘিরে ধরেন। তাঁদের সে সব প্রশ্নের প্রয়োজনও থাকে, কেউ বা শুধুই আলাপের জন্য অকারণ অপ্রয়োজন বক্তব্য উপস্থাপিত করেন।

অবশ্য কোন কোন ছাত্রশ্রেণীর লোকের কিছু সংশয় থাকে, তারাও অন্যত্র ওঁর নাগাল পায় না, এই মন্দির আগমনের সময়টুকুরই অপেক্ষা করে। কেউ বা দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা নিয়ে অপেক্ষা করে—শাস্ত্রীয় বিধানের জন্য। অতবড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—তাঁকে তো এসব বিড়ম্বনা ভোগ করতেই হবে!

এই সব কারণেই বহু সময় অতিবাহিত হয়। ততক্ষণে রাজসভায় উপস্থিত হওয়ার সময় এসে পড়ে। সেখানে যে প্রাত্যহিক কোন কর্ম বা দায়িত্ব থাকে তা নয়—তেমন কোন প্রয়োজন বোধ করলে মহারাজ রাষ্ট্রীয় শিবিকা প্রেরণ করেন, অষ্ট বাহকের—যাতে দ্রুত আসা যায়। তৎসত্ত্বেও বহুক্ষণ অধীর প্রতীক্ষায় থাকতে হয় তাঁকে, সেটাও অনভিপ্রেত। কখনও কখনও কোন কর্মে ব্যস্ত থাকলে শিবিকা পৌঁছানো মাত্র ওঠা যায় না, উপস্থিত কর্মের জট শিথিল ক'রে আসতে কিছু বিলম্ব ঘটে যায়—সেক্ষেত্রে রাজার ললাটে ভ্রূকুটি ঘনীভূত হ'তে দেখেছেন সর্বেশ্বর কয়েকবারই। রাজা ব্যস্ত শাসক, এবং শুধু তো শাসনকর্মই নয়—চারিদিকে প্রবল শত্রু, নিজশক্তিকে সদাসক্ষম রাখার উদ্বেগ বা কার্যও বড় অল্প নয়—তাঁকে সর্বদা এক পা অশ্বের পাদানিতে রেখেই থাকতে হয় বলতে গেলে—সুতরাং সামান্য কাল প্রতীক্ষা করতে হ'লেও বিরক্তি উপজিত হওয়া স্বাভাবিক।

আর।- এমনই দৈবের বিরূপতা—যেদিন আচার্য অনুপস্থিত থাকেন বা সভাগমনে বিলম্ব ঘটে—সেইদিনই যেন রাজ্যের প্রয়োজন এসে ভিড় করে রাজসভায়। ধনী ব্যক্তি, ভূম্যধিকারী কি নৃপতিগণ সহজেই অসহিষ্ণু; অসহিষ্ণুতা ক্রোধের জনক। সুতরাং অপ্রীতিকর বা আশঙ্কাজনক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক থাকাই শ্রেয়। বিশেষ ওঁর মতো পণ্ডিতের পক্ষে বিন্দুমাত্র তাচ্ছিল্য এমন কি অনাদরও

মৃত্যুতুল্য।

এই সব বিবেচনাতেই তিনি প্রত্যুষে মঙ্গলারতির সময় মন্দিরে আসার চেষ্টা করেন না। গৃহপূজাদি সেরে কিঞ্চিৎ জলযোগ ক'রে—একেবারে রাজসভার জন্য প্রস্তুত হয়েই মন্দির যাত্রা করেন। যাতে তৃতীয় প্রহরের পূর্বে ফিরে আসার প্রয়োজন না হয়। শ্রীক্ষেত্রে ভগবান অপেক্ষাও বুঝি তাঁর প্রসাদ বড়—সুতরাং উদর শান্ত ক'রে মন্দিরে আসাতে কোন দোষ ঘটে না।...

সেদিনও; তিনি যখন মন্দিরে এলেন বেলা প্রথম প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। অন্য দিন এসময় গর্ভদেউলের ভিড় কমে যায়, শান্তিতে দর্শন করতে পারেন।

আজ দেখলেন সেখানে প্রচণ্ড ভিড় এবং প্রচণ্ডতর কোলাহল।

'ব্যাপার কি?' এক পূজারীকে প্রশ্ন করলেন, 'কি হয়েছে এখানে?'

দশ-বারোটি কণ্ঠে উত্তর সরবরাহ হওয়ায় কোন উত্তরই সম্যক শ্রুতিগোচর হ'ল না। অগত্যা সর্বেশ্বর ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন। পূজারী-পাণ্ডারা সকলেই তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করেন—তাঁরাই ভিড় কমিয়ে, নিজেরা যথাসম্ভব সরে গিয়ে ওঁকে পথ করে দিলেন।

প্রথমটা সর্বেশ্বর চিনতে পারেন নি।

তিনিও নবদ্বীপেরই লোক, সেখানেই তাঁর শিক্ষা, শিক্ষকতারও আরম্ভ। সে পারঙ্গমতার খ্যাতি দেশের সীমা অতিক্রম ক'রে ওদিকে কামরূপ এদিকে উড়িষ্যা পর্যন্ত পৌছেছিল বলেই রাজা বহুমানে তাঁকে এখানে আনিয়েছেন। সুতরাং বিশেশ্বর তাঁর আদৌ অপরিচিত নন। এমন কি বিশেশ্বর যে সন্ন্যাস নেওয়ার পথেই অগ্রসর হচ্ছেন, গৃহে থাকলেও গৃহ সম্বন্ধে নিরাসক্ত উদাসীন—এ সংবাদও তাঁর কর্ণে এসে পৌছেছিল।

তত্রাচ এই গৈরিকধারী মুণ্ডিত মস্তক, কৃশকায়—পথশ্রমে রৌদ্রতাপে মলিন ও ক্লান্ত আনন—এর মধ্যে সে কন্দর্পকান্তি বলিষ্ঠ বিশাইকে আবিষ্কার করা সম্ভব হ'ত না—যদি না সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণপ্রাণ চক্ষু উন্মীলিত করতেন।

কৃষ্ণপ্রাণের দৃষ্টিতে তখনও বিহ্বলতা, তথাপি সর্বেশ্বরের এই আয়ত ভাবগভীর নেত্র স্মরণ করতে অসুবিধা হ'ল না। এবং পলকপাত কাল মধ্যে কার্যকারণও অনুমান করে নিলেন।

'আরে—সরো সরো। আমি এঁকে বিলক্ষণ জানি। ইনি মহাপণ্ডিত ও

মহাতপস্বী। তোমরা ক'জন এঁকে ধরাধরি ক'রে বাইরে মুক্ত স্থানে নিয়ে এসো। বরং একটা শিবিকার ব্যবস্থা করো—আমি এঁকে স্বগৃহে নিয়ে যাবো। চালি প্রস্তুতে বিলম্ব হয় বস্ত্রাদি দিয়ে একটা ঝোলার মতো করো—এঁকে বহন ক'রে আমার গৃহে নিয়ে চলো।'

তখনকার মতো হাতে হাতেই বহন ক'রে জগমোহনে আনা হ'ল। ততক্ষণে কৃষ্ণপ্রাণও চারিদিকের পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। কি ঘটেছিল তারও একটা অস্পষ্ট আভাস তাঁর স্মৃতিপটে আসছে। তিনি ব্যস্ত হয়ে নিজেই ওঠার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। তীব্র আশা ও আকাঙ্ক্ষায়, কেবল মাত্র মনের জোরেই এই পথটা এসেছেন—সে বহু আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবার পর আর বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই।

সর্বেশ্বরও তাঁকে প্রচণ্ড তিরস্কার ক'রে উঠলেন—এ বাতুলতা প্রদর্শনের মতো তাঁর দেহের অবস্থা নয়, সে বিষয়ে সচেতন ক'রে দিয়ে।

কৃষ্ণপ্রাণেরও আর বাধা দেওয়ার কি প্রতিবাদ করার শক্তি নেই। তিনি সে চেষ্টাও করলেন না। সুগভীর শ্রান্তিতে চক্ষু নিমীলিত করলেন আবার।

নিজ গৃহে এনে সর্বেশ্বর সন্ন্যাসীর মুখে মাথায় জল দিয়ে, পা দুটি প্রক্ষালিত ক'রে দিয়ে কিছুটা সুস্থ করলেন। অতঃপর নারায়ণের স্নানজল ও জগন্নাথের চরণতুলসী মুখে দিলেন, সেই সঙ্গে প্রভুর অঙ্গচন্দনও। তারপর কিঞ্চিৎ পক্কান্ন প্রসাদও খাওয়ালেন এক প্রকার বলপূর্বকই। স্নান ও মন্দিরের অন্য দর্শনাদি না ক'রে কিছু আহার করা বিধেয় হবে কিনা—সসঙ্কোচে এই প্রশ্ন তুলতে সর্বেশ্বর বুঝিয়ে দিলেন, এই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে ক্ষেত্র-দেবতার থেকেও দেবতার প্রসাদ অধিক সম্মানার্হ। কথিত আছে ব্রহ্মা স্বয়ং কুকুরের মুখত্যক্ত মহাপ্রসাদ পাছে পদদলিত হয় এই আশঙ্কায় তুলে নিয়ে স্বীয় মস্তকে ধারণ করেছিলেন।...

কৃষ্ণপ্রাণও আর দ্বিধা রাখেন নি। আবেগ-কণ্টকিত দেহে সে প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে ওঁর সঙ্গীরাও মন্দিরে পৌঁছে গেছেন।

সেখানেও প্রাণপ্রিয় সন্ন্যাসীকে দেখতে না পেয়ে তাঁদের বোধ করি জগন্নাথ-দর্শনও হ'ল না, ওঁরা ব্যাকুল হয়ে নানা লোককে প্রশ্ন করতে লাগলেন। শেষে এক তরুণ সন্ন্যাসীর মূর্ছিত হয়ে পড়ার সংবাদটা পেতে এবং সে সন্ন্যাসীকে

রাজার সভাপণ্ডিত সযত্নে তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে গেছেন জেনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন।

পরে সর্বেশ্বরের গৃহে পৌঁছে, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বহু পরিচিত মুখের সাক্ষাৎ পেয়ে আরও আশ্বস্ত এবং আনন্দিত বোধ করলেন। প্রবাসে স্বদেশ-বাসীকে দেখলেই প্রীতির সঞ্চার হয়। স্বদেশে যারা বিরূপ থাকে প্রবাসে তারাও সাগ্রহে স্বেচ্ছায় সৌহার্দ্যের হস্ত প্রসারিত করে।

একটু বিশ্রাম ক'রে পথের শ্রান্তি ও উদ্বেগের অবসন্নতা অপনোদিত হ'লে এঁরা স্নান দর্শনের জন্য ব্যস্ত হলেন। কিন্তু সে ব্যবস্থাও সর্বেশ্বর এর মধ্যেই ক'রে রেখেছেন। তিনি নিজের শ্যালককে সঙ্গে দিলেন, যাতে সমুদ্রে স্নান বা মন্দিরের প্রধান দর্শনগুলির কোন অসুবিধা না ঘটে।

দ্বিপ্রহরে নিজগৃহেই সকলের প্রসাদ-লাভের ব্যবস্থা করা ছিল, উৎকৃষ্ট প্রসাদে ভূরিভোজন করালেন দীর্ঘ পথশ্রান্ত, উপবাস ও আশঙ্কা-ত্রস্ত তীর্থ-যাত্রীদের।

সন্ধ্যায় কৃষ্ণপ্রাণের নির্জনবাস করার ইচ্ছা জেনে সর্বেশ্বর এক আত্মীয়ের বিস্তীর্ণ উদ্যানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বাসের জন্য ঠিক ক'রে নিজে গিয়ে সসম্মানে সেখানে রেখে এলেন। একজন সেবক শুধু সেখানে রইল, বাকী সঙ্গীদের অন্যত্র বাসা দিলেন। তবে তাঁরাও যাতে কাছাকাছি থাকতে পারেন সে দিকে লক্ষ্য রেখেই বাসস্থান ঠিক করা হ'ল।

সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ক'রে খাওয়াই বিধি। কখনও কখনও আমন্ত্রণ জানিয়েও সে ভিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু সর্বেশ্বরের মুখে এই আশ্চর্য সন্ন্যাসীর পরিচয় পেয়ে, ওঁর ভক্তিতদ্গত ভাব ও বিনম্র ব্যবহারে মুগ্ধ নীলাচলের প্রধান নাগরিকরা ও পূজারীরা ওঁদের ভিক্ষা দেবার জন্য যেন ব্যাকুল ও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বলা যায় ভিক্ষা যেন এসে সকরুণ মিনতির জন্য সম্মতি ভিক্ষা করতে লাগল।

অর্থাৎ বাস ও আহার কিছুরই অভাব রইল না।

কৃষ্ণপ্রাণ এতদিনে উপযুক্ত আশ্রয় ও সাধনার নিশ্চিন্ত অবসরের আনন্দ পেলেন। নিভৃতে দীর্ঘকাল ধরে নামজপ, সমুদ্রস্নান এবং সাধ পূর্ণ করে দারুব্রহ্ম দর্শন—এ যেন এক অভিনব স্বাদের জীবন, অভূতপূর্ব আনন্দ উপভোগ।

সর্বেশ্বরের পরামর্শক্রমে তো প্রায় প্রত্যহই তিনি জগমোহনের সর্ব শেষ প্রান্ত থেকে দর্শন করেন। সর্বেশ্বর বলেছেন গর্ভগৃহে দর্শন করলে যাত্রীদের ধাক্কাধাক্কি পাণ্ডাদের প্রাপ্য আদায়ের কচকচি নিরন্তর ঐকান্তিকতায় ব্যাঘাত

ঘটাবে। তদ্ব্যতীত পূজারীরা গর্ভগৃহে বেশীক্ষণ একই ব্যক্তিকে দাঁড়াতে দেবেও না।

আরও একটি কারণ, দূর থেকেই বিগ্রহকে ভাল দেখাবে। দারু-নির্মিত বিগ্রহ, কারিগররাও তেমন দক্ষ নন—অভ্যাস থাকে না বলেই দক্ষতা আয়ত্ত করার অবসর মেলে না। কারণ দ্বাদশ এমন কি কখনও কখনও আরও দীর্ঘকাল অন্তর এই নব কলেবর নির্মিত হয় (আষাঢ় মাসে মলমাস না এলে নব-কলেবর নির্মাণের সময় পাওয়া যায় না), সুতরাং অপটু হস্তের রূঢ়তা বা অমার্জনা থাকেই কিছুটা—দূরে গেলে এত তথ্য দৃষ্টিগোচর হয় না, বিগ্রহের সামগ্রিক চিত্রটাই শুধু চোখে পড়ে। এই মূর্তির মধ্যে স্বীয় ইষ্টকে দর্শনের জন্যও কিছুটা মায়ালোক সৃষ্টির প্রয়োজন। দূরত্বই সে মায়ালোক সৃষ্টির সহায় হয়। গবাক্ষ-হীন অন্ধকার গর্ভগৃহের মধ্যে দুটি কম্পমান ঘৃতপ্রদীপের আলোকে মনে হয় দেবতা জীবন্ত হয়ে উঠেছেন।

সর্বেশ্বরের এই উপদেশমতো দূর থেকে প্রায় নিষ্পলক নেত্রে বিগ্রহের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সে উপদেশ সত্য হয়ে উঠতে দেখতেন কৃষ্ণপ্রাণ। আপাত-দৃষ্টিতে যা শিবশক্তির মূর্তি মনে হয়—তাও কোন ধ্যানসম্মত মূর্তি নয় —কিছুক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তা নয়নমনোহর তাঁর প্রিয়তম কৃষ্ণমূর্তিরূপে প্রতীয়মান হয়।

সে সময় দেখে যেন আশ মেটে না - স্বপ্নাবিষ্ট, প্রস্তরমূর্তিবৎ নিথর হয়ে দেখেন। এই মন্দির, চারিদিকের ভক্ত বা দর্শকমণ্ডলী, এ পরিবেশ - কোন কিছু সম্বন্ধেই যেন তাঁর চেতনা থাকে না। এক এক সময় সত্যই তাঁর ভাব-সমাধি ঘটে, চক্ষু স্থিরনিবদ্ধ, নিস্পন্দ হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গীরা কানের কাছে হরিনাম ক'রে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনেন।

কিন্তু ততঃ কিম ?

সর্বেশ্বর ওঁর সাধনভজনের নির্বিঘ্ন ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। জনহীন বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে ছোট একখানি ঘর। রাত্রির তৃতীয় প্রহরের শেষভাগ থেকে প্রভাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত কেউ তাঁকে যাতে বিরক্ত না করে—সেদিকেও দৃষ্টির অভাব ছিল না। স্নানে দর্শনে বহির্গত না হ'লে ওঁর অন্তরঙ্গরাও নিকটে আসেন না। প্রসাদভিক্ষা গৃহে পৌছে যায়।

এই তো তাঁর কাম্য ছিল, ধ্যান ও ধারণার মনন ও চিন্তনের নিরবিচ্ছিন্ন নির্বিঘ্ন অবসর।

তবে সেও তো প্রাথমিক।

মূল কামনা যা—ওঁর সাধনার যা লক্ষ্য—তার কাছেও তো পৌছতে পারেন না। সেদিকে যাওয়ার কী পথ তাই বা কে বলে দেবে? যাকে প্রশ্ন করতে যাবেন, মনের গোপন কল্পনার ঈপ্সার পদ্মদলটি যার কাছেই অনাবরিত করবেন—সে-ই বাতুল বলবে না কি?…

দর্শনে গিয়ে দণ্ডের পর দণ্ড কাটে, প্রহরাধিক কাল উত্তীর্ণ হয়ে যায়; নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে থাকেন মূর্তির দিকে। দারুভূতো ব্রহ্মের দিকে।

কখনও বা সেই আধো অন্ধকারে কম্পমান প্রদীপের আলোতে মদনমোহন মূর্তি প্রতিভাত হয় তাঁর চোখের সম্মুখে, তাঁর ধ্যানমূর্তি, ইষ্টমূর্তি—প্রাণের ঠাকুর দেখা দেন। তবে সে কদাচিৎ এবং চকিতের জন্য।

পলকপাত মাত্রে সেই দারুমূর্তিই আবার স্পষ্ট ও সুপ্রকট হয়ে ওঠে।

আবার এক এক সময় মনে হয় সেই দারুমূর্তিই নরদেহের মতো সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে, যেন কি বলতে চাইছেন দেবতা—কী যেন বোঝাতে চাইছেন ওঁকে, কী যেন নির্দেশ দিতে চান—

বুঝতে পারেন না কৃষ্ণপ্রাণ। আকুল হয়ে ওঠেন।

প্রস্তরস্তম্ভে মাথা কুটে রোদন করেন।

সে স্বপ্ন বা কল্পনাও বুঝি মিলিয়ে যায়।

মনে হয় দারুমূর্তি তাঁর দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

'ওগো আমি যে তোমাকে কাছে পেতে চাই, তোমাকে ভালবাসতে চাই; তোমাকে বক্ষে পেতে চাই, তোমার সেবা করতে চাই! তুমি কি আসবে না?'

এই অস্থিরতা ক্রমশ যেন তাঁর দিনরাত্রির জপধ্যানকেও বিঘ্নিত ক'রে তোলে, সে অস্থিরতা তাঁর মনোসংযোগের মূলে নাড়া দেয়।

তবে বহিরঙ্গ সাধনায় কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

তিনি ঘটতে দেন না।

এখানেও দিনে দিনে অনুরাগীর দল গড়ে ওঠে, বৃদ্ধি পায় ভক্তসংখ্যা। নিজের নির্জনবাস, জপধ্যানের স্বাধীনতা রক্ষা করতেই যেন কৃষ্ণপ্রাণ এঁদের

জন্য একটি পৃথক সময় বেছে নেন। অপরাহ্ণে মন্দিরে গিয়ে আর একবার দর্শন ক'রে এসে শ্রীমন্দিরের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সঙ্কীর্তন আরম্ভ করেন। অনুরাগী ভক্তরা তো বটেই—কিছু বা বহিরাগতও সে দলে যোগ দেন। দেখতে দেখতে সে দলের আয়তন বিশাল হয়ে ওঠে।

কীর্তন করতে করতে ভাবাবেগে নৃত্য শুরু হয়—নৃত্য করতে করতেই পরিক্রমা করেন এই আশ্চর্য সন্ন্যাসী, যাঁর দেহ নবনী নয় যেন ভক্তিচন্দন পঙ্কে গঠিত, যাঁর ভঙ্গীতে পবিত্রতার দ্যুতি, দৃষ্টিতে যাঁর সুগভীর প্রেম, কণ্ঠস্বর অমৃতবর্ষী—এ বার্তা দেখতে দেখতে দূর থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, শুদ্ধমাত্র তাঁকে দর্শন করতেই বহু লোক বহু কষ্ট করে ছুটে আসে।

ফলে কীর্তনের দল এমনই বিশাল হয়ে ওঠে যে এক একদিন পরিক্রমা কালে তার শেষ প্রান্ত অগ্রবর্তী দলের সম্মুখীন হয়ে পড়তে লাগল। পথের দুই পাশে, যাঁরা এ দলে যোগ দিতে পারেন না—বিশেষ স্ত্রীলোকরা গভীর ভিড় ক'রে থাকেন, কেউ বা ছোট ছোট মন্দিরগুলির বলভীতে পর্যন্ত উঠে পড়েন সম্মুখে স্থান না পেয়ে—মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন এই অপার্থিব দৃশ্যের দিকে, দুই শ্রবণেন্দ্রিয় একাগ্র ক'রে নামগান সুধা গ্রহণ করেন।

ক্রমে এই অসাধারণ সন্ন্যাসীর অসংখ্য কাহিনী রাজার কর্ণেও প্রবেশ করে। বহু পূর্বেই করেছিল—কিন্তু এখন তাঁর চাঞ্চল্যের কারণ নীলাচলের এই ভক্তিতরঙ্গর উচ্ছলতা। যেন মনে হয় নগরের সকল অধিবাসী, সুদূর গ্রামাঞ্চলের সহস্র সহস্র ব্যক্তি এখানে একত্রিত হয়ে ঈশ্বরের প্রেমসাগরে অবগাহন ক'রে শুদ্ধ হচ্ছেন, সেই অপূর্ব রসে মত্ত হয়ে উঠেছেন। সে সরোবর টলমল করছে, ছলছল শব্দে আহ্বান জানাচ্ছে সন্তাপিত দুঃখী লোকদের।

রাজা আর স্থির থাকতে পারেন না, সভাপণ্ডিতকে বলেন, 'আচার্যদেব, এমন আশ্চর্য দৃশ্য ও দর্শন থেকে আমাকে বঞ্চিত রেখেছেন কেন? শুনলাম আপনারও শুষ্ক শাস্ত্রচর্চা—বেদান্তও অদ্বৈততত্ত্ব এই লোকটির প্রবল ভক্তিস্রোতে ভেসে গেছে। তবে আমিই বা সে স্রোতে ভাসি না কেন, সে অমৃত থেকে আমাকে দূরে রেখেছেন কেন?'

সর্বেশ্বর চিন্তিত মুখে বললেন, 'রাজাধিরাজ, এ সন্ন্যাসী সানন্দে দীনতম লোককে আলিঙ্গন করেন কিন্তু ধনী বা বিষয়ী লোক শুনলেই বিষবৎ পরিহার

করতে চান। অত মধুর স্বভাব লোকটির—মুহূর্তে কঠোর হয়ে ওঠেন। বলেন, ওরা সাধুর কাছে আসে ঐহিক শক্তির প্রার্থী হয়ে। বিষয়ের বাইরে কিছু জানে না। অনেক কপটাচারী সাধু ওদের তোষামোদও করে, সবাইকে তাই ভাবে।'

রাজা বললেন, 'আমি যদি দীনতম দীন রূপে যাই—তাঁর চরণরেণুভিক্ষু হয়ে?'

'না রাজন, সে প্রস্তাব আমি নিজে থেকেই করেছি। এও বলেছি যে তিনি রাজচক্রবর্তী হয়েও ব্যক্তিগত জীবনে সামান্য নাগরিকের মতোই আচরণ করেন। কিন্তু তাঁর ঐ একই বক্তব্য, "বিষয়ী লোককে দেখলেই আমার সর্বঅঙ্গে যেন বিষদাহ অনুভব করি"।'

রাজা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও ক্ষুণ্ণ হন—কিন্তু কোন উপায়ও চিন্তা করতে পারেন না। সুদক্ষ শাসক তিনি, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা; আফগান শক্তিকে সম্পূর্ণ পরাভূত ও বিতাড়িত করে উড়িষ্যার শক্তি বা শাসনসীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন—কিন্তু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট তাঁর শৌর্যবীর্য প্রকাশের অবসর কই? ভিক্ষুকের কাছে তিনি ভিখারীর বেশেই যেতে চান—তার বেশী আর কী করতে পারেন তিনি?

শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরই এক উপায় চিন্তা করেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, যুবরাজ পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর। অতি সুদর্শন, অতি সুকুমার। লাবণ্য ও পৌরুষের অপরূপ সমন্বয় তাঁর দেহে। শিক্ষিত, ভদ্র, বিনত।

সর্বেশ্বর একদিন অপরাহ্নে—সঙ্কীর্তন দল সমবেত হওয়ার সময় হিসেব ক'রে যুবরাজকে পীতধড়া, মোহনচূড়া (শিখিপুচ্ছসহ) গুঞ্জামালায় সুসজ্জিত ক'রে প্রস্তুত রাখলেন।

কৃষ্ণপ্রাণ সঙ্কীর্তন দলের অগ্রভাগে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে করতে যাচ্ছেন—অকস্মাৎই দৃষ্টি পড়ল তাঁর ঠিক সম্মুখেই ঐ মোহনমূর্তি; তাঁর ধ্যানের কল্পনায় কামনার ইষ্ট তাঁর সম্মুখে, মুখে সুমধুর হাস্য, হস্তে অভয় মুদ্রা—

'তুমি কি এলে! এত দিনে দয়া হ'ল তোমার! প্রভু আমার, প্রিয় আমার, সর্বস্ব আমার—সত্যিই কি তোমাকে পেলাম!'

যেন এক বুকফাটা আবেগের সঙ্গে শব্দ কটা উচ্চারণ করতে করতে পাগলের মতো সে দিকে ধাবিত হলেন সন্ন্যাসী—প্রিয়তমকে গভীর আলিঙ্গনে বদ্ধ করার

আশায় দুই বাহু প্রসারিত ক'রে।

ঠিক সেই মুহূর্তে সর্বেশ্বরের কিছুপূর্বের শিক্ষা অপেক্ষা আজন্ম শিক্ষা ও জন্মগত সংস্কারেরই জয় হ'ল। অথবা এই অপরূপ ভাবমূর্তি দেখে শ্রদ্ধা আপনিই তার কাজ ক'রে গেল। রাজকুমার কুণ্ঠিত ও ব্যস্ত হয়ে সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে প্রণাম জানাতে গেলেন।...

একটা রূঢ়—বা যেন রূঢ়তম আঘাতে স্বপ্নভঙ্গ হ'ল কৃষ্ণপ্রাণের।

কুমারের এই প্রণামোদ্যত ভঙ্গীতে, শ্রদ্ধা ভক্তি এবং তজ্জনিত কৃষ্ণপ্রাণের ইষ্ট-ভ্রমের জন্য কুণ্ঠাতে—কতকটা নিজেকে অপরাধী বোধ করলে যে কুণ্ঠা দেখা দেয় সৎ ও সংস্কৃত-মানুষের—কৃষ্ণপ্রাণ বুঝলেন এ তাঁর সে ইষ্ট নয়—মানুষই।

বহুদিনের একাগ্রতম তীব্রতম কামনার কারণেই, গত কয়েকলহমায় যে এতটা আশা দেখা দিয়েছিল মনে, এমন অসম্ভব অথচ উত্তুঙ্গ আশা—তা বোধ হয় তিনিও বুঝতে পারেন নি।

সেই বিপুল আশা আর তার আকস্মিক বিনষ্টির সংঘাতে সমস্ত শরীর মন শিথিল, অবসন্ন হয়ে এল, কিছুকালের জন্য কোন চেতনা বা অনুভূতিই রইল না। মূর্ছা নয়—বিহ্বল ভাবেই তিনি যেন পড়ে গেলেন, বসে পড়ার মতোই—ইষ্টমূর্তিধর যুবরাজের প্রায় পদপ্রান্তে।

॥ ১৭ ॥

এর পর অস্থিরতা আরও বাড়ে।

কেমন একটা অভিমানও বোধ করেন যেন।

এ অভিমান কার উপর ?

এই চারিপাশের অগণিত ভক্তজন, সঙ্গীসেবকদের উপর—না স্বয়ং জগন্নাথের উপর ?

নিজেকে যেন একপ্রকার প্রতারিত বোধ করেন। মনে হয় তাঁর ইষ্টদেবতাই তাঁকে নিয়ে এই খেলা খেললেন। তাঁর আশা ও কামনাকে পরিহাস করতে, হাস্যাস্পদ ক'রে তুলতে।

সর্বেশ্বরের উপরও কিছুটা বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বুদ্ধিমান কৃষ্ণপ্রাণের বুঝতে বাকী থাকে না, এ আয়োজন কেন ও কার প্ররোচনায়।

অথচ এও বোঝেন, ঈশ্বরই তাঁকে এই আঘাত দিয়েছেন—বামনের চাঁদ ধরার মতোই, এত সামান্য সাধনায় তাঁকে জীবন্তরূপে পাবার ইচ্ছা যে কতখানি ধৃষ্টতা ও মূঢ়তা—তাই বোঝাবার জন্যই এ ব্যবস্থা তাঁর।

পদানত যুবরাজকে সস্নেহে তুলে শেষ পর্যন্ত আলিঙ্গন দান করেছিলেন সেদিন ঠিকই—তবে রাজাকে দর্শন দিতে সম্মত হন নি। এমন কি অন্তরঙ্গ সহচরদের মিনতিতেও না।...

আরও যেন এই সব কারণেই বেশী অস্থির হয়ে ওঠেন।

মনে হয় এখানেও অনুরাগী ও ভক্তদের বন্ধনে বাঁধা পড়ছেন। সেই পূর্ব জীবনেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে। ভক্তি ও সাধনার সমারোহে মূল উদ্দেশ্য যেন সুদূর এক কুহেলিকায় আচ্ছন্ন অস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

তবে তিনি জন্মভূমি ছেড়ে, জ্ঞানী সমমর্মী বান্ধবদের সাহচর্য ছেড়ে গর্ভধারিণী জীবনদাত্রীকে কাঁদিয়ে—এত দূর এলেন কেন?

পথের দিশা যে শুধু দেখতে পাচ্ছেন না তাই নয়—তার অন্বেষণ করার কি উপায় সে কথা চিন্তা করারও অবসর পাচ্ছেন না।

মধ্যে মধ্যে মন্দিরস্থ বিশাল মূর্তির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ইষ্টের দর্শন পান বটে—তবে বড় চকিতের সে দেখা, বড় দূরের দর্শন।

তাতে আশ মেটে না, তৃষ্ণা বর্ধিত হয়।

শেষে সহসাই একদিন মন স্থির ক'রে ফেলেন।

তিনি তীর্থে যাবেন। তীর্থে তীর্থে ঘুরবেন। ভারতভূমি পরিক্রমা করবেন। খুঁজে বেড়াবেন কোথায় তাঁর সে প্রাণের পুরুষ, প্রাণের মানুষ—কোন্‌তীর্থে কোন্ মন্দিরে বা কোন্ মানুষের মধ্যে ওঁরই অপেক্ষায় বসে আছেন।

আর দেখবেন তাঁর দেশবাসীদেরও।

যতটা দেখেছেন—একই অবস্থা। ধর্মের নাম ক'রে নানা অবিচার, অত্যাচার এবং অনাচার চলছে। ব্যভিচারও। এই সব পীড়িত লোকদের কোন্ সেবায় তিনি আসতে পারবেন, কেমন ক'রে ভগবানকে পাওয়ার সহজ উপায় তাপিত উৎপীড়িত ভগবানেরই সৃষ্ট মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন—এ চিন্তাও আজকাল যেন তাঁর ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে।

তবে তার আগে আরও দেখতে হবে, তাদের কাছে পৌঁছতে হবে।

স্থির করলেন এখান থেকে সোজা দক্ষিণাভিমুখে যাবেন সমুদ্রতীর ধরে। বহুপরিচিত, বহুশ্রুত সকল তীর্থে তো যাবেনই, দেবতাদের দর্শন করবেন; পথে আর যে সব স্বল্পখ্যাত তীর্থ বা মন্দিরের কথা শুনবেন সেখানেও যাবেন। যাবেন সিংহাচলম্, যাবেন গোদাবরীতীর্থে, মল্লিকার্জুন, বেঙ্কটাচলম্ (তিরুপতি ও তিরুমল্লেশ্বর দর্শন); যাবেন কাঞ্চী; শ্রীরঙ্গম্ যেখানে প্রভু রামানুজাচার্যের অর্চিত অনন্তশয়নে বিরাট বিষ্ণুমূর্তি, মথুরায় মীনাক্ষী দর্শন করবেন, সেখান থেকে রামেশ্বরম্, কন্যাকুমারী; তারপরও যাবেন দক্ষিণ পশ্চিমের নানা তীর্থ; পরে বিঠ্ঠলদেব প্রভৃতি দর্শন সেরে দ্বারকায় যাবেন। তারপর? পথেই স্থির করবেন। তাঁর প্রাণের ইষ্ট যে পথ দেখাবেন সেই পথেই যাবেন।

তিনি এ সঙ্কল্প ব্যক্ত করা মাত্র সঙ্গী ও সহচররা ওঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রাণ এবার তাঁর মন দৃঢ় করেছেন, বহু লোকের সঙ্গে বিরাট দল নিয়ে তো নয়ই—এমন কি অন্তরঙ্গ কজনকেও তিনি সাথী হিসাবে নেবেন না। ওতে সাধনার বহিরঙ্গ ক্রিয়াগুলো যদি বা বজায় থাকে—অন্তরের সঙ্গে বোঝাপড়া চলে না। তিনি চান ঈশ্বরের চিন্তায় ডুবে থাকতে, তিনি চান মনের মধ্যে খুঁজে পেতে। তিনি চান ঈশ্বর তাঁর কাছে এসে তাঁর সেবা নিন। এ নিভৃত সাধনা. আকুলতা তীব্র না হলে সে সাধনায় সিদ্ধি মিলবে না। বহু লোকের সঙ্গে বহু কোলাহলে বা আড়ম্বরের মধ্যে সে নিভৃতি সম্ভব নয়।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত একজন সেবককে নিতেই হ'ল। হরিগুণগাননিরত এক ব্রাহ্মণ সন্তান, ব্রহ্মচারী—এখানেও তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিল—সে-ই সঙ্গে যাবে। প্রায়শঃই যার কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তাকে রক্ষণাবেক্ষণ, তার প্রাণরক্ষার জন্য একটি অনুরাগী ও অনুরক্ত লোক সঙ্গে থাকা প্রয়োজন—তা স্বয়ং কৃষ্ণপ্রাণও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। তবে সে সেবক বিষ্ণুদাসকে বলে দিলেন, বহির্বাস কৌপীন ও জলপাত্র ছাড়া আর কোন বস্তু সঙ্গে না নেয়।

ভক্তরা এই দীর্ঘ যাত্রায় তাঁর যে সব বস্তু প্রয়োজন হতে পারে তার দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করছেন লক্ষ্য করেই বোধ হয় তাঁর এই নিষেধাজ্ঞা।

ভ্রমণে বহির্গত হয়ে তিনি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

যাত্রাপথ বড় সুখদ, বড় সুন্দর।

শারীরিক অর্থে সুখদ নয়—যার শরীর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই—তার কাছে

আর প্রচলিত অর্থে সুখের মূল্য কি ?

নব নব তীর্থ, নব নব দেব দর্শনের আনন্দ তো আছেই ; মানুষের ভক্তি ও ঈশ্বরের চিন্তা, ঈশ্বরসেবার এই নব নব প্রকাশ—অনন্ত নীল আকাশের নিচে শয়ন, নদীজলে স্নান, পর্বতের নীলাভা, বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্প সমারোহ, সুমিষ্ট ফলবান বৃক্ষসমূহ—প্রকৃতি যেন এখানে স্রষ্টার সকল বিভূতি প্রকাশ করতে ব্যস্ত। এই তো তাঁর স্বরূপ, এখানেই তো ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ।

আর মানুষ। নর-নারায়ণ, নররূপী নারায়ণ—এও যেন এবার পূর্ণরূপে উপলব্ধি করলেন।

সাধারণ বিত্তহীন মানুষের যে অহেতুক ভালবাসা লাভ করলেন পথে যেতে যেতে, তার বুঝি তুলনা নেই। শ্রদ্ধাভক্তির কারণ আছে, তাঁর মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বসন, হস্তে কমণ্ডলু - এ যে দেখবে সে-ই মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করবে, কোন পরিচয় ব্যতিরেকেই—এই তো এ দেশের শিক্ষা। কিন্তু অকারণ প্রীতিও যে মানুষ এমন অকৃপণ ভাবে বিলোতে পারে তা কখনও ভাবতে পারেন নি।

তৃপ্তিলাভ করেন বৈকি।

তবে সে তৃপ্তি কি পূর্ণ ?

ওঁর মনে যে শূন্যতা, ওঁর মনে যে হাহাকার—তা তো পূর্ণ হয় না। মন তো বলে না, আর নয়, আমি যা চেয়েছিলুম এখানে এসে তাই পেয়েছি। খুঁজে বেড়ানোর এই শেষ।

তবে একেবারে কিছু পান নি, তা নয়।

তাঁর পথের পরিষ্কার দিশা দেখতে পেলেন।

সিংহাচলম্ পেরিয়ে গিয়ে এক রাজর্ষির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

এ এক ঐতিহাসিক যোগাযোগ যেন। এ মিলন এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিল ওঁর জীবনে, ওঁর মনে। তিনি সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর হ'তে পারলেন।

এই মহাজ্ঞানী মহাভক্ত ভগবৎরসিক ব্যক্তির খ্যাতি পূর্বেই শুনেছিলেন।

ইনি পৌরাণিক আখ্যায়িকায় জনক রাজার মতোই, নিপুণ ভাবে রাজকার্য পরিচালনা করলেও রাজশ্রীর ভোগবিলাস শক্তির মোহ তাঁকে বন্ধন করতে পারে নি। যেমন হংস জলে থাকলেও জল তার কোন চিহ্ন রাখতে পারে না ওদের দেহে—তদ্রূপ।

ইনি রাজপ্রতিনিধি, উড়িষ্যারাজের প্রতিভূ হয়ে রাজ্যের দক্ষিণাংশ শাসন করেন। তদুপযুক্ত জীবনযাত্রা তাঁর, তেমনি সাড়ম্বর, তেমনি মহিমাময়। এগুলি রাজত্বেরই অঙ্গ। আড়ম্বর সমারোহ। শক্তির প্রকাশ না থাকলে প্রজাদের শাসনে রাখা যায় না। উত্তর ভারতে প্রবাদই আছে—'জিমিনদারী গরম কা'। অর্থাৎ ইতর বাংলায় যাকে 'দাপট' বলে তা কিছু প্রয়োজন। প্রজারা ভালও বাসে এগুলো। যার দ্বারা শাসিত হচ্ছি সে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র, অনেক উচ্চে—এই অনুভূতিটাই শাসক সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান করে।

অনেকে বলবেন এটা অদৃষ্টের পরিহাস।

বিষয়ী লোকের সঙ্গ বিষ বলে যিনি নৃপতিকে দর্শন মাত্র দিলেন না, পরম ভক্ত এবং সাধারণ জীবনযাপনকারী জানা সত্ত্বেও—তিনিই শেষ পর্যন্ত বিষয়ী লোককে আলিঙ্গন দিয়ে এক অনির্বচনীয় মাধুর্যে অবগাহনের আস্বাদ পেলেন। সে মধুররসে দেহমন আপ্লুত হয়ে গেল। এমনি ভাবেই বুঝি পরম প্রেমে বিগলিত হয় মানুষ।

দুই বন্ধুর মিলন হ'ল পুণ্যতোয়া গোদাবরী তীরে। বন্ধু বলছি এই জন্যে যে—প্রথম মিলন থেকেই নিবিড় সখ্য, যেন আত্মায় আত্মীয়তা গড়ে উঠল দুই বিভিন্ন জীবনের সাধকের মধ্যে। এবং সে বন্ধুত্ব চিরজীবনই অটুট ছিল।

বেশ কিছুদিন এর আশ্রয়ে রইলেন কৃষ্ণপ্রাণ।

রাজপ্রতিনিধি সারাদিন রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকতেন, তৎসত্ত্বেও সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সন্ন্যাসীর কাছে অতিবাহিত করতেন—কৃষ্ণপ্রেম-রসতত্ত্বকথা, সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করতেন।

এই প্রবীণ গুপ্ত সাধকের কাছে নবীন সন্ন্যাসী শিখলেন, জানলেন অনেক, আবার নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রসানুভূতির জারক রসে জারিয়ে উপলব্ধি করলেন আরও অনেক বেশী।

রাজর্ষি বুঝিয়ে দিলেন—সাধনার প্রথম স্তর হ'ল স্বধর্মাচরণ; শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিজ কর্তব্যপালন। এই হ'ল সাধনার আসল ভিত্তি। এর পরে সমুদয় কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করলে চিত্ত শান্ত শুদ্ধ হয়, এতদ্ব্যতীত অন্য পথ যে আছে—শাস্ত্রবিধি অনুসারেই নিয়ত ঈশ্বর ভজনে নিরত থাকা—তাকে বলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। পরে এই সকল আচার ও বিধির ঊর্ধ্বে উঠলে শুদ্ধাভক্তি লাভ করে সাধক। এর দ্বারা ভগবান তাঁর একান্ত আপনজন, তিনি নিরন্তর

সঙ্গে আছেন, এই রূপ অনুভূতি হয়। একে শান্তপ্রেমাভক্তি বলেন পণ্ডিতরা। এই পথেই ক্রমে ক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পঞ্চ শ্রেষ্ঠ রসের অনুভূতি আসে মনে।

এই সব শেষ অর্থাৎ মধুর রসের সর্বোচ্চ বিকাশ, সর্বশেষ অবস্থা আসে—ঈশ্বরকে কান্তাভাবে ভজনা করলে। অর্থাৎ শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদনে; রাধার প্রেমের অবস্থা, আত্মশূন্য প্রবল প্রেম অনুভব করতে পারলেই ঈশ্বরকে একান্ত আপন করে পাওয়া যায়।

এই গোপন এবং অন্তরঙ্গ আলোচনার পরও কোথায় যেন একটা অতৃপ্তি বোধ হয়।

কৃষ্ণপ্রাণ প্রশ্ন করেন, 'কান্তাভাবে ভজনার সর্বশেষ অবস্থা কি রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণ সাধনায় ?'

'না। রাধাভাবও সর্বশেষ কথা নয়।' রাজসাধক আরও গূঢ় গূঢ়তম তথ্য প্রকাশ করেন, 'সখীভাবে ভজনাই সর্বসাধ্যসার।'

'কেন ?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন কৃষ্ণপ্রাণ, 'শ্রীরাধার প্রেম অপেক্ষাও তাদের প্রেম মহান কিসে ?'

উত্তরদাতা হাসেন। চতুর ব্যক্তির চাতুর্য ধরা পড়ে গেলে যেমন অপ্রতিভের হাসি হাসে মানুষ।

তিনি বলেন, 'রাধাভাব বলতে বিভিন্ন পুঁথি ও কিম্বদন্তীতে বা সঙ্গীতে রাধাভাবের যে রূপটি আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়—তাতে তাকে স্বার্থ- ও বাসনাযুক্ত এমন কি সকাম বললেও অন্যথা হয় না। কিন্তু সখীদের ভাব তা নয়। তাঁদের নিজেদের সুখ দুঃখ বলতে কিছু রাখেন নি তাঁরা, আশা-আকাঙ্ক্ষা-কাম-কামনা—কিছুই নয়। শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার প্রেমলীলা আস্বাদন করেই তৃপ্ত, সুখী—সেই তৃপ্তিলাভে সহায়তা ক'রে, সে লীলার আস্বাদনেই তাঁদের তৃপ্তি, তাঁদের সুখে ওঁদের সুখ—তাঁদের পূর্ণতাতেই ওঁদের পূর্ণতা। সেইজন্যই সখীভাব শ্রেষ্ঠ।'

আরও বললেন, 'তাঁদের মধ্যে কাম-কামনার গন্ধ নেই। নিজেদের স্বার্থ, বোধ হয় নিজেদের অস্তিত্বই তাঁরা বিস্মৃত হয়ে ছিলেন, রাধাকৃষ্ণের সেবায় মন প্রাণ জীবন সমস্ত বিলিয়ে মিলিয়ে দিয়ে।...এই ভাবে কামগন্ধ দূর হলেই পরমানন্দ

প্রাপ্ত হয় মানুষ। নর বা নারীর পরস্পরের প্রতি চরম প্রেমে যখন কে কি সেই বোধ লোপ পায়, কে পুরুষ কে রমণী সে জ্ঞান থাকে না—অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে কামসচেতনতা বিলুপ্ত হয়—তখনই তাঁরা প্রেম-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন, ব্রহ্মস্বরূপে উপনীত হন।*

॥ ১৮ ॥

কান্তাভাবে ঈশ্বর ভজনায় আরও স্পষ্ট চিত্র দেখতে পেলেন কৃষ্ণপ্রাণ দক্ষিণী এক কবির গীতিগুচ্ছ থেকে।

এই কবি-রচিত বহু গান এদেশে গীত হয়ে থাকে, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সমাবেশে তো বটেই, মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীরাও গেয়ে থাকেন।

সে গানের ছত্রে ছত্রে গভীর প্রেমের প্রকাশ, আকুলতা, ঐকান্তিকতা। ঈশ্বরকে প্রিয়, প্রিয়তম জ্ঞানে তাঁকে প্রেম নিবেদন—যেমন স্ত্রীলোক তার ভর্তা বা দয়িতকে ক'রে থাকে, প্রেমিকা তার প্রেমিককে।

কৃষ্ণপ্রাণ সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, সংস্কৃতের অপভ্রংশ প্রাকৃত ভাষাতে অনর্গল কথা বলতে পারেন; এসব দেশের ভাষা প্রধানত সংস্কৃতজ, তখনও পর্যন্ত কিছু কিছু প্রাকৃতরও চল ছিল ভদ্রসমাজে—অনন্যসাধারণ মেধাবী পণ্ডিতের পক্ষে এসব ভাষার মর্মার্থ বা বক্তব্য গ্রহণ করা কিছুমাত্র কঠিন নয়।

তিনি এই গীতিমালার রস ও গভীর আন্তরিকতা উপলব্ধি ক'রে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

এইভাবেই তাঁকে ডাকতে হবে—এই আকুলতা, এই একাগ্রতা দিয়ে; হৃদয়ের যন্ত্রণা এমনি ভাবে উজাড় ক'রে দিতে হবে।

সাধারণ, বহু আচরিত সাধনায় তাঁকে পাওয়ার আশা করাই তো বাতুলতা। …তবু স্থির থাকতে পারেন কই? সংশয় যায় কই?

অথবা পাণ্ডিত্যের, বহু শাস্ত্রচর্চার ফলে অদ্বৈতবাদ যুক্তির মেঘ এসে কুজ্‌ঝটিকার সৃষ্টি করে। সংশয়ের ধূম্রজালে বিশ্বাসকে আবরিত করে।

* "ন সো রমণ ন হাম রমণী
দুহুঁ মন মনোভাব পেশল জানি।"

তিনি উন্মাদের মতো ছুটে যান ঐ দেবদাসীদের কাছে। প্রকৃতি সম্ভাষণ যাঁর কাছে সাধনা থেকে স্খলিত হওয়ার মতোই মহাপাপ, তিনি সে মুহূর্তে ভুলে যান যে দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত হ'লেও এরা মূলত প্রকৃতিই – বলেন, 'তোমরা কি পেয়েছ তোমাদের ইষ্টদেবতাকে, তোমাদের প্রিয়তম, তোমাদের ভগবানকে? বুকের মধ্যে পেয়েছ? তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছ? তাঁকে সেবা করতে পেরে সার্থক হয়েছ?'

ওরা বেশির ভাগই অবাক হয়ে যায়, ওঁর বক্তব্য বুঝতে পারে না। কেউবা পাগল ভাবে, কেউ ভাবে কপট সন্ন্যাসী, গৈরিক বস্ত্রের ছদ্ম আবরণে দেবতার নামে উৎসর্গীকৃতা কুমারী কন্যাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করতে চায়।

উনি গিয়ে মন্দিরের পূজারীদেরও এই প্রশ্ন করেন।

মন্দিরের সন্নিকটে কিংবা তীর্থতীরে সাধনারত তপস্বীদেরও।

'ওগো, তোমরা তাঁকে পেয়েছ? অনুভব করেছ? আদর করতে, সেবা করতে পেরেছ? তিনি দেখা দিয়েছেন তোমাদের?'

তাঁরাও কেউ মৌন থাকেন, কেউবা পরিহার করেন উন্মাদ ভেবে—কেউবা স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে তখনকার মতো অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করেন।

মন ভেঙে পড়ারই কথা, তবু ভাঙতে দেন না কৃষ্ণপ্রাণ।

তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌছবেনই।

এতদূর যিনি টেনে এনেছেন, এ ভাবে যিনি গৃহসুখ, আত্মীয়, বান্ধব, পরিজন, নববধূ—সর্বাপেক্ষা প্রিয় খ্যাতি-যশ-প্রতিষ্ঠা থেকে সরিয়ে এনে পথের ভিখারী করেছেন—তিনি শেষ মুহূর্তে বঞ্চনা করবেন না কখনই। তাঁর উদ্দেশ্য কিছু আছে বলেই এ খেলা খেললেন কৃষ্ণপ্রাণের জীবন নিয়ে, সে উদ্দেশ্য সাধন তিনি করিয়ে নেবেনই।

তাই তীর্থভ্রমণ দেবদর্শন তাঁর অব্যাহত, অবারিত থাকে।

দাক্ষিণাত্যের সকল প্রসিদ্ধ তীর্থে বা দেবস্থানেই যান একে একে।

ত্রিপতি, পান্ধারপুরের বিঠ্ঠলদেব, রঙ্গজী, কন্যাকুমারী।

কোন মূর্তি বিরাট, কোন মূর্তি সুন্দর। তবে সবই যেন কিছুটা রহস্যে ঘেরা। আধা অন্ধকারে এক এক সময় মনে হয় এ সব মূর্তি জীবিত।

ওঁদের কি ওষ্ঠ কম্পিত হচ্ছে?

কিছু বলতে চাইছেন ওঁরা ?
আরও পরীক্ষা করতে চান তাঁকে ?
না কি পরিহাসে ওষ্ঠ বিকৃত হচ্ছে ?

তীর্থেরও শেষ নেই। কাশীধামে যান, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে। নাসিকে, উজ্জয়িনীতে। সাধুদের মঠ আশ্রম ঘোরেন। শংকরাচার্যের জন্মস্থান, শৃঙ্গেরী মঠে। পাণ্ডিত্য সাধনার পীঠস্থান। উভয়েরই আশ্চর্য সম্মেলন। বিখ্যাত সাধকসমাজের উপদেশ বক্তব্য শ্রবণ করেন, কিছু কিছু তর্কও হয় এক আধ সময়ে। রামানুজী সম্প্রদায়, মধ্বাচার্য সম্প্রদায় এঁদের সঙ্গেও আলাপ করেন।

কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করতে পারেন না। আশ মেটে না।

মনে হয় কেবল শব্দঝঙ্কার, বাক্‌চাতুর্য।

নিজ নিজ সম্প্রদায়কে নিজমন্ত্রকেই প্রাধান্য দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। এত বাগ্‌জাল বিস্তার।

এ আকুলতার সঙ্গে সাধারণ গৃহী বা বিষয়ী মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি, সামান্য প্রতিষ্ঠালাভের জন্য আকুলতায় কোন প্রভেদ নেই।

সকলেই মধুমক্ষিকা-ধর্মী, মধু সঞ্চয় করে, মধুর কলসের কানায় বসে কে কতটা অধিকার বিস্তার করতে পারবে—কার কতটা প্রাপ্য তাই নিয়ে কলহ—মধু পান করার কি মধুতে ডুবে যাওয়া, বিলীন হওয়ার চেষ্টা মাত্র নেই।

ভারতখণ্ড পরিক্রমার পথে দ্বারকায় আসেন।

এখানেও মঠ আশ্রমের অভাব নেই।

মোহান্তরাও নাকি বড় সাধু, তপস্বী। সাধনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

ঘুরে দেখেন, আলাপ আলোচনা করেন।

মনে হয় এসব পাণ্ডিত্যের সঙ্গে অহঙ্কার যুক্ত হয়েছে। তপস্যার অহঙ্কার, জ্ঞানের অহঙ্কার। নিজেদের প্রচার। ঈশ্বর কোথায় ?

এঁরা জানেন না যে—এঁরা সন্ন্যাস নিয়েছেন ঠিকই, হয়ত সে সন্ন্যাস নষ্ট হয় নি, ব্রহ্মচর্য আছে অস্খলিত, কৃচ্ছ্রসাধনের অন্ত নেই—কিন্তু তার মধ্যেই কখন ঈশ্বর থেকে আরও দূরে সরে গেছেন।

তবে শুধুই এই শ্রেণীর—নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রচারকার্যে উৎসুক, স্ব মতের

শ্রেষ্ঠত্বে অহঙ্কারী—সাধু দেখলেন বললেও সত্যের অপলাপ হয়।

যথার্থ সাধু—প্রতিষ্ঠায় প্রচারে উদাসীন বীতস্পৃহ তপস্বীও দেখলেন বৈকি। তাঁরা সাধারণত জনারণ্যে আসেন না, খুঁজে বার করতে হয়। অনেককে প্রশ্ন ক'রে জেনে, ঘুরে ঘুরে—নির্জন গুহায় কি নদীতীরে কি বিজন অরণ্যে একা তপস্যা করেন, সেবক-শিষ্য কিছু করেন নি, এমন সাধুও অনেক দেখলেন। অবশ্য তাঁরাও জ্ঞানমার্গী, যোগী, কৃচ্ছ্রসাধনের ছায়া, সর্ববিধ ভোগত্যাগের দ্বারা ব্রহ্মে লীন হতে চান, নির্বিকল্প সমাধি চান।

এ ওঁর পথ নয়।

উনি যে ভালবাসা চান, ভালবাসতে চান।

চান সেবা করতে। প্রেম রস আস্বাদন করতে, সেই মাধুর্যে ডুবে থাকতে। শুষ্ক সন্ন্যাস ওঁর জন্যে নয়।

অবশেষে এক সময় তাঁর ইষ্টের বাল্যলীলাভূমি, শিক্ষাস্থানও—শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছন।

দূর হ'তে নীলাচলের মন্দিরচূড়া দেখে যে অবস্থা হয়েছিল, বৃন্দাবনের নিকটস্থ হয়েও সেই আকুলতা বা উন্মত্ততা জাগ্রত হ'ল।

শেষ দুই ক্রোশ পথ প্রায় ছুটেই গেলেন, কণ্টকগুল্মে বস্ত্র ছিন্ন, পা ক্ষতবিক্ষত —তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। বেচারী সেবক ব্রাহ্মণ তাঁর সঙ্গে ছুটতে পা' র না।

পৌঁছে স্বপ্ন ভঙ্গ হ'ল অবশ্যই।

কোথায় ওঁর সেই পুরাণে পঠিত বৃন্দাবন, ওঁর ধ্যানের, ওঁর স্বপ্নের বৃন্দাবন!

এ তো অরণ্য। কিছু ভিক্ষুকের বাস, কিছু হিংস্র জন্তুর।

পথে ঠগ, ডাকাতের দল নাকি থাকে ওৎ পেতে।

দিল্লীর অধীশ্বর এর যথার্থ নামই দিয়েছেন—ফকিরাবাদ।

থাকার মধ্যে আছে যমুনা নদী, মুক্তালতা, দু একটি তমাল বৃক্ষ। যমুনা-পুলিন বলে একটি স্থানও নির্দিষ্ট আছে অবশ্য—যদিও তা সেই প্রাচীন সাহিত্যের বর্ণনার সঙ্গে মেলে না।

এমনিই কিছু কিছু আরও চিহ্নিত স্থান আছে।

ভগবানের কিছু কিছু প্রস্তরমূর্তিও আছে।

কিম্বদন্তী শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধর পত্নী উষাদেবীর বর্ণনামতো এক প্রখ্যাত

শিল্পী সে মূর্তি গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন।*

বোধ করি মানব-কল্পনা ও দক্ষতার অতীত সে অনন্যসুন্দর মূর্তির প্রস্তরে গঠন সম্ভব নয় বলেই শিল্পী তা পারেন নি।

একটি মূর্তি সম্পূর্ণ হ'তে শিল্পীর উৎসুক ব্যগ্র চোখের দিকে চেয়ে বিষণ্ণ উষা বলেছিলেন, 'মূর্তির চরণযুগল সর্বদেবপূজিত শ্রীচরণের মতোই হয়েছে বটে, তবে আর কোন অংশের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই।'

পুনশ্চ আর এক মূর্তি গঠিত হ'ল।

উষা বললেন, 'ভৃগুপদলাঞ্ছিত সেই অবর্ণনীয় বক্ষস্থলের সঙ্গে এ মূর্তির বক্ষস্থলের কিছুটা সৌসাদৃশ্য আছে।'

প্রায় হতাশ শিল্পী আর এক মূর্তি নির্মাণ করলেন।

এবার উষা মুখে অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে বললেন, 'গুরুজনের মুখ দেখে নিজের মুখ আবৃত করেছি, তবে সেও আংশিক সাদৃশ্য মাত্র। শিল্পীরাজ মনে করবেন না যে এ মূর্তি সবটাই তাঁর মতো হয়েছে।'

তারপর, অবসন্ন ক্লান্ত শিল্পীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'না না, আপনি হতাশ হবেন না কিম্বা লজ্জা বোধ করবেন না। মানবের যা সাধ্য তা আপনি করেছেন, তার বেশি করবেন কেমন ক'রে! মনে হয় বিধাতারও অভিপ্রায় নয় যে সে অকল্পনীয় অভূতস্পৃষ্ট সুন্দর দেহের প্রতিকৃতি একটি মাত্র প্রস্তরখণ্ডে বিধৃত থাকে! ভাবীকালের দর্শনেচ্ছু ভক্তরা তিনটি মূর্তি দর্শন ক'রেই তাঁকে কিছুটা ধারণা করতে পারবেন।'

সেই তিনমূর্তি—শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীগোবিন্দ রূপে বৃন্দাবনেই নাকি বিরাজ করছেন।···

অতি কষ্টে সন্ধান ক'রে সে মূর্তিত্রয় দর্শন করলেন কৃষ্ণপ্রাণ। তবে এ দর্শনে

* শোনা যায় আদি খ্রীষ্টানদের মহাত্মা পল যীশুকে দেখেন নি, (কতকটা সে কৌতূহলেও হয়ত) তবু, অনাগত কালের ভক্তদের আকুলতা অনুমান করেই সম্ভবত, তিনি যীশুর এক প্রতিমূর্তি বা প্রতিকৃতি রচনায় ব্রতী হয়ে ছিলেন। সেজন্য তিনি দারু নির্মিত শেষ পানপাত্রটির (লাষ্ট সাপার) একটি রজত আধার নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। তাতে আধারটিও রক্ষা পাবে, যীশু ও তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের মূর্তিও থাকবে, এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সে কারণে তিনি একমাত্র তখনও জীবিত শিষ্য মহাত্মা জনকে ও কারিগর শিল্পীকে এক নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে (রোমানদের ভয়ে) ঐ আধারটি নির্মাণ করান।—লেখক।

আনন্দ অপেক্ষা বেদনাই অধিক বোধ করলেন তিনি।

এই অমূল্য মূর্তিগুলি কী অযত্ন কী অবহেলার মধ্যেই না আছে!

আজও তো তেমন কৃষ্ণগতপ্রাণ ভক্তের অভাব নেই, তবে এ তীর্থ, এই মূর্তি-গুলি পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত বা সংরক্ষণ ও পূজার যথাযথ ব্যবস্থা হয় না কেন?

তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—কোন এক বা একাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে এই মূর্তিত্রয় তথা শ্রীবৃন্দাবনকে পূর্ব তথা পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বভার অর্পণ করবেন।

তাঁর যেরূপ দুই চক্ষু বিদীর্ণ, দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে বাষ্পধারা নির্গত হ'ল—নিজেদের অকর্মণ্যতার, ঔদাসীন্যের জন্য, কর্তব্যে অবহেলার জন্য লজ্জায়—অনাগত কালের ভক্ত যাত্রীদের ভাগ্যে এমন না ঘটে।

তীর্থ পরিভ্রমণের প্রায় সমাপ্তিপর্বে এক চরম লাভ হ'ল তাঁর।

ঈশ্বরের পরম করুণাও বলা যেতে পারে।

অনুসন্ধান ক'রে ক'রে গোকুলে পৌছে—অন্তত গোকুল বলেই চিহ্নিত করলেন যে স্থানকে ব্রজবাসীরা—এক আশ্চর্য সাধকের সন্ধান পেলেন।

যমুনার তীরে এক পর্ণাচ্ছাদিত ঝোপড়ায় বাস করেন এই সাধু বা বৈরাগ্য-ব্রতী। কোন শয্যা নেই, জীবনধারণের অন্য কোন উপকরণও নেই, নেই ভবিষ্যতের কোন সঞ্চয়। পরিধানে একমাত্র সাধারণ বস্ত্র একখানি। তাও গৈরিক নয়। মালাতিলক ধারণ করেন না, কৌপীন বহির্বাস জটা কিছুই নেই। সন্ন্যাসীর কোন চিহ্নই না।

প্রত্যুষকাল থেকে বার বার যমুনায় অবগাহন করেন ও সেই সিক্ত দেহে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ধূলি মাখেন। বলেন, 'ওরে, এই ধূলিতে তিনি পা দিয়েছিলেন, এই ধূলি গোপীজনের পাদস্পর্শ পেয়েছে—এর তুল্য ঈপ্সিত বস্তু আর কি আছে এ সংসারে?'

এ লোকটি আর কোন জপতপ জানেন না। কেউ কোন খাদ্যবস্তু দিয়ে গেলে কিছু গ্রহণ করেন, কিছুবা নদীজলে নিক্ষেপ করেন। হেসে হেসে ডাকেন, 'আয় রে তোরা—কালীয় নাগের বাচ্ছারা—খেয়ে যা!'

কৃষ্ণপ্রাণের কেমন মনে হ'ল—এ-ই আদর্শ সাধক, সত্যকার তপস্বী।

তিনি করজোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন এই পাগলের সচেতন-

অবসরের।

অবশেষে এক সময় দৃষ্টি পড়েও।

নিকটে এসে একেবারে সেই পুত ধূলিলিপ্ত দেহেই সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'এই যে এসেছ! এসে পৌছে গেছ! আঃ, বড় আনন্দ হ'ল, বুক জুড়িয়ে গেল। বসো বসো, এই তাঁর চরণরেণুধন্য কালিন্দীতীরেই বসো।'

তার পর, অনেকক্ষণ ধরে ওঁকে নিরীক্ষণ ক'রে বলেন, 'তোমারই আশায় পথ চেয়ে বসে আছি বাবা। সংবাদ পেয়েছি। তোমার লক্ষ্য, তোমার এই আশ্চর্য সাধনার—বৈকুণ্ঠকে মর্ত্যের আলিঙ্গনে বাঁধার সাধনা—সংবাদ পৌচেছে আমার প্রাণে। বড় কঠিন পথ বাবা, সকঠোর তপস্যার চেয়েও কঠোর, দুশ্চর।'

আবারও খুব খানিকটা—অকারণেই হেসে নিয়ে যেন আপনমনেই বলেন, তবু পূর্বাচলের পানেই তো চেয়ে থাকতে হয় বাবা। আশা থাকতে নৈরাশ্যের দিকে তাকাবো কেন? স্বীকৃতি, আশার বাণী, নব অভ্যুদয়ের আশা চিরদিন পূর্ব থেকেই তো পশ্চিমে পৌচেছে। শুনেছি বহু দূর পশ্চিমের এক দেশে একজন বড় সাধক জন্মেছিলেন, তাঁরও ছিল তোমারই মতো সাধনা—ঈশ্বরকে পিতাজ্ঞানে ভজনা, ভালবাসায় সকলকে বুকে টেনে নেবার তপস্যা। সেখানকার অধিবাসীরা বহুদিন পর্যন্ত তাঁকে চিনতে পারে নি, মৃত্যুর পরও বহুকাল অবধি, কিন্তু তাঁর আবির্ভাবক্ষণেই এই পূর্বদেশ থেকে একদল সাধু গিয়ে তাঁকে প্রথম চিহ্নিত করেন, ঈশ্বরপ্রেরিত মহামানব বলে স্বীকৃতি দেন।'

তার পর বহুক্ষণ নীরব থেকে কি যেন ভাবলেন, খানিক নির্নিমেষ নেত্রে কৃষ্ণপ্রাণের চোখের দিক চেয়ে থেকে বলেন, 'তবে কি জানো বাবা, তাঁকে বহু-দূরে বাইরে কোথাও খুঁজে বেড়াতে হয় না। মানুষই ভগবান, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তিনি আছেন। শুধু তাঁকে জাগ্রত করার অপেক্ষা। ভালবাসার রসে সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে হয়, তবে তিনি জীবন্ত হয়ে ওঠেন। তবেই তো তাঁর ভালবাসা আদায় সম্ভব। অবশ্য হ্যাঁ, কখনও কখনও অহেতুক কৃপাতেও এসে ধরা দেন বৈকি! না, পাওয়া কঠিন নয়, কঠিন হ'ল চিনে নেওয়া, পাওয়াটা কোথা দিয়ে আসছে, কী ভাবে আসছে সেটা বুঝে পাওয়া। গল্পে আছে একটা লোক স্পর্শমণি যোগাড় ক'রে সব লোহাকে সোনা ক'রে নিয়ে অনেক ঐশ্বর্য সঞ্চয় করবে এই লোভে—পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছিল, হাতে লোহা,

পাথর নুড়ি তোলে আর ঠেকায়, সোনা হ'ল না দেখে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই করতে করতে পাগল হয়ে গেল প্রায়—কাজটা অভ্যাসে, নেশায় দাঁড়িয়ে গেল। কী হচ্ছে আর তাকিয়ে দেখে না। সত্যিই যেদিন সোনা হ'ল সে বুঝতেও পারল না, কবে কখন কোন্ স্পর্শমণির স্পর্শে তা হ'ল! তাই বলছি বাবা, জীবনের সে পরম লগ্ন না ব্যর্থ হয়ে যায়। পাবার জন্যেই শুধু ছুটে বেড়িও না, পেলে কিনা সে বিষয়েও হুঁশ রেখো।'

॥ ১৯ ॥

দীর্ঘ পথ, পথ চলার বিরাম নেই।

তীর্থ তো শুধু পথের ধারে ধারেই নয়, সারা পথই তো তীর্থ। প্রতিদিনই মনে হয় তীর্থস্নান ক'রে উঠছেন।

এই আশ্চর্য সন্ন্যাসী—যার রূপ, মিষ্ট ব্যবহার ও সকরুণ সস্নেহ কণ্ঠস্বর ইতিমধ্যেই প্রবাদে পরিণত হয়েছে এবং সে প্রবাদ হয়েছে বহুদূর বিস্তৃত—তিনি নিকটে আসছেন বা এসেছেন শুনে সহস্র সহস্র ঈশ্বরবার্তাতৃষাতুর ভক্ত ছুটে আসছেন দূর-দূরান্ত থেকে—তাঁদের সাহচর্য, প্রীতি ও শ্রদ্ধাই তো তীর্থস্নান।

বৃন্দাবন মথুরা—তারপর প্রয়াগ বারাণসী—এসব প্রসিদ্ধ তীর্থে স্থানীয় অধিবাসীদের নির্বন্ধাতিশয্যেই কিছু দিন ক'রে থাকতে হ'ল।

কাশী পণ্ডিতদের স্থান, বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদেরও—তাঁরা এলেন বিচার করতে, তর্ক করতে। প্রথম প্রথম নম্রতার সঙ্গে, নতি স্বীকার ক'রে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও—তাঁরা ছাড়তে চান না। অগত্যা বিচারবিতর্কে প্রবৃত্ত হ'তে হয়। সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম সাধুর কাছে তাঁরা পরাজিতও হন শেষ পর্যন্ত—কিন্তু এসব বড় তুচ্ছ, অসার বোধ হয়। এ বিজয়লাভে তো রুচি নেই কৃষ্ণপ্রাণের বরং কেমন বিতৃষ্ণাই বোধ হয়।

কেউ কেউ বিদ্রূপও করেন, 'তুমি তো বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী—তবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করো কেন?'

উনি হাসেন, বলেন, 'ভাই শাস্ত্রকথার শূন্যগর্ভ শব্দঝঙ্কারে ভুলো না, একটু ভিতরে প্রবেশ করো। কৃষ্ণ আমাদের কাছে ঈশ্বরের ধ্যানমূর্তি, ধারণার সহায়ক, আমাদের মানসিক আশ্রয়। ঈশ্বর সর্বগুণে আছেন, অথচ গুণাতীত।

যা কিছু এ ব্রহ্মাণ্ডের রূপ রস গন্ধ বর্ণ গুণ ভাবনা—সবই তাঁর সৃষ্টি। তাঁর ইচ্ছাতেই সব সৃষ্টি হয়েছে—এ কথা যদি মানো তো দেখবে তিনি সকল বিতর্কের অতীত। আমাদের মতো ক্ষুদ্র মূঢ় প্রাণীর কি শক্তি তাঁকে ধারণা করব? সেই জন্যে তিনি নিজে থেকে আমাদের ভাবনায় কল্পনায় ধরা দিয়েছেন। কৃষ্ণ তাঁর সেই প্রেমঘন স্বরূপ, এই রূপেই তিনি মানবের ভক্তি ও প্রেম আস্বাদন করতে চান। ব্রহ্মসংহিতায় আছে, "যিনি সর্ব জগতের আশ্রয়, পরমাত্মা পরব্রহ্ম, সৎচিৎ আনন্দমূর্তি; যিনি সকলের আদি, পরন্তু যাঁর আদি কিছু নেই: সর্ব প্রপঞ্চের কারণীভূত। মায়ারও কারণ যিনি—সেই পরম ঈশ্বর গোবিন্দই কৃষ্ণ।"*

এই সব পণ্ডিত তথা পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের চেয়ে সহস্রগুণে শ্রেয় ঐ সব দূরদেশাগত ভক্তলোকের সঙ্গ।

তারা শাস্ত্র জানে না, বিচার করে না, তর্কে জয়লাভের উচ্চাশা তাদের নেই—তাদের মনের মধ্যে একটিই ব্যাকুলতা, এই সাক্ষাৎ কল্পনায় ঈশ্বর সদৃশ সন্ন্যাসীর কাছে ভগবানের কথা শুনবে, ভগবানের সান্নিধ্যে পৌছবার পথের সন্ধান পাবে।'

তাই উনি যা বলেন সেই ভাবে অগ্রসরের চেষ্টা করে তারা প্রাণপণে।

তারা দীক্ষা নিতে চায়—উনি বলেন, 'নাম করো', তাঁকে ডাকো। তাঁকে স্মরণ ক'রে তাঁর শরণাগত হও, এ-ই দীক্ষা। আর কোন দীক্ষার প্রয়োজন নেই তোমাদের।'

তারা প্রশ্ন করে, 'তাঁকে কখন ডাকব, কি ক'রে ডাকব। আমাদের মন যে এখনও সংসারে বদ্ধ - মায়া মোহ কাম কামনা যে যায় নি এখনও।'

'ঐ নামেই সব বন্ধন কাটবে, মন মুক্ত হবে। আর ডাকা? যখন সময় পাবে, যখন মনে পড়বে—তখনই ডাকবে। শুদ্ধ হয়ে স্নান ক'রে কখন আসনে বসতে পারবে—সেজন্যে অপেক্ষা করো না। কাজের মধ্যেই মনে মনে জপ করবে। তাঁকে স্মরণ করলেই তো শুচি। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরিকাক্ষং স বাহ্যভ্যান্তরো শুচি—শোন নি এ মন্ত্র।

তারা তৃপ্ত হয়, নিশ্চিন্ত হয়।

---

* ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণং॥

এরাই ধন্য, ভাবেন কৃষ্ণপ্রাণ, হয়ত বা একদিন সার্থকও হবে, ব্রহ্মকে পাবে, ঈশ্বরে লীন হবে।

তিনি কি সার্থক হবেন কোন দিন? তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে? ঈশ্বরে লীন হতে চান না যে উনি। তাঁকে সেবা করতে চান, তাঁর সাহচর্য চান। জন্মজন্মান্তর ধরে এই লীলারস আস্বাদন করতে চান।

এই ভাবে চলে তাঁর ভক্তসঙ্গমে নিত্য তীর্থস্নান। ভক্ত বন্ধু শিষ্য—এরাই সাধুর আপনজন।

কেউ না ভুল বোঝে তাই বার বার সতর্ক ক'রে দেন, 'রাধাকৃষ্ণের প্রেম, গোপীদের প্রেমাকৃতি সাধারণ অর্থে প্রেম নয়। এর মধ্যে ইন্দ্রিয়সম্ভোগ নেই। দেহজ নয়—দেহাতীত। শুধুই আনন্দ, সেই আনন্দে ডুবতে না পারলে এ সাধনাই ব্যর্থ হবে।'

আবার হয়ত বলেন, 'তবু এ সাধনা অনেক সহজ সাধনা। নাম করতে করতেই, যদি ইচ্ছায় না ভেজাল থাকে, মন নিষ্কাম হ'তে বাধ্য। সব সাধনাই নির্মল, মানুষের মনে যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে আকুলতা না জন্মায়—সে পাঁকেই ডুবে থাকবে। পাঁকের ওপরে যে পদ্ম, যাতে কোন মালিন্য লাগে না—শুধুই সৌরভ আর মধু—সেখানে পৌছতে পারবে না।'

এই সব সময়গুলো একরকম আনন্দে থাকেন। এ যেন অন্য মানুষ।

আবার কখনও কখনও কেমন বিষাদে ডুবে যান।

হঠাৎ গিয়ে হয়ত কাউকে ধরে বলেন, 'তোমার এই সরল বিশ্বাস, তাঁকে পাবার জন্যে এ আকুলতা—আমাকে দিতে পারো না? আমার মনের এ সংশয় আর শঙ্কা যায় না কেন? কেন এই কুয়াশাটুকু কাটে না?'

মথুরাতে এক আশ্চর্য ভক্ত দেখেছিলেন।

না, মথুরাতে ঠিক নয়—গোকুল থেকে মথুরা আসার পথে।

চিরবাস পরিহিত একটি শীর্ণকায় লোক, যে বাসে লজ্জা নিবারিত হয় মাত্র যাকে বস্ত্র বলা চলে না কোনমতেই—এককালে নাকি সুলতানের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন, সে সব ছেড়ে এখানে এসে আছেন। জঙ্গল থেকে কাঠকুটো সংগ্রহ ক'রে এনে লোকালয়ে বিক্রী করেন, তবে পাঁচ পয়সা বা ঢেবুয়ার বেশী নয়। তা থেকে দৈনিক এক পয়সা মাত্র নিজের আহার ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করেন,

বাকী চার পয়সা এক 'চটি'ওয়ালা দোকানদারের কাছে গচ্ছিত রাখেন। আতুর, রুগ্ন অসহায় তীর্থযাত্রী দেখলে তাদের সেবা করেন, খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে সুস্থ ক'রে তোলেন—ঐ গচ্ছিত পয়সা থেকে।

কৃষ্ণপ্রাণ দেখেন মহা আনন্দে আছে লোকটি। দর্শনে যায় না, পূজার ধার ধারে না—এই দুঃখী পুণ্যার্থীদের সেবা ক'রেই তার আনন্দ।

ওকে দেখে কৃষ্ণপ্রাণের চোখে জল এসে গিছল।

প্রণাম করতে গিছলেন লোকটিকে, সে বাধা দিয়ে ওঁর পায়ে পড়ে পা দুটি জড়িয়ে ধরেছিল।

এ যদি তীর্থ না হয়—আর কোথায় কী তীর্থ আছে।

॥ ২০ ॥

কৃষ্ণপ্রাণ নীলাচলে ফিরে আসার পর এই প্রায় দু বছরের মরে-থাকা আনন্দের হাট আবার পূর্ণ গৌরবে বা পূর্ব গৌরবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

যেন সেই রূপকথার কোন্ রাজপুত্রের পাদস্পর্শে জেগে ওঠে নিদ্রিত এক বিশাল রাজপুরী।

আবার শুরু হয়ে যায় পল্লীতে পল্লীতে সেই অষ্টপ্রহর হরিনাম সঙ্কীর্তন—শ্রীকৃষ্ণ লীলাকীর্তন, সেই উদ্দাম উদ্দণ্ড নৃত্য।

স্থানে স্থানে সেই নাম-সুধা বিতরণ।

প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম জগবন্ধুর মন্দিরেও সেই কীর্তনের তরঙ্গ এসে লাগে—বা বলা যেতে পারে এখান থেকেই দূরে দূরান্তরে আঘাত জাগিয়ে প্রত্যাহত হয়ে ফিরে আসে।

স্বয়ং রাজা বা রাজপুত্র যাঁর পদাশ্রয় পাবার জন্য লালায়িত তাঁকে পূজারীরাও সমীহ করবেন বৈকি, শুরু হয়ে যায় আরতি দীর্ঘায়ত করার প্রতিযোগিতা, পূজা ত্রুটিহীন করার আপ্রাণ চেষ্টা।

বহুলোক দূর-দূরান্তর থেকে আসতে আরম্ভ করেন আবারও। সন্ন্যাসীকে দর্শন করার জন্য স্পর্শ করার জন্য লালায়িত তাঁরা। তাঁদের বিশ্বাস, ওঁর কাছেই স্বর্গের চাবি আছে, ওঁর দর্শন মাত্রই তাঁরা সর্ব কলুষমুক্ত জীবন্মুক্ত হবে। ওঁর উপদেশে মুক্তির দিশা পাওয়া যাবে।

উনি প্রকৃতি দর্শন করেন না সত্য কথা। প্রকৃতিকে সাধ্যমতো দর্শনও দেন না—পাদস্পর্শ তো কল্পনাতীত। তা নাই বা দিলেন, দূর থেকে উপদেশ শুনতে হরিনাম গান শুনতে তো বাধা নেই।

অনেকে আসে সর্বস্ব ত্যাগ করে। তাঁকে দেখেই যেন সংসার-বিমুখ হয়।

ওঁর এই তীর্থযাত্রার পথেই—যাওয়া আসা দুদিকের ভ্রমণেই—কত পরিবারের কি বিপুল পরিবর্তন হয়ে গেল। কত রাজপুত্র বা তদ্রূপ ধনীপুত্র ছিন্ন-কন্থা বৈরাগীর জীবনের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল। গৃহের কোন বন্ধনই তাদের বাঁধতে পারে না। বিপুল বিত্ত, সম্ভোগের অজস্র আকর্ষক ও উত্তেজক আয়োজন, গৃহে সুন্দরী বধূ—তা ব্যতিরেকেও তাদের পিতামাতা বিশেষ যত্নে আহরিত নির্বাচিত সুন্দরী স্ত্রীলোকের শৃঙ্খল পায়ে পরাবার চেষ্টা কি কিছু কম করেন? তবু এ সব কিছুই তাদের ধরে রাখতে পারে না। এ সব বিষবৎ বোধ হয় তাদের কাছে।

বরং এই সব ধনীর দুলালরাই কৃচ্ছ্রসাধন বেশি করেন। মনে হয় এমন কঠোর তপস্যা কৃষ্ণপ্রাণও করেন নি কখনও। আহার বিশ্রাম কোন দিকেই তাদের দৃষ্টি থাকে না।

এক জমিদার পুত্র—জমিদার না বলে রাজা বলাই উচিত, তেমনিই বিপুল বিত্ত তাঁদের, তেমনিই প্রতাপ—তাঁদের বংশের একমাত্র সন্তান রামচন্দ্র যোল বছর বয়সে প্রথম দেখেছিলেন কৃষ্ণপ্রাণকে, সঙ্গে সঙ্গেই সংসার-ত্যাগের আকুলতা জেগেছিল তাঁর মনে। পালিয়ে চলে এসেছিলেন। কৃষ্ণপ্রাণই অনেক বুঝিয়ে, বিস্তর উপদেশ দিয়ে বাড়ি ফিরতে বলেন। ছেলেটি তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত। তখন দু বৎসর সময় চেয়ে নেন কৃষ্ণপ্রাণ। বলেন, 'দু বৎসর আরও গৃহে থাকো, তার পরও যদি এ তীব্র বৈরাগ্য থাকে—আমি তোমার সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করে দেব।'

অতি অনিচ্ছায় রামচন্দ্র বাড়ি ফেরেন। তাঁর পিতা-পিতৃব্য হাতীতে ক'রে বহুসংখ্যক প্রহরী দিয়ে বাড়ি নিয়ে আসেন।

আগেই একটি সুন্দরী বালিকার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল রামচন্দ্রের, এবার তাকে আনিয়ে একত্র বাসের ব্যবস্থা করা হ'ল। তা ব্যতিরেকেও, পুরুষের মনে বন্ধন পরাবার যা কিছু পথ জানা আছে, তার সবগুলিই অবলম্বন করেন। নৃত্যগীত-পটীয়সী, ছলাকলায় অদ্বিতীয়া সুন্দরী বারাঙ্গনা আনান ওঁরা, তারা

সর্বদা ঘিরে থাকে কিশোর রামচন্দ্রকে—নানা ভাবে নানা সম্ভোগে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে।

কিন্তু রামচন্দ্র এ সর্বপ্রকার আয়োজনে বীতস্পৃহ থাকেন। বহির্বাটির একটি ঘরে নিঃসঙ্গ জীবন কাটে তাঁর—জপে আর ধ্যানে। আর কিছুটা কাটে হিসাবে কত দিনে প্রতিশ্রুত দু বৎসর বিগত হবে।

শেষ পর্যন্ত সে সময়ও পার হয়ে আসেন। এবার নীলাচলে যাবেন সংসার-ত্যাগ ক'রে, চিরদিনের মতো। কিন্তু এ হিসাব তাঁর অভিভাবকরাও রেখে ছিলেন। তাঁরা চেষ্টা করেন সর্বশক্তি প্রয়োগে তাঁদের বংশের একমাত্র সন্তানকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত করতে। তবে সংসারবিমুখ, যে প্রব্রজ্যায় কৃতসঙ্কল্প—তাকে বাধা দেবে কে? শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্রকে কোনমতেই সংসারে বেঁধে রাখা গেল না। কী ভাবে যে কয়েক শত প্রহরীর দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত ক'রে চলে গেলেন তা কেউ বুঝতেও পারল না।

অভিভাবকরা অবশ্য আবারও নীলাচলে গিয়েছিলেন, বলপ্রয়োগে ধরে এনে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখবেন এই উদ্দেশ্যে—কিন্তু রামচন্দ্র স্পষ্টই বলে দিল যে তাকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেলে সে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করবে।

অগত্যা তাঁরা নিরতিশয় দুঃখিত চিত্তে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

রামচন্দ্র বৈরাগী জীবনের প্রথম থেকেই যে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন, তা কৃষ্ণপ্রাণের পক্ষেও বিস্ময়কর।

ভূমিশয্যা; একমাত্র বহির্বাস্-সার—তা স্নানের পর দেহেই শুষ্ক হয়; ভিক্ষা সম্বল। সে ভিক্ষার সময়ও অতি সীমিত। প্রভাতে লক্ষ নাম জপ করার পর দর্শন পরিক্রমা প্রভৃতি সেরে বেলা তৃতীয় প্রহরে মন্দির প্রবেশের পথে নীরবে দণ্ডায়মান থাকেন। কেউ স্বেচ্ছায় ভিক্ষা দিলে তা গ্রহণ করেন এবং জীবনধারণের মতো খাদ্য পেলেই নিজের কুটিয়ায় ফিরে যান।

রাজপুত্র ভিখারী হয়েছে—এ সংবাদ রটিত হ'তে বিলম্ব হয় না। সূপকাররা সাগ্রহে এসে প্রসাদ ভিক্ষা দেয়—এবং দেয় উৎকৃষ্ট যা প্রসাদ, তাই। রামচন্দ্র কয়েকদিন দেখেই বুঝলেন এ একপ্রকার জুলুমই করছেন তিনি। আত্মপ্রবঞ্চনাও বটে। তিনি ওভাবে ভিক্ষাগ্রহণ থেকে নিবৃত্ত হলেন। এবার যে পন্থা অবলম্বন করলেন তা অনন্যসাধারণ, অলোকসামান্য।

আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদ বিক্রয়ের প্রথা। সূপকার বা সওয়াররা নিজ নিজ

প্রসাদ সেখানেই নিয়ে আসে, ক্রেতারা প্রয়োজন মতো তা সংগ্রহ করে। যা অবিক্রীত থাকে, গভীর রাত্রি পর্যন্ত দেখে পকাল বা পান্তা ক'রে রাখে। পরের দিন তা বিক্রী করার চেষ্টা করে। দরিদ্র লোকেরা স্বল্পমূল্যে কয়েকটি কড়ি দিয়ে তা কিনে নিয়ে যায়।

তথাপি, তৎসত্ত্বেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তখন তা সমাগত ভিক্ষুকদের দেওয়া হয়। তারও পরে যা থাকে—মন্দির-প্রাচীরের ওপাশে মাঠে ফেলে দেয় মালিকরা। সেদিকে লোকজন বিশেষ আসে না। এলেও মহাপ্রসাদ পদস্পৃষ্ট হওয়ার ভয়ে সে স্থান পরিহার করে। কখনও পথচারী গাভীরা আসে, তবে তারাও সব খায় না, অথবা গলিত অন্ন খেতে চায় না।

রামচন্দ্র সিংহদ্বার বা মন্দিরের প্রবেশপথ পরিহার ক'রে স্বর্গদ্বার বা প্রধান স্নানের ঘাটে দাঁড়াচ্ছিলেন ; সেখানেও তাঁর ত্যাগ ও তিতিক্ষার কাহিনী পৌছতে বিলম্ব হ'ল না। তীর্থস্নানার্থীরা দয়াবশত নয়—শ্রদ্ধাভরেই ভিক্ষা দিতে লাগল। কেউ বা করজোড়ে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষা নেবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল, কেউ বা উত্তম প্রসাদ কিনে এনে ভিক্ষা দিতে লাগল।

বিপন্ন তরুণ বৈরাগ্যব্রতী দৈবাৎই আনন্দবাজারের প্রাচীরপারে নিক্ষিপ্ত অর্ধ-গলিত মহাপ্রসাদের সংবাদ পেলেন। অতঃপর মহা আনন্দে নিশ্চিন্ত মনে সেই অন্ন পথ বা প্রান্তর থেকে সংগ্রহ ক'রে এনে দু-তিনবার ভাল ক'রে ধুয়ে গলিত অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট 'মাঝ' বা মধ্যের যেটুকু তখনও ভক্ষণযোগ্য থাকে সেইটুকুই লবণ সহযোগে আহার করতে লাগলেন।

অর্থাৎ প্রাণধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন।

ক্রমশ কৃষ্ণপ্রাণের কাছেও এই সংযম ও ত্যাগের কাহিনী পৌছল। তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে নামল আনন্দাশ্রুর ধারা। 'ধন্য, ধন্য' এই ধ্বনি করতে করতে তখনই ছুটলেন রামচন্দ্রের দীন আবাস, সামান্যতম পর্ণকুটিরের দিকে।

সেটা দিনের তৃতীয় প্রহর প্রায়—রামচন্দ্র তাঁর নিত্যকৃত্য শেষ ক'রে ঐ অর্ধ-গলিত অন্ন গ্রহণ করতে বসেছেন—গুরু ছুটে এসে তাঁর পাতা থেকেই দুই গ্রাস তুলে মুখে দিয়ে বললে, 'তোমার ত্যাগে, তোমার বৈরাগ্যে, তোমার তপস্যায় এই মহাপ্রসাদ অধিকতর সুস্বাদু অমৃতময় হয়ে উঠেছে। রামচন্দ্র, তুমি ধন্য !'

অতঃপর ওঁকেই যোগ্য পাত্র বিবেচনা ক'রে কৃষ্ণপ্রাণ বললেন, 'শ্রীবৃন্দাবন প্রভুর বাল্যের লীলাভূমি আজ বিস্মৃত, অবলুপ্তপ্রায়। তুমি সেখানেই যাও।

ব্রজবাসীরা দরিদ্র হলেও তোমাকে দুখানা রুটি আর একটু লবণ দিতে পারবেন। তোমার পুণ্যে ব্রজভূমি পুনঃসঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।'

এমন অনেক ব্যক্তিই ছুটে এলেন সর্বত্যাগী হয়ে—স্বেচ্ছায় অসীম দৈহিক কষ্ট বরণ ক'রে নিতে।

মনে হ'ল ঈশ্বরের জন্য এই ক্লেশ বরণেই তাঁদের আনন্দ বা সুখ বেশি।

গৌড় সুলতানের দুই মন্ত্রী এলেন, রাজারও অধিক, অপরিমিত ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে—পদব্রজে, ভিক্ষা করতে করতে—সে ভিক্ষাও প্রাণধারণের মতো। তাঁরা শুধু বিত্তশালী নন—বিদ্বান, পণ্ডিতও। অর্থশাস্ত্রে ন্যায়শাস্ত্রে পারঙ্গম—রাজ্য-শাসনে বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দূরদর্শী বুদ্ধিমান। এঁদের একজন পরবর্তীকালে সংস্কৃত কাব্য রচনায় ভারতবিখ্যাত হয়েছিলেন। এঁরাও সানন্দে, সাগ্রহে—ভূমিশয্যা, একাহার ; শীতকালে ছিন্নকন্থা সম্বল—এই কষ্টকর জীবনযাত্রা অবলম্বন করলেন।

এঁদেরও কৃষ্ণপ্রাণ বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন।

পরে শুনেছিলেন, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এক প্রায়-অলৌকিক কাহিনী তাঁর কানে এসেছিল—এর মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণের এক প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার ক'রে এনে নিজের ঝোপড়ায় রেখেছিলেন। প্রতিদিন প্রায় অপরাহ্ণে, মাধুকরীতে সংগৃহীত কয়েক টুকরা রুটি এনে সেই বিগ্রহকে নিবেদন ক'রে নিজে সে প্রসাদ গ্রহণ করতেন।

মাধুকরী অর্থাৎ মধুকর বৃত্তি, নানা স্থান থেকে সামান্য সামান্য ক'রে সংগ্রহ করা।

তখন ও দেশে অন্নর চল ছিল না। গম ছোলা বা যবের আটা মিশ্রিত ক'রে, অথবা শুধুই গম কি যবের আটার রুটি প্রধান খাদ্য ছিল। ব্রজবাসীরা তাই খেতেন, তাই ভিক্ষাও দিতেন। ভিক্ষার্থীরা শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ ক'রে গিয়ে দাঁড়াবে শুধু, ব্রজবাসীরা সাধ্যমতো নিজেদের খাদ্যের অংশ ভিক্ষা দেবেন—এই ছিল প্রথা, বোধ করি এখনও সে প্রথা কিছু আছে। তবে তখন সাধ্য ছিল সামান্য, অধিকাংশরই পুরো একখানা ক'রে রুটি দেবার সামর্থ্য ছিল না, আধখানা বা সিকিখানা শ্রদ্ধাভরে নিজের ললাটে স্পর্শ করিয়ে তাদের ঝোলায় ফেলে দিতেন।

তাও অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমে যেত, বৈরাগী সাধু বা ভিক্ষুকরা সেগুলি শীতে গ্রীষ্মে রৌদ্রে শুকিয়ে তুলে রাখতেন মাটির জালায় কি কলসীতে। বর্ষায় যখন মাধুকরীতে বেরোনো দুঃসাধ্য হ'ত—সেইগুলির কিছু বার ক'রে জলে ধুয়ে ভিজিয়ে রাখতেন—যার যেমন সঙ্গতি—শুধু লবণ কি গুড় কিংবা তার সঙ্গে দধি বা দুগ্ধ সহযোগে আহার করতেন।

[পরবর্তীকালে অন্নভোগের চলন হয়েছে—তবে তেমন প্রসাদ একজনকেই দেওয়া যায় এবং সেক্ষেত্রে বসিয়ে খাওয়ানোই রীতি। আরও পরে কুঞ্জে কুঞ্জে একাদশীর প্রসাদ থেকে পূর্ণ 'পারস' বা একজনের পেট ভরার মতো প্রসাদ—অন্ন ব্যঞ্জন রুটি পায়স—ভাঙ্গী ধোপা প্রভৃতি সেবকদের দেওয়ার রীতি হয়—অতিরিক্ত প্রাপ্য হিসাবে। এখন দেওয়া হয় কি না জানি না—তখন ধরে নেওয়া হ'ত পূজারী বা সেবাইৎরা একাদশীতে ফলাহারী হয়ে থাকবেন।]

রুটিই দেওয়া হ'ত—ব্যঞ্জন কি লবণ বা গুড়ের কথা কেউ চিন্তা করতেন না। সে যদি কারও প্রয়োজন হয় তো প্রার্থনা করবে। এই রাজভিখারী কারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করতেন না, নিজেরও প্রয়োজন বোধ করতেন না। রসনাকে সর্বপ্রকারেই দমন করেছিলেন। একদিন যেন মনে হ'ল স্বপ্নে দেখলেন—বিগ্রহ যেন তাঁর কাছে একটু লবণ প্রার্থনা করছে, বলছে, ও রে শুধু শুকনো রুটি আর খেতে পারি না।

স্বপ্নভঙ্গে সাধুর মনে হ'ল এ তাঁরই মনের গোপন ইচ্ছা। মন কই শাসন করলেন—অতিরিক্ত কয়েক সহস্র নাম জপ ক'রে—এবং বিগ্রহকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'ঠাকুর, আমার আত্মবৎ সেবা, আমি যা খাচ্ছি তাই তোমাকে দিচ্ছি। যদি সত্যই এর বেশি প্রয়োজন হয়—নিজে ব্যবস্থা ক'রে নাও।'

তখন যমুনা বহতা নদী ছিল, বড় বড় পণ্যবাহী নৌকাও যাতায়াত করত। এই স্বপ্নের কয়েক দিন পরেই এক বণিকের বিরাট কয়েকটি নৌকার বহর ঠিক এই সাধুর কুঠিয়ার কাছে এসে আটকে গেল। চড়া পড়ে নি, ওখানে তো জোয়ার ভাঁটার কোন প্রশ্নই নেই যে অকস্মাৎ জল কমে যাবে—তবে নৌকো আটকায় কেন?

ওঁরা অনেক দেখেও কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। চেষ্টাও বিস্তর করলেন, পারিশ্রমিক কবুল ক'রে লোকালয় থেকে বহু লোক ডেকে আনলেন—তারা জলে নেমে প্রাণপণে ঠেলতে লাগল—কিন্তু কোন নৌকাই এক চুল নড়াতে

পারল না।

এই সব ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে রাত্রি নেমে গেল। অগত্যা ঐখানেই রাত্রি যাপন করা ছাড়া কোন গতি রইল না। বণিক নিজের নৌকাতেই শুয়ে রইলেন।

প্রথম রাত্রিটা তো ছটফট্ ক'রেই কাটল—নিদারুণ দুশ্চিন্তায়, শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা এলে স্বপ্ন দেখলেন, এক প্রিয়দর্শন বালক এসে বলছে, 'কী করছ, এ নৌকা তোমরা কেউ নড়াতে পারবে না। এই নদীর পাড়ে এক পাতার ঝোপড়ায় এক সাধু আছে—তাঁর পায়ে গিয়ে পড়ো—তিনি হাত দিয়ে ছুঁলেই নৌকো চালু হবে। ওঁর একটি বিগ্রহ আছে—তার ভাল সেবা হয় না, ফেরার পথে তোমার লাভের টাকা দিয়ে একটা মন্দির করে দিও, আর যাতে ভাল সেবা হয় তার ব্যবস্থা করো।'

বণিকের কেমন মনে হ'ল, এ ঈশ্বরেরই নির্দেশ, নইলে এমন অকারণে এখানে এসেই বা নৌকা আটকাবে কেন?

তিনি ভোর হতেই চড়ায় উঠে গিয়ে সাধুর পায়ে পড়লেন, 'ঠাকুর রক্ষা করো। আমি বিরাট মন্দির ক'রে দেব। জমি জায়গা দেব।'

সাধু সব শুনে হেসে বললেন, 'আমার কোন প্রয়োজন নেই। তবে উনি যদি স্বপ্ন দিয়ে থাকেন, তাহলে ওঁকেই বলো। প্রতিশ্রুতি দাও—তাহলেই হবে। আমাকে কিছু করতে হবে না।'

বণিক তবু পীড়াপীড়ি করতে লাগল, 'আপনি দয়া ক'রে আমার নৌকায় একবার পদার্পণ করুন, তাহলে আমার জীবনরক্ষা হয়।'

পদার্পণের প্রয়োজন হ'ল না, সাধু গিয়ে স্পর্শ করতেই সব কখানা নৌকা দুলে উঠল।

সেবার সে বণিকের লাভও হ'ল প্রচুর। তিনি ফেরার পথে এখানে দেবতার মন্দির ক'রে দিলেন। সেবা যাতে ভালভাবে চলে—তার জন্যও ওখানের এক মহাজনের গদীতে প্রচুর অর্থ জমা ক'রে দিলেন।

হয়ত এ সবই জনশ্রুতি মাত্র। কৃষ্ণপ্রাণ প্রত্যক্ষভাবে এসব কিছুই দেখেন নি। তবে এঁদের ত্যাগ তিতিক্ষা তো জনশ্রুতি নয়। এঁদের কঠোর তপস্যা, একান্ত কৃচ্ছ্রসাধন তো চোখেই দেখছেন।

এঁরা পাবেন। এঁদের যা লক্ষ্য, ব্রহ্মকে লাভ করা, ঈশ্বরে লীন হওয়া তা সফল হবে। এঁরা তপস্বী।

কিন্তু তিনি? তিনি যে এ সিদ্ধি চান না। তাঁর যে উদ্বাহুবামনের মতোই অতিরিক্ত লোভ। তিনি চান সেই ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ভাবে মর্তের মৃত্তিকায় নেমে আসুন, তাঁর সেবা তাঁর প্রেম উপভোগ করুন।

এ কি কোন দিন সফল হবে?

অথচ এই জন্যেই তো কোন পাওয়াতে তাঁর আশ মেটে না, শান্তি পান না।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় প্রয়াগে এক সাধুর মুখে শোনা, এক স্থফী সাধকের লেখা ফার্সী বয়েৎ—

"না বা হিন্দ্ অস্ত্ অয়মন্দ্
ও না দরখতন—
আন কি খসম এ উ অস্ত্
ছায়া এ খে,স্তন্॥"

যার নিজের ছায়া (বা মনই) নিজের শত্রু, সে হিন্দোস্তানেই যাক্ আর তাতারেই যাক্ কোথাও সে নিরাপদ নয়—অর্থাৎ কোথাও তার শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই।

এ বুঝি কৃষ্ণপ্রাণের জন্যই রচিত।

॥ ২১ ॥

কোথাও যেন কোন দিশা না পেয়ে কৃষ্ণপ্রাণ সেই সাধারণ সাধনার পথই অবলম্বন করলেন।

এমনিই ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কৃচ্ছ্রতার অন্ত ছিল না—এখন তার মাত্রা বর্ধিত হল, সীমা অতিক্রম করল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ভূমিশয্যা তো ছিলই—শীতকালে তুষারশী-ল, গ্রীষ্মে অগ্ন্যুত্তপ্ত প্রস্তর-কুট্টিমেই শয়ন করতেন, অজিন বা অন্য লোমজ শয্যাও ত্যাগ করেছেন বহুদিন—এখন নিজে দেখে ইচ্ছা ক'রে কারাগার সদৃশ একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ বেছে নিলেন,

* অয়মন্দ্—নিরাপদ। দরখতন—তাতার।

যা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান এবং সর্ব দিকেই ওঁর অস্বাভাবিক দীর্ঘতা অপেক্ষা ন্যূন।

অর্থাৎ সে প্রস্তর-শয্যাতেও কোন স্বস্তি বা তৃপ্তি না থাকে। আরামের প্রশ্ন তো উঠছেই না, যেমন ভাবেই শয়ন করুন, পদসঙ্কোচন ভিন্ন সম্ভব নয়।

আহার্যেও কৃচ্ছ্রতার অবধি রইল না। চিরদিনই তাঁহার আহার ছিল পরিমাণে অতি অল্প। কোন প্রকারে জীবন-ধারণের মতো। এখন আরও কঠোর সংযমের ব্যবস্থা করলেন।

ভক্তরা তাঁকে কুঠিয়াতেই 'ভিক্ষা' দিয়ে যেতেন। প্রভুর মহাপ্রসাদ ভিন্ন কোন খাদ্যই তিনি সাধারণত গ্রহণ করতেন না। ফল—তাও বাল্যভোগের প্রসাদী ফলই খেতেন। কোন বিশেষ ভক্ত—যিনি অতিশয় আকিঞ্চন প্রকাশ ক'রে স্বহস্তে পাক ক'রে ভিক্ষা দেবার প্রার্থনা জানাতেন—একমাত্র তাঁর গৃহেই ইষ্টে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করতেন।

মহাপ্রসাদের ক্ষেত্রে সাধারণত কিছু কিছু পক্বান্ন—খাজা, পায়স, অমৃত-রসাবলী, ক্ষীর, মালপুয়া, মোহনভোগ প্রভৃতি থাকত, যার যেমন সাধ্য সেই মতো। সঙ্গী-সেবকরা সাগ্রহে সে উৎকৃষ্ট প্রসাদ গ্রহণ ক'রে পরিতৃপ্ত হতেন। কৃষ্ণপ্রাণও তা গ্রহণ করতেন—তবে সে সামান্য সামান্য, নামমাত্র। কোন কোনটা হয়ত জিহ্বার স্পর্শ মাত্র করতেন। তৎসত্ত্বেও, আয়োজন বিশেষে সে ভাবেও আহার সম্ভব হ'ত না, অবশিষ্টগুলি মাথায় ঠেকিয়ে পাত্রে নামিয়ে রাখতেন - সে প্রসাদের প্রসাদ গৃহস্থ বা সেবকদেরই সেবায় লাগত। তাঁরা চরিতার্থ বোধ করতেন।

তবে সব জড়িয়েও পরিমাণে একটি সাত-আট বৎসরের বালকের উপযুক্ত দাঁড়াত -তার বেশী নয়। যে প্রসাদ নিত্য তাঁর কুটিয়ায় পৌছত সেও এই ভাবেই সেবায় লাগত। সে ক্ষেত্রেও, যে দিন পূজারী বা সূপকাররা ভিক্ষা পৌছে দিতেন, বিশেষ যেদিন স্বয়ং রাজার ইঙ্গিতে বা নির্দেশে পাঠাতেন তাঁরা, অবশ্যই সেদিন আড়ম্বরটা বেশী হ'ত - উৎকৃষ্টতম প্রসাদই আসত—কিন্তু তাতেও কোনক্রমে পরিমাণে কোন ইতরবিশেষ হ'ত না।

এখন তাও পরিহার করলেন।

ভিক্ষাদাতাদের করযোড়ে জানালেন যে, অন্ন এবং যে কোন একটি ব্যঞ্জন ভিন্ন অপর কোন খাদ্য যেন না দেন তাঁরা। বিশেষত রসনাতৃপ্তিকর কিছু।

সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রকৃতিসংসর্গ সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর, পতনের প্রধান কারণ—এ সকলেই জানেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বিলাসও সর্বথা পরিহার্য,—সর্বপ্রকার বিলাসই—আলস্যবিলাস, রসবিলাস, শয্যাবিলাস--সব। আর এ সকলের মধ্যে রসনাবিলাসই বোধ করি অধিকতর ক্ষতিকর। লাম্পট্য বহু প্রকারের হয়; আহার্য-লোলুপতা রসনা লাম্পট্যই, তা প্রায় প্রকৃতিসংসর্গ জনিত লাম্পট্যের মতোই ক্ষতিকর।

প্রাণধারণের জন্যই আহারের প্রয়োজন। প্রাণ থাকলে ঈশ্বরকে স্মরণ মনন চলে; দেহ থাকলে তাঁর সেবায় তাঁর কর্মে লাগে। এই কারণেই সাধু ও তপস্বী বা সংস্বভাবের মানুষ আহার্য গ্রহণ করেন—গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাকে বলেছেন, "ব্রহ্মকর্ম-সমাধিনা"।

আহার্য-সঙ্কোচনের ফলে শীর্ণদেহ শীর্ণতর হতে থাকে। এক কালের নবনীত-কোমল দেহ অস্থিচর্মসার হয়। কঠিন পাষাণশয্যায় শয়ন প্রতিমুহূর্তে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে, তাই স্থির হয়ে থাকতে পারেন না। আর ক্রমাগত পার্শ্বপরিবর্তনের ফলে পাষাণের ঘর্ষণে ক্ষতের সৃষ্টি করে।

সেবকরা সজল চোখে বলেন, 'একটা তোশক অন্তত গ্রহণ করুন, এ ভাবে অকারণ ক্লেশ স্বীকার করতে থাকলে দেহেরই যে অবসান ঘটবে। গোবিন্দের সেবায় কি উৎসর্গ করবেন?'

ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন কৃষ্ণপ্রাণ।

বলেন, 'হ্যাঁ, শুধু তোশক কেন, একটা খাটও আন, রেশমাস্তীর্ণ শয্যার ব্যবস্থা করো—তাহলেই সন্ন্যাসের ষোলপুয়া পূর্ণ হয়। তোমরা কি চাও, আমি সন্ন্যাস বিসর্জন দিয়ে জনসমাজের ঘৃণা ও ধিক্কার কুড়িয়ে বেড়াই?'

এরপর আর সেবকরাই বা কি বলবেন, ভক্তরাই বা কি করবেন!

শেষ পর্যন্ত এক গৃহী ভক্তই মধ্যপন্থা অবলম্বন ক'রে এই সাংঘাতিক অবস্থার অবসান ঘটালেন।

কদলাপত্রের মধ্যদণ্ড ও দড়ির ন্যায় ছোটা গুলি পৃথক করে শুধু কোমল পত্র-ভাগগুলিকে চিরে চিরে সরু পাপড়ির মতো ক'রে তুললেন, সেইগুলিকেই রৌদ্রে শুষ্ক করে—কৃষ্ণপ্রাণেরই দুটি গৈরিক বহির্বাস সীবন ক'রে একটি খোল প্রস্তুত করলেন, তারপর তাতেই সেই শুষ্ক পত্রাংশগুলি পূর্ণ করে তোশকের মতো

তৈরী করা হ'ল। এবার আর এঁদের আকিঞ্চন এড়িয়ে যেতে পারলেন না, হার মানতে হ'ল।

কিছু দিন এইভাবে নীরব নিভৃত নিবিড় তপস্যায় নিরত থেকে আবার পূর্বের ন্যায় প্রকাশ্য সরব সাধনায় ফিরে এলেন।

তখনও প্রতি বৎসর রথের সময় বহু বাঙালী ভক্ত পুরীতে আসতেন। নবদ্বীপ শান্তিপুর কাটোয়া সপ্তগ্রাম হুগলী প্রভৃতি স্থান থেকে যাঁরা আসতেন তাঁদের ব্রজবালাদের মতোই দুটি উদ্দেশ্য—"এক পন্থ দৈকাজ দধি বেচন, হরি ভেটন"—একই সঙ্গে রথারূঢ় জগন্নাথ দর্শন ও তাঁদের প্রিয়তম সন্ন্যাসী কৃষ্ণ-প্রাণের সঙ্গে সৎসঙ্গে ও সৎপ্রসঙ্গে আনন্দে দিন যাপন। তাঁকে ও জগন্নাথকে একত্রে দর্শন তাঁরা 'গুরু-গোবিন্দ করা' বলে মনে করতেন, ভাবতেন জীবনের পূর্ণ সার্থকতা।

এঁরা এলে সন্ন্যাসীও আনন্দিত হতেন, কীর্তন-তরঙ্গে ভাসমান থাকতেন দিন রাত্রি। সে কীর্তনের মধুর-গম্ভীর নাদ এক এক সময় মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণ বিরাট দেউল সু-উচ্চ প্রাচীর ছাড়িয়ে দূরে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ত। পথিক গৃহস্থ ভক্তরা কেউ বা উচ্চৈঃস্বরে কেউ বা আপন মনে সে কীর্তনের প্রতিধ্বনি তুলতেন। ফলে হরিনামধ্বনি যেন সর্বদা নীলাচলের আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন ক'রে থাকত, ভগবৎপ্রেমের অমৃত সরোবরে মগ্ন থাকতেন এই পুণ্যধাম-বাসীরা—আগত কৃষ্ণপ্রেম-প্রয়াসীরা।

কৃষ্ণার্পিতচিত্ত কৃষ্ণপ্রাণ আর মহাপ্রভু জগন্নাথ কি অভিন্ন নন!

সঙ্গীতের সঙ্গে থাকত উন্মত্ত উদ্দাম নর্তন। সন্ন্যাসী সত্যই যেন উন্মত্ত হয়ে উঠতেন। তাঁর শ্রান্তি নেই, বিরক্তি নেই। অপর সকলে এক সময় হয়ত নিরতিশয় ক্লান্ত অপারগ হয়ে থেকে যেতেন, মৃদঙ্গ-মন্দিরা-বাদকরা অবসন্ন ভাবে বসে পড়তেন কিন্তু কৃষ্ণপ্রাণ একাকীই মুখে অবিরাম নামকীর্তন করতে করতে উর্ধ্ববাহু হয়ে উদ্দাম নৃত্য ক'রে যেতেন। সেই শীর্ণ তপস্বীর পদভরে মনে হ'ত শ্রীমন্দিরের বিপুল বিশাল প্রাঙ্গণের পাষাণতলস্থ ধরিত্রী কাঁপছেন, আকাশ-বাতাসে সেই নর্তন কম্পিত হচ্ছে। বাদ্য নেই, গীত আছে—হয়ত তখন সে অঙ্গহানির সংশোধন করতেন দর্শক বা শ্রোতাদের মধ্যে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা—তাঁরাই কেউ এসে মৃদঙ্গ, কেউ বা অপর বাদ্য যন্ত্র তুলে নিতেন—কীর্তনে নূতন

শক্তি সংযোজিত হ'ত। যাঁরা অভিজ্ঞ নন তাঁরা হাততালি দিতে দিতে সেই নামোৎসবে যোগ দিতেন।

এই বিরামহীন বিশ্রামহীন পরিশ্রমে শীর্ণদেহ প্রায়-উপবাসীর সর্বাঙ্গ বেয়ে স্বেদপ্রবাহ বইত, মধ্যে মধ্যে বসন্ত-সমীর-আন্দোলিত কদলীপত্রের মতোই কেঁপে কেঁপে উঠত সেই বরদেহ—কিন্তু নৃত্য বা গীত কোনটারই বিরতি ঘটত না।

সেবক ভক্তরা এক সময় জোর ক'রে ধরে বসিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গেই মূর্ছিত হয়ে পড়তেন। ঘাম মুছিয়ে বাতাস ক'রে মহাপ্রভুর স্নান জল মুখে দিয়ে তাঁর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনতে হ'ত। সে সময় বহুক্ষণ আর উঠে বসতে কি দাঁড়াতে পারতেন না, কথা বলারও শক্তি থাকত না। ভক্ত ও সুহৃৎরা প্রায় বহন ক'রে নিয়ে যেতেন কুঠিয়ায়। দু দিকে ঘনবদ্ধ দর্শনপিপাসু পথিকের দল হরিধ্বনি ও জয়ধ্বনি ক'রে তাঁকে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করতেন। হরিধ্বনিতে মুখে প্রসন্নতা দেখা দিত, ললাটে প্রশান্তি জাগত-আত্মস্তুতিমূলক জয়ধ্বনি শুনলে বিরক্তি বোধ করতেন। তবে তাতে ললাট ভ্রূকুটিবদ্ধ হ'ত—এই মাত্র। প্রতিবাদ কি তিরস্কার করতে পারতেন না, সেটুকু শক্তিও অবশিষ্ট থাকত না।

দেহের উপর অতিরিক্ত পীড়ন করলে সে দেহ এক সময় দেহীর উপর প্রতিশোধ তুলবে বৈকি!

রথযাত্রার পূর্বে যাত্রাশেষে তিন দারুমূর্তি যেখানে গিয়ে অবস্থান করবেন—সেই, ইন্দ্রদ্যুম্ন-মহিষীর স্থাপিত ও নামাঙ্কিত গুণ্ডিচা বাড়ি মার্জনা ক'রে শ্রীভগবানের বসবাসযোগ্য ক'রে তুলতে হ'ত। অবশ্য বৎসরকালের আবর্জনা দূর করার প্রাথমিক কার্য পূজারীরাই করতেন—এই সময়টা দৈত্যপতি পাণ্ডাদেরই প্রাধান্য, সেবার ভার তাঁদের উপরই পড়ত। এঁরা সেই শবরদের বংশধর—যাদের ঘর থেকে রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ওই দারুব্রহ্ম মূর্তি এনে এখানে স্থাপিত করেন।

কিন্তু তাঁদের মার্জনা প্রাথমিক, আরও একবার করার প্রয়োজন থাকত। সে প্রয়োজন সাধন করতেন ভক্তরা।

সাধারণ গৃহস্থের আবাসকে মালিন্য বা আবর্জনা কি ধূলি থেকে মুক্ত করা অনেক সময় কষ্টকর বলে মনে হয়, অনেকে সে কার্য হীন বলেও মনে করেন

কিন্তু এখানে এ পরিশ্রম আনন্দের, কিছুটা গৌরবেরও। ফলে গুণ্ডিচা মার্জন একটা উৎসবে দাঁড়িয়ে গেছে। অদ্যাপি এই উৎসবানন্দ বজায় আছে—সাধু-গৃহী-যোগী-বৈষ্ণব নির্বিশেষে এই উৎসবে যোগ দেন।

রথে আরূঢ় হওয়ার পূর্বে জগমোহন থেকে এই মূর্তিত্রয়ের অবরোহণ বা পহণ্ডিও এক বিশাল পর্ব। সে পথও নির্মল করা প্রয়োজন। সেখানে অগ্রণী হতেন রাজা স্বয়ং। এখন রাজ্য নেই কিন্তু সে পদবীধারী আছেন, রাজবংশের প্রধান যিনি, তিনিই এ পুণ্যকর্তব্য পালন করেন। গুণ্ডিচা বাড়ি পরিমার্জনার ভার ভক্তদের উপর।

এই গুণ্ডিচা-মার্জন কৃষ্ণপ্রাণের নিকট সত্যই সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হয়ে উঠত।

ওঁর প্রিয় ভক্ত ও সেবক এবং অপর বহু মঠের পূজারী বা সাধুদের সঙ্গে একত্রে কীর্তন, মৃদঙ্গ নৃত্য ও পরিমার্জনা চলত। জলকলস ও সম্মার্জনী নিয়ে তিনি বালকের মতো কৌতুক রঙ্গেও মেতে উঠতেন, প্রথম জীবনের মতোই চপল কৌতুক রঙ্গ, যাকে গ্রাম্যভাষায় বলে 'খুনসুটি' 'তামাশা'—নির্দ্বিধায় তাও করতেন।

এই মার্জনা শেষ হ'ত তৃতীয় প্রহরেরও শেষে। তখন নিজে আনন্দবাজারে গিয়ে সুপকারদের নিকট হতে প্রসাদ ভিক্ষা ক'রে এনে সমাগত স্বেচ্ছাকর্মীদের পরিতুষ্ট ক'রে আহার করাতেন, অবশেষে নিজেও সে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন।*

কীর্তন চলত এই উৎসবের সঙ্গেও—তার পরও যে কদিন প্রভু ওখানে অবস্থান করতেন—দিবাভাগে প্রথম প্রহরের মধ্যভাগ থেকে চতুর্থ প্রহর পর্যন্ত অবিরাম কীর্তন ও হরিনাম চলত। লোক বদল হ'ত—একদল দোহার বা বাদ্যকর ক্লান্ত হ'লে আর একদল তাদের স্থান অধিকার করতেন—কিন্তু নেতা বা মূল গায়েনের কোন ক্লান্তি কি অবসাদ দেখা যেত না। আহার-নিদ্রার প্রয়োজন, ক্ষুৎপিপাসা যেন সে উচ্চ হরিনামধ্বনির প্রাচীন উল্লঙ্ঘন ক'রে তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না।

একবার এই কীর্তনোৎসবের মধ্যেই আবার একটি আঘাত পেলেন ঈশ্বর-সেবাকাঙ্ক্ষী প্রেমিক সন্ন্যাসী। একটিও বুঝি নয়, দুটি বলাই উচিত।

---

* কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত, শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মশাইয়ের অন্তর্ধানের কাল অবধি, এই গুণ্ডিচা মার্জনের আনন্দ-হুল্লোড়ের পর সমস্ত স্বেচ্ছাকর্মীদের বাবাজী মশাই প্রসাদ খাওয়াতেন। ঠিক বর্তমানে কি হয়—আমার জানা নেই। —লেখক

তবে সেটি এত মর্মান্তিক নয়।

প্রথমটিতেই ব্যর্থতার, সেই সঙ্গে প্রবঞ্চিত হওয়ার তীব্র দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন।

রথের সময় সেটা। প্রথামতো গুণ্ডিচাবাড়ির ভিতরে ও বাহিরে কীর্তন মহামহোৎসব চলছিল। নৃত্যও এ উৎসবের অঙ্গ। এ নৃত্য অন্তরের প্রেমানন্দে বুঝি আপনিই উৎসারিত হয়, 'নৃত্য করছি' এ জ্ঞানও থাকে না তাঁদের।

সেদিন সে নৃত্যের নায়ক ছিলেন সোমেশ্বর নামে একটি উড়িয়া যুবা। রূপবান, যথার্থ নৃত্য-পারদর্শী। ভক্তিমান, কীর্তনেও পটু। নৃত্য কীর্তনের সঙ্গেই চলে!

তবু, ভাবাবেগে নৃত্য করলেও নৃত্যরীতি কখনও লঙ্ঘিত হয় না। সেটা বুঝি স্বভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। তাঁর সে অসামান্য দক্ষতা সকলেরই চোখে পড়ে। অথচ, সে সময়কার আবেগও মিথ্যা নয়, প্রেমের একাগ্রতা ও তন্ময়তা থেকেই সে আবেগের জন্ম।

ইদানীং সোমেশ্বরকে কৃষ্ণপ্রাণের অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের মধ্যেই তাঁকে গণ্য করা হ'ত। যে দিন বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে চারিদিক থেকে নাম-সঙ্গীতের সরোবর রচিত হ'ত সেদিন অন্য প্রধান ভক্তদের সঙ্গে এক দলের নায়ক রূপে কীর্তন ও তদঙ্গ নৃত্য পরিচালনা করতেন।

এইদিন সোমেশ্বর ছিলেন কৃষ্ণপ্রাণের সঙ্গী, সন্ন্যাসীর অতি নিকটে, প্রায় পাশাপাশি কীর্তন করছিলেন—যথারীতি নৃত্যের ভঙ্গিমাসহ।

সেদিন তাঁর সজ্জাও ছিল অপরূপ, ভুবনমোহনের মতোই ভুবন ভুলানো।

দর্শকদের মধ্য থেকেই কোন ভক্ত বা শৃঙ্গারী পূজক - তাঁকে পীত বসন পরিয়েছিলেন, পীত উত্তরীয়ও ছিল—ক্রমশ তা স্বেদসিক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দ অঙ্গসঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি করছিল—কোন ভক্ত তা উন্মোচন ক'রে সেই নৃত্যের মধ্যেই কটিবদ্ধ ক'রে দিয়েছে। কণ্ঠে স্বর্ণচম্পকের গুঞ্জামালা ; ললাট চন্দনচর্চিত ; উন্নত সুঠাম নাসিকায় গোপীচন্দনের তিলক। চন্দনলেখা শ্রমজলে অনেকখানি বিগলিত বিধৌত হ'লেও যেটুকু তার চিহ্ন অবশিষ্ট আছে—চারুললাটে তাই এক আশ্চর্য সুষমার সৃষ্টি করেছে।

কীর্তন ও নৃত্যের মধ্যেই সোমেশ্বর এক সময় বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গিমায়

নৃত্য আরম্ভ করলেন। কটিতট ঈষৎ বঙ্কিম, একটি পা আর একটি পায়ের উপর ন্যস্ত—তাতেও নৃত্যের বিরাম নেই—দুটি সুডৌল হাত বংশীধারণের ভঙ্গিমায় উন্নত—সবটা মিলে মোহ সৃষ্টিরই তো কথা।

প্রেমোন্মত্ত মহাসাধকের চোখে সেই মুহূর্তে কল্পনা-বাস্তব, এই পরিবেশ, মন্দির, অগণিত দর্শক—সব একাকার হয়ে যায়। তিনি অকস্মাৎ সোমেশ্বরের কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে ঘন ঘন চুম্বন করতে থাকেন, আর তার মধ্যেই অশ্রু-আবেগ-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'এলে? এসেছ? সত্যই কি তোমাকে পেলাম? তোমার নামামৃত তুমিই পান করছ, বিতরণ করছ? তৃপ্ত তুমি? আনন্দিত?'

বলতে বলতেই তিনি সোমেশ্বরের পায়ের কাছে বসে পড়ে তার পায়ে চুম্বন করতে চেষ্টা করেন।

সোমেশ্বরের যেন স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে যায়। একটা তন্দ্রার ঘোর থেকে জেগে ওঠেন। তিনি শিউরে ওঠেন। তিনিও বসে পড়ে বাধা দেন, গুরুর পায়ে মাথা রাখতে চেষ্টা করেন।

সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্নভঙ্গ হয়ে যায় কৃষ্ণপ্রাণেরও।

প্রচণ্ড, মর্মান্তিক একটা আঘাত পান।

মনে হয় বুকটা শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাবে এখনই।

যদি সত্যিই শ্রীকৃষ্ণ হবে ও—তবে ও আমাকে ভালবাসে না কেন! কেন ভক্তি করতে চায়?

কেন, কেন এভাবে আমাকে প্রবঞ্চিত করে আমার প্রিয়তম, এমন বার বার!...

শ্রান্ত, আশাভঙ্গে আরও দুর্বল সন্ন্যাসী প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েন। ভক্তরা ধরাধরি করে নি'য়ে এসে নিকটবর্তী বলগণ্ডী উদ্যানের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছায়াঘন স্থানে শুইয়ে দেন, ব্যজন করতে করতে মৃদুকণ্ঠে কৃষ্ণনাম শোনাতে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণপ্রাণ কতকটা প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে প্রকৃতিস্থ, সম্বরণ ক'রে উঠে বসলেন, কিন্তু আর কীর্তনের মধ্যে ফিরে গেলেন না। বেশ কিছুটা সময় মৌন-মুদিত-নেত্র হয়ে বসে থেকে যেন এক উত্তাল আবেগসমুদ্রকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

তারপর কতকটা কৈফিয়ৎ দেবার মতোই বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণর চরণ চুম্বন ক'রে যে আনন্দ—তা ব্রহ্মানন্দ থেকে শতগুণে শ্রেষ্ঠ।'

আবারও কিছু পরে বলেন, 'যাঁরা যোগের দ্বারা ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ করেন, তাঁরা এই মাধুর্যের স্বাদ পান না। তাঁরা হতভাগ্য।'

নবদ্বীপ থেকে ওঁর এক প্রধান সেবক তথা সঙ্গীর ছোট ভাই এল রথের সময়। নাম শিবনাথ। কিশোর বালক—পনেরো ষোল বছর বয়স। শান্ত নম্র স্বভাব, সদা প্রফুল্ল মুখ।

দেখা মাত্র স্নেহে প্রাণ ভরে উঠল কৃষ্ণপ্রাণের।

আহা-হা! এ যেন সেই গোষ্ঠপতি শ্রীকৃষ্ণ।

এই রকমই বুঝি রূপ ছিল তাঁর এ বয়সে।

প্রণত বালককে সবলে বুকে টেনে নিয়ে তার শিরশ্চুম্বন করলেন। তারপর সেবক [illegible]কে ডেকে বললেন, 'একে সযত্নে লালন ক'রো। যেন কোন প্রকার দুঃখ বা ব্যথা না অনুভব করে। খাওয়াদাওয়ার যত্ন নিও। নিতান্ত বালক, লজ্জায় নিজে থেকে খাওয়ার কথা বলতে পারবে না। তোমরা সচেতন থেকে প্রয়োজনমতো সময়ে সময়ে এর আহারের ব্যবস্থা করবে।'

তারপর আবারও বলেন, 'এর অগ্রজের প্রতি আমার স্নেহ যেমন, তেমনি সম্ভ্রম ও ভক্তির ভাবও আছে। সে আমার সাধনার মর্ম বোঝে, সে সম্বন্ধে সদা সতর্ক। সে বিষয়ে আমার অভিভাবক সে। কিন্তু শিবনাথের কথা স্বতন্ত্র, এর সঙ্গে ভক্তি কি ভক্ত ওসব কিছু নয়—শুধুই প্রীতির, স্নেহের সম্[illegible]।'

এই ভাবে বার বার সতর্ক ক'রে দিয়েও যেন তৃপ্তি হয় না তাঁর। নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না।

তাঁর দৈনিক সার্ধ ছয় প্রহর ব্যাপী অবিচ্ছিন্ন সাধক জীবনের মধ্যেও তিনি বালকের সংবাদ নেন। এক-একদিন নিজের ভোজনপাত্র থেকে স্বাদু প্রসাদ তুলে স্বহস্তে ওকে খাইয়ে দেন, ওর আহারের সময় সেখানে এসে দাঁড়ান; সেবকদের নির্দেশ দেন এটা ওটা এনে দিতে। কখনও কোন সুমিষ্ট প্রসাদ—মালপুয়া বা ক্ষীর বা অমৃতরসাবলী—নিজেই পরিবেশন করেন।

বস্ত্রাদি ঠিকমতো আছে কিনা, শয্যার ব্যবস্থা ঠিক হচ্ছে কিনা সে সংবাদ নেন।

শিবনাথ অভিভূত হয়ে পড়ে। এমন যত্ন এমন স্নেহ বোধ করি সে নিজের পিতামাতার কাছেও পায় নি।

বিশেষ এই সর্বজনপূজ্য মহাপুরুষ—স্বয়ং দোর্দণ্ডপ্রতাপ নৃপতি যাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান রূপে দেখেন, এঁর দাসানুদাস হ'তে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করেন—এমন প্রশ্রয় ও অতন্দ্র স্নেহদৃষ্টি দিয়ে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখছেন—এ তো অচিন্তিত সৌভাগ্য !

সেও প্রাণপণেই—অন্তরের সহিত এ ঋণ শোধের চেষ্টা করে।

সর্বদা কাছে কাছে থাকে, ভালও লাগে এঁর কাছে থাকতে, এঁর কথা শুনতে। রাতে কৃষ্ণপ্রাণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অঙ্গসংবাহন, পদসেবা করে। গুরু অবশ্য বেশীক্ষণ থাকতে দেন না, কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন ক'রে ওকে উঠিয়ে দেন, শয়ন করতে বলেন।

তবে তা সবদিন হয় না। একান্ত শ্রান্ত সন্ন্যাসী নিজেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। বালক নিশ্চিন্তে, সানন্দে সেবা ক'রেই যায়, খুব মৃদু লঘু হস্তে।

তারপর সেও একসময় নিদ্রাতুর হয়ে সেইখানেই—ওঁর পায়ের কাছে, কোন দিন বা পায়ের ওপরেই ঢলে পড়ে।

সন্ন্যাসীই অল্প পরে সচেতন হয়ে ওঠেন।

অবচেতনে—বালকের না কষ্ট হয়, অতি পরিশ্রমে তার বিশ্রামের না ব্যাঘাত ঘটে—সে চিন্তা তো থাকেই, সেইজন্য শ্রান্তি দুর্বলতাজনিত আচ্ছন্নতা গভীর নিদ্রায় পরিণত হতে পারে না।

কিন্তু শিবনাথ ঐ ভাবে পায়ের কাছে বা কোলের কাছে নিদ্রিত হয়ে পড়েছে দেখলে আর তার ঘুম ভাঙান না। বরং শীত করতে পারে এমন আশঙ্কা বোধ করলে নিজের একমাত্র কন্থাখানি দিয়ে সযত্নে তাকে আচ্ছাদিত ক'রে বাকী রাতটুকু নগ্নগাত্রেই থাকেন।

পরে বালকের নিদ্রাভঙ্গ হ'লে সে মৃদু অনুযোগ করে, কিছু অপ্রতিভ হয় সম্ভবত—তবে খুব একটা অপরাধী বোধ করে না। অনুতাপও প্রকাশ করে না। বরং যেন এই করুণা বা স্নেহ সে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করে, আস্বাদন করে।

অনুতাপে নয়—আনন্দেই তার চোখের দুই কূল প্লাবিত ক'রে অশ্রুধারা নামে।

সে চেষ্টা করে অধিকতর সেবা দিয়ে এই মহাঋণ শোধ করতে।

আনন্দিত হন, উপভোগ করেন কৃষ্ণপ্রাণও।

এক-একসময় এ চিন্তাও মনে দেখা দেয়—তবে কি তাঁর প্রাণসত্তাই এসেছেন ?

কিন্তু তা কেমন ক'রে হবে !

এ তো ওঁকে পিতার মতোই দেখে।

ওঁরও যে এই উদ্বেলিত স্নেহ –সে তো বাৎসল্য ব্যতীত আর কিছু নয়।

বাৎসল্য প্রেমও বহু আকাঙ্ক্ষিত—তাঁর বন্ধু-উপদেষ্টা রাজ-দার্শনিক উচ্চাঙ্গের সাধনার মধ্যে এ রসকে স্থান দিয়েছেন।

এই সাধনাতেই তো বদ্ধ হয়ে ওঁর প্রিয়তম গোপের গৃহে ধরা দিয়েছিলেন, স্বেচ্ছায় বন্ধন শাসন মেনে নিয়েছিলেন – যশোদার স্তন্যপান ক'রে তাঁকে গর্ভ-ধারিণীর উপরে স্থান দিয়েছিলেন।

ভাল, খুবই ভাল—কিন্তু উনি যে চান কান্তারূপে তাঁকে ভজনা করতে, সেবা করতে –প্রেমিক, দয়িতরূপে তাঁকে পেতে।

হয়ত, যদি শিবনাথ ওঁর কাছে আবদার করত, স্নেহের অত্যাচারে অস্থির ক'রে তুলত, ওঁকে শাসন করত—কিছুটা মন ভরত।

তা পারে না শিবনাথ। সে চিন্তা তার সুদূর কল্পনারও অতীত।

সে ওঁর প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত, অভিভূত।

সে চায় ওঁর দাসানুদাস হয়ে থাকতে।

ওঁর সামান্যমাত্র সেবার সুযোগ পেলেই নিজেকে কৃতার্থ বোধ করে সে।

সে ওঁকে সাক্ষাৎ জগন্নাথ বলেই মনে করে। যেন তার গুরু ও ঈশ্বর একাকার হয়ে গেছেন এই একটি মাত্র মানুষের মধ্যে।

তৃপ্ত হন বৈকি, বালকের এই অকৃত্রিম প্রেমে।

তবু ক্ষোভ, একটা হতাশাও বোধ না ক'রে পারেন না।

তিনি যে পূর্ণভাবে চান, পূর্ণতা চান—এ তো সে বস্তু নয়।

॥ ২২ ॥

বালকটি কোথা থেকে কেমন ক'রে সন্ন্যাসী কৃষ্ণপ্রাণের এত কাছে এসে গেল — তা কেউ বুঝতেও পারে নি অনেক দিন পর্যন্ত। অত লক্ষ্যও করে নি। যখন সচেতন হয়ে উঠল ভক্ত-সেবকের দল, তখন তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, ঘনিষ্ঠতা বহু-

দূর অগ্রসর হয়ে গেছে।

উড়িয়া বালক, ব্রাহ্মণ, দশ-বারো বছর বয়স ; শ্যামবর্ণ—আর একটু ঔজ্জ্বল্য থাকলে উজ্জ্বল-শ্যাম বলা যায়। শ্যামসুন্দর নাম।

এসব তথ্য সংগ্রহ করতে বিলম্ব হয়েছে। এসব এবং আরও ব্যক্তিগত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বেশ কিছুদিন পরে। ওর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার পরে তো আরম্ভই হয়েছে খোঁজখবরের।

নিঃসম্বল নির্বান্ধব বিধবার পুত্র। কেউ নেই, কিছুই নেই। মা স্থানীয় এক মন্দিরের দেবগৃহ ও নিত্যপূজা বা ভোগের ধাতুপাত্র মার্জনা ক'রে দুটি প্রাণীর জীবিকার সংস্থান করেন। তাতেও সব হয় না। ভিক্ষা দুঃখ ক'রে বাকীটা পূরণ করতে হয়।

তবু, অনুনয় বিনয় ক'রে একটি চতুষ্পাঠীতে ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন ওর মা মালতী। ব্রাহ্মণ-সন্তান অধ্যয়ন অধ্যাপনা পর্যন্ত যদিবা অগ্রসর হতে না পারে—যজন যাজন চালাবার মতো কিছু বিদ্যা তো প্রয়োজন।

কিন্তু সেটুকুও হয় নি। পাঠচর্চা আদৌ অগ্রসর হয় নি।

অধ্যাপক মালতীকে ডেকে বলেছেন, 'তোমার ছেলে তো মা যথেষ্টই মেধাবী, পাঠ একবার মাত্র বলে দিলেই ওর আয়ত্ত হয়ে যায়—কিন্তু এদিকে যে ওর কিছু মাত্র আগ্রহ নেই। তিরস্কার করলে, অনুযোগ করলে আমার মুখের ওপরেই বলে দেয়, "এসব বৃথা শাস্ত্রের কচকচি, কতকগুলো শব্দ-ঝঙ্কার আমার ভাল লাগে না। যে আমাকে ভালবেসে ভালবাসার পথে আসল যা শিক্ষা তাই দেবে, সে-ই আমার যথার্থ গুরু, আমি তাকেই খুঁজছি।" একে কতদূর কি শিক্ষা দেব বলো।'

দুঃস্থা সহায়হীনা বিধবা জননী চোখের জল ফেলেন শুধু, ছেলেকে শাসন করতে পারেন না।

তিনিও এই ক'বছরেই ওকে চিনে নিয়েছেন। জোর ক'রে ওকে দিয়ে কিছু করানো যাবে না। আর শাসন করবেনই বা কি ক'রে—তিরস্কার করতে গেলেই দু'হাতে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে আদর ক'রে আদর আদায় ক'রে ওঁকে অভিভূত ক'রে দেয়, কটুবাক্য মুখে আসে না।

শ্যামসুন্দরের যেন সকলই অদ্ভুত। বা বলা চলে সব দিকেই অসাধারণ। সৃষ্টিছাড়া ছেলে সে।

আচরণ কথাবার্তা অনেক সময়ই দুর্বোধ্য বোধ হয়, হেঁয়ালির মতো শোনায়। কখনও বা মনে হয় ঐ বালকের দেহে কোন প্রবীণ জ্ঞানীর আত্মা নবজন্ম গ্রহণ করেছে। আবার এক এক সময় যখন আদরে আবদারে অত্যাচারে ওঁকে অস্থির করে তোলে তখন মনে হয়—বালকও নয়, এখনও শিশুই থেকে গেছে।

শাস্ত্র পাঠে মন নেই কিন্তু দেবতায় ভক্তি আছে।

তবে সে ভক্তিও ওর নিজস্ব পথ ধরে চলে।

মার সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে গর্ভদেউলের সম্মুখের প্রাঙ্গণ বা জগমোহনের এক কোণে বসে নির্নিমেষ-নেত্রে চেয়ে থাকে বিগ্রহের দিকে। ভিতরের অন্ধকারে সামান্য একটি প্রদীপের শিখার কম্পনে যে আলোছায়ার রহস্য—তার মধ্যেই কি জীবন্ত দেবতাকে খোঁজে? কে জানে।

তাও সেও যতক্ষণ পূজারী এসে তাঁর নিত্যসেবার নিয়মকার্যগুলি না আরম্ভ করেন তখন পর্যন্তই। স্নান বা অবকাশ আরতি ইত্যাদি শুরু হয়ে গেলে যেন বিরক্তমুখে উঠে বাইরে চলে যায়। সে সময় কোন কোন দিন দ্রুত হেঁটে সমুদ্র-তীরে যায়, সেখানের বালুময় বেলায়, প্রখর রৌদ্র বা অশ্রান্ত বর্ষণ অগ্রাহ্য ক'রে, একদৃষ্টে সেই তরঙ্গভঙ্গের দিকে চেয়ে থাকে।

কেউ বলে ছেলেটা পাগল। কেউ বলে ওকে কোন দুষ্ট আত্মা ভর করেছে।

এক এক সময় মালতীরও যে সে আশঙ্কা হয় না তা নয়। সেই সব ক্ষণে শ্যামসুন্দর যেন অন্তর্যামীর মতো ওঁর মনোভাব বুঝে নিয়ে হেসে আশ্বাস দেয়, 'ভয় নেই মা, ভয় নেই। আমি পাগল হয়ে তোমার জ্বালা বাড়াব না। একদিন বুঝবে তোমার পুণ্যবলেই আমি তোমার কাছে এসেছি।'

কিছুই বোঝেন না মালতী। এটাও হয়ত প্রলাপ।

তবে বহু দুঃখের মতো এই দুশ্চিন্তাও ইষ্টকে নিবেদন ক'রে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করেন, তার উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করার প্রয়াস পান।

ছেলে যে আজকাল এ মন্দিরে আসে না, তা জানতেন। কিন্তু সমুদ্রতীরেও যে আর যায় না সেটা জানতেন না। অত মাথাও ঘামান নি। তাঁর ছেলে কোন কুসংসর্গে মিশবে না এটুকু বিশ্বাস ছিল। সমবয়সী কারও সঙ্গেই ওর খাপ খায় না। সাধারণ ছেলেরা বা তরুণ যুবকরাও—যা সব আলোচনা করে তা ওর ভাল লাগে না। তাই সে নিঃসঙ্গ, বহুর মধ্যেও একা।

শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা পায় নি শ্যামসুন্দর—চতুষ্পাঠীর সঙ্গে সম্পর্ক অতি অল্প দিনেই শেষ হয়ে গেছে—এত কথাই বা সে শিখল কোথা থেকে। ওঁদের এই মন্দিরের পূজারী মধ্যে মধ্যে কোন বিশেষ পার্বণ উপলক্ষে কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন—সে সময় শ্যামসুন্দর গিয়ে পড়লে বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে। মালতীর মনে হয়—ইচ্ছা ক'রেই সে যায় কখনও কখনও।

এই রকম অনভিপ্রেত ব্যাপার ঘটাবে বলেই।

পূজারী অপদস্থ হন, সেই কারণেই মালতীর লজ্জার শেষ থাকে না। তাঁর ভয়—পূজারী না মনে করেন এই ঘটনায় তাঁর কোন হাত আছে, পূজারীর এই অপদস্থ হওয়াটা তিনি উপভোগ করেন।

অথচ বার বার অনুযোগ করেও যে তিনি ছেলেকে নিরস্ত করতে পারেন না।

শ্যামসুন্দর এত জানলই বা কি ক'রে।

বক্তা যখন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করেন—তখন হয়ত কোথাও কোন শব্দ বাদ পড়ে বা উচ্চারণে ত্রুটি ঘটে—তখন মুচকি হাসে বা মধ্যে মধ্যে তালুতে জিহ্বার সংযোগ ঘটিয়ে পরিতাপমূলক শব্দ করে। কিন্তু ব্যাখ্যার সময় সরব হয়ে ওঠে, শব্দের অর্থ বা অপপ্রয়োগ ধরে—শ্লোকের ভাবার্থ ভুল প্রমাণ করতে চায়—পূজারীর অপ্রতিভতার শেষ থাকে না। অথচ, যথেষ্ট অপমানিত বোধ করলেও বেশি কিছু বলতে পারেন না। কারণ মনে মনে অন্তত স্বীকার করতে বাধ্য হন যে এই বালকের ব্যাখ্যাই যথার্থ।

তাঁর এই নীরবতাতেই মালতীও সে সত্য অনুভব করেন। চমকে ওঠেন। তাহলে কি গোপনে অন্য কোথাও গিয়ে পড়াশুনো করে!

মধ্যে মধ্যে ক্রুদ্ধ হয়ে তর্জন করেন, 'তুই কি আমার অন্ন বন্ধ করতে চাস?'

ছেলে নিশ্চিন্ত ভাবে বলে, 'ইস! তোমাকে কাজ ছাড়িয়ে দিয়ে দেখুক না। আমি সবাইকে বলে দেব ওর বিদ্যার দৌড়। বলব ভুল উচ্চারণ করে, বিকৃত ব্যাখ্যা—পূজার মন্ত্রও ঠিক বলতে পারে না - আমি ধরিয়ে দিই তাই আমার মাকে তাড়িয়েছে! দেখো, ও মুখ্য বামুনটা কিছু বলতে সাহসই করবে না।'

তাই, এই ছেলে যে ঐ আশ্চর্য সন্ন্যাসীর সঙ্গ নেবে, তার অনুগামী হয়ে

পড়বে—মালতী কখনও ভাবেন নি।

ছেলে যে দেববিগ্রহ বা সমুদ্রের দিকে চেয়ে গভীরভাবে কিছু ভাবার চেষ্টা করে—সে বিষয়ে ওর মা নিঃসন্দেহ হয়েছেন অনেক দিন আগেই। ঠিক কি চিন্তা করে তা অত ভেবে দেখেন নি—অত দূর ভেবে দেখার মতো তাঁর জ্ঞানও ছিল না, অবসরও না—তবে সে চিন্তা কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পথ ধরে চলে, এমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা ক'রে নিয়েছিলেন।

তবে তার সঙ্গে ওর বর্তমান আচরণ—একে নেশা বললেও অত্যুক্তি হয় না—কোনক্রমেই তো মেলে না।

প্রচণ্ড নামকীর্তন, উদ্বাহু উদ্দণ্ড নৃত্য—এ তো সবটাই বাহ্য উচ্ছ্বাস। গভীরে ডুবে যাবার পরিবেশ এ তো নয়। এর মধ্যে তাঁর ছেলে আকৃষ্ট হয় কিসে?

এ সংবাদ অবশ্য আগে কেউ দেয় নি। তিনি নিজেই সচেতন হলেন ওর অনিয়মিত গৃহে ফেরায়। তাঁদের এই মন্দির থেকে দুজনের মতোই প্রসাদ পাওয়া যায়—কিন্তু ওখানের সব কাজ সেরে প্রসাদ নিয়ে গৃহে আসতে তৃতীয় প্রহরও উত্তীর্ণ হয়ে যায় এক-এক দিন। বস্তুত এই একবারই আহার করেন তাঁরা। রাত্রে প্রসাদ আসে সামান্যই—তা শ্যামসুন্দরই কিছু খায়, যা সামান্য উদ্বৃত্ত থাকে তাও পরের দিন তারই জলযোগে লাগে। 'সহ্য হয় না' এই অজুহাত দেখিয়ে মালতী রাত্রের আহার বন্ধই ক'রে দিয়েছেন।

এই সময়ও যদি শ্যাম না ফেরে—ক্লান্ত ক্ষুধার্ত জননী বসে থাকে—অষ্ট-প্রহরের পর এই একবার মাত্র আহার—তাও বিলম্বিত হবে।

এই বিবেচনাতেই—যেখানেই যাক ঐ সময়ে সে ঠিক ফিরে আসে, বরং এক একদিন তাকেই অপেক্ষা করতে হয়—কোন কারণে বাড়তি কাজের চাপে মালতীর বিলম্ব হয়ে গেলে।

কিন্তু এখন এই নিয়মেরই ব্যতিক্রম ঘটতে লাগল। কোন কোন দিন সন্ধ্যা হয়ে যায়—অপরাহ্ণিক কাজের জন্য অভুক্ত অবস্থাতেই মন্দিরে চলে যেতে হয় মালতীকে।

অনুযোগের উত্তরে বলে, 'না না। মন্দিরেই ছিলাম। অন্য কোথাও যাই নি।'

তার পর বলে, 'এক আশ্চর্য সন্ন্যাসী এসেছেন গৌড় থেকে, তিনি প্রতিদিন শ্রীমন্দিরে বহুক্ষণ ধরে নামকীর্তন করেন। কি আশ্চর্য তাঁর গলা—সবাই পাগল

হয়ে যায়। কেউ কেউ বলে স্বয়ং ভগবানই শিক্ষা দিতে ভগবানের নাম গান করছেন।…আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই রঙ্গই দেখি। অত খেয়াল থাকে না কত সময় গেল।'

আবার বলে, 'এত ভীড় জমে যায় শেষের দিকে—সবাই তো খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে ভগবানের নাম শুনতে আসে—গান না থামলে বেরুনো যায় না।'

এ সন্ন্যাসীর কথা মালতী আগেও শুনেছেন। এর কণ্ঠে এমনই নাকি জাদু—বহু বালক-কিশোর-তরুণ-যুবাকে ঘরের বার করেছে, রাজা রাজপুত্রকে ভিখারী করেছে। সন্ন্যাসের কাঙাল হয়ে ওঠে তারা—গৃহের সহস্র সুখ, পিতামাতার স্নেহ, কিশোরী রূপসী বধূর বন্ধন—কিছুই তাদের ধরে রাখতে পারে না।

এ তাঁর ছেলেকেও শেষে সন্ন্যাসী করবে নাকি!

তাঁর যে একমাত্র সন্তান। ভবিষ্যতের আশাভরসা অবলম্বন বলতে ঐ এক।

উদ্বেগের সীমা থাকে না। কিন্তু কেমন ক'রে বাধা দেবেন তাও ভেবে পান না। অবসরও যে বড় স্বল্প। বহু কাজ এই দুটি হাতে সারতে হয়।…

তবু, শেষ অবধি স্থির থাকা যায়ও না।

প্রতিদিনই যখন এমনি বিলম্ব ঘটতে লাগল, তখন আর নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব হয় না।

ছেলেও তো সারাদিন বলতে গেলে অভুক্ত থাকে। সকালে খাওয়ার মধ্যে কোন কোন দিন এক গাল 'পকান্ন' প্রসাদ, কিম্বা সাধারণত যা থাকে, এক আধটু মিষ্ট প্রসাদ—মোহনভোগ, খাজা, সে নামমাত্র। এতে ঐ ছেলের কি হয়। এখন উঠতি বয়স, বেশী করে খাওয়ার কথা।

অগত্যা পূজারীর কাছে বিস্তর অনুনয় বিনয় মিনতি ক'রে—সামান্য কিছুক্ষণের অবসর চেয়ে নিয়ে শ্রীমন্দিরেই গেলেন একদিন।

লোকারণ্য, জনসমুদ্র বলাই উচিত। তা ভেদ ক'রে এই আকর্ষণের কেন্দ্র-বিন্দুতে পৌছনো যাবে কি?

শেষে, প্রাণের দায়েই কতকটা, সকলকে ঠেলে সরিয়ে কোনমতে এগিয়ে গেলেন। সকলেই মুগ্ধ অভিভূত—কীর্তনরসে আপ্লুত বলেই অত কেউ লক্ষ্য করল না, বুঝল না। কোন কটূক্তিও তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল না। এমন কি একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক অগণিত পুরুষকে ঠেলে এগিয়ে গেল—তাতেও কারও বিরক্তি প্রকাশ পেল না। আসলে এদের কারও কোন

বাহ্যজ্ঞানই নেই।

কিন্তু সে কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে বুঝি তাঁরও চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

শীর্ণ দীর্ঘদেহ এক মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকবহির্বাসধারী সন্ন্যাসী আপনহারা হয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণের নামগান ক'রে যাচ্ছেন।

রূপযৌবন হয়ত এককালে ছিল, বয়সের হিসাবে আজও থাকার কথা—কিন্তু কিছুই নেই আর। তবু কি যে আছে—মনে হচ্ছে জ্যোতিঃ দিয়েই সেই অস্থিসার দেহ গঠিত, যেন কোন এক অগ্নি থেকে এ দেহ সংগ্রহ করা, সে অগ্নি হয়ত অন্তরেরই, তপস্যার—তবু তা প্রতিনিয়ত তাঁকে বেষ্টন করে আছে। এ যেন চলন্ত প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখাই। প্রভেদের মধ্যে এতে দাহ নেই, মাদকতা আছে। স্নিগ্ধ শান্ত পবিত্র অগ্নি—একে অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না।

ছেলেকে খোঁজার কথা মনেও রইল না মালতীর। তিনিও যেন কেমন বিহ্বল মূর্চ্ছাহত হয়ে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য। নিজের অজ্ঞাতসারেই ওষ্ঠ দুটি কম্পিত হতে লাগল, একসময় সেই নামও উচ্চারিত হ'ল তা থেকে।

অবশেষে একসময়—প্রাণপণ শক্তিতেই যেন নিজেকে সম্বরণ করলেন।

ফিরে যেতে হবে। কর্মে বদ্ধ। জীবিকার জন্যই সে কর্ম। নিজের ও পুত্রের জীবনধারণের মতো দু'মুষ্টি অন্ন—তাও পাবেন না, যথাসময়ে তাদের কাজ সেরে দিতে না পারলে।

চেয়ে দেখলেনও। কিন্তু এর মধ্যে কোথায় খুঁজবেন! সন্ন্যাসীকে ঘিরে আরও কিছু প্রবীণ ভক্ত—দোহার ও বাদ্যকর—যেন এক প্রাচীর রচনা ক'রে রেখেছে। তার পরই তো এই জনতরঙ্গ, ঐ প্রাচীরে আছড়ে পড়তে চাইছে—

এর মধ্যে সে শীর্ণ বালককে কোথায় খুঁজে পাবেন?...

ব্যাকুলভাবে চাইতে চাইতে একসময় চোখে পড়ল। আছে সে, কাছেই আছে।

মন্থর গতিতে গায়কের দল অগ্রসর হচ্ছে; মন্দির পরিক্রমাই উদ্দেশ্য, এর মধ্যে কয়েকবারই হয়ত হয়ে গেছে। গায়কদলের সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত শ্রোতারাও চলেছে তেমনি মন্থর গতিতে, এক পা এক পা ক'রে—তারই মধ্যে সেও আছে, শ্যামসুন্দর।

সে নামগান করছে না। নৃত্যেও নিরত নয়—সে শুধু পলকহীন নেত্রে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ঐ সন্ন্যাসীর দিকে। চোখে জল নেই, ভঙ্গিতে ভক্তি-

বিহ্বলতা নেই—অন্য শ্রোতা বা দর্শকদের মতো উন্মত্ত হয়ে ওঠে নি। নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা তাও বোঝা যায় না তাকে দেখে। জীবনলক্ষণ বলতে কেবল ঐটুকু—পায়ে পায়ে অগ্রসর।

আশ্চর্য এই—সেই ঘনীভূত মানুষের মধ্যেও—কীর্তন-নায়ক ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে যেখানে অন্য ভক্তদের কোন প্রকার ব্যবধান সম্ভবই নয়—সেখানেও, তার মধ্যেও যেন একটু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলেছে ঐ বালক। সকলেরই আগে যাওয়ার আকৃতি বা চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন ব্যক্তির আঘাত যেন তার গায়ে লাগছে না—যেন সকলেই, ওর সেই ধ্যানমগ্নতা পাছে কারো রূঢ় আঘাতে নষ্ট হয় সেই ভয়ে, প্রাণপণে তার সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলেছে।

এদিকেও, বলতে গেলে সন্ন্যাসীর অতি নিকটেই আছে কিন্তু তাঁকেও স্পর্শ করার কি ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছে না। মনে হচ্ছে নিজের চারিদিকে একটা ব্যবধানের বেষ্টনী রচনা ক'রে রেখেছে সে—এই চলার মধ্যেই। কী দেখলেন কে জানে—তবু যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েই কর্মস্থলে ফিরে গেলেন মালতী।

এখানেও সে আপন চিন্তাতেই ডুবে আছে, আপন হিসেবনিকেশ—যেমন অন্যত্র, বিশেষ শ্রীমন্দিরে বা সমুদ্রতীরে থাকে।

এ কীর্তন-সাগরে প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত সকলকে অভিভূত প্লাবিত করলেও তাঁর বালক পুত্রকে বিচলিত করতে পারে নি।

সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে সেরকম কোন লক্ষণ ওর মধ্যে নেই।

আবার সে নিশ্চিন্ততার ভিতর একটা আশঙ্কাও মনে উঁকি মারে—সত্যই কি কোন প্রবীণ জ্ঞানীর আত্মা দেহ ধারণ ক'রে এসেছে তাঁর গর্ভে?

এত নিজস্ব বিচার বিবেচনা, চিন্তার উপাদান এই বয়সেই কোথায় পেল সে?

সাধারণ মানুষের ক্রিয়াকর্ম পূজাপাঠ ভক্তি—সকলের সম্বন্ধেই যেন একটা ঔদাসীন্য বা অবহেলা। কেন?

॥ ২৩ ॥

অন্তরঙ্গতা না হোক—ঘনিষ্ঠতাটা একদিন হয়ে গেল আকস্মিক ভাবেই।

যে প্রধান ভক্ত বা অনুচরের দল সর্বদা যেন একটা বেষ্টনীতে ঘিরে রাখত, তারা কোন বাধা দেবার সময়ই পেল না।

শ্রাবণের শেষ, ঝুলন পর্ব চলছে। উৎসবসজ্জায় মন্দির আর মন্দিরের দেবতা অপরূপ রূপ ধারণ করেছে। পুষ্প কদলাকা এবং সোলার কাজে যে এমন সৌন্দর্য আনা যায় পাষাণ দেউলে আর দারুমূর্তিতে—তা চাক্ষুষ না দেখলে বিশ্বাস করা তো কঠিন বটেই, বোধ করি কল্পনাতেও আনা যায় না। সব চেয়ে—মনে হয় দারুব্রহ্মদেবেও সে উৎসবের রঙ লেগেছে, মেতে উঠেছেন তিনিও। মনে হচ্ছে কাষ্ঠও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

মেতে উঠেছেন সন্ন্যাসী কৃষ্ণপ্রাণও। প্রভুর আনন্দেই যে তাঁরও আনন্দ।

মহাপ্রভুর এই ভুবনমোহন রূপসজ্জা—প্রদীপশিখার নর্তনে ছায়াতে আলোতে যা সজীব হয়ে উঠেছে - মনে হচ্ছে কণ্ঠের গুঞ্জামালা কোন অদৃশ্য মধুর বাতাসে হিল্লোলিত হচ্ছে, দৃষ্টিতে যেন মদির কৌতুক—সব মিলে সন্ন্যাসীর প্রেমোন্মত্ততা বাড়িয়ে দিয়েছে।

ফলে উপবাসক্লিষ্ট এই ক্ষীণদেহে কতটা উত্তেজনা আবেগ ও পরিশ্রম সহ্য হয়, সে হিসাব আর ছিল না। প্রভাতের নিজকৃত্য জপধ্যানাদি উষাতেই সম্পন্ন হয়ে গেছে- তখনই বেরিয়ে পড়েছেন তিনি শ্রীমন্দিরের উদ্দেশে, তাঁর মধুর গম্ভীর কণ্ঠের নামগানে পদে পদে কীর্তনের দল সংগঠিত হয়েছে, ছুটে এসেছে সঙ্গী অনুচর সেবক এমন কি পথিকের দলও—সে কীর্তনে যোগ দিতে। সেবক বিষ্ণু যাত্রার প্রাক্কালে একটু প্রসাদ মুখে দিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে কণামাত্রই মুখে দিয়েছেন—বস্তুত উপবাসীই আছেন তখনও পর্যন্ত।

সময় বড় কম অতিবাহিত হয় নি এর ভিতর।

তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, অপরাহ্ণ সমাগতপ্রায়। অন্য সঙ্গীরা কেউ কেউ অবসন্ন হয়ে বসে পড়েছেন মধ্যে মধ্যে—সমাগত নামকীর্তন-পিপাসুদের মধ্যে থেকে কোন কোন সজ্জন ডাবের জল এনে মুখের কাছে ধরতে তা পান করেছেন—প্রধান গায়ক-নর্তক সোমেশ্বরকে তো রাণী স্বয়ং ডাবের সঙ্গে মুখে মিষ্ট প্রসাদও দিয়েছেন—কিন্তু কৃষ্ণপ্রাণের বিরামও নেই বিশ্রামও নেই। তিনি বাহ্যজ্ঞানহীন, উন্মত্ত।

তবে দেহ দেহই, জীববিজ্ঞানের নিয়মে বাঁধা। তার অত্যাচার সহ্য করার সীমা আছে—একসময় অতর্কিতেই তা ভেঙে পড়ল। মাথা ঘুরে মূর্ছিতের মতো পড়ে যাবার উপক্রম হ'ল।

ঠিক সেই সময়টাতে কেউ একেবারে পাশে ছিল না।

প্রস্তুতও ছিল না কেউ এমন ঘটনার জন্য। কৃষ্ণপ্রাণের অস্থি দধীচির মতোই বজ্রকঠিন বুঝি ; তাঁর দেহ মানবাতীত কোন উপাদানে প্রস্তুত ক্লান্তি ব্যাধি জরা কোনদিন তাঁর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারবে না—এমনিই একটা ধারণা হয়ে গিছল।

শ্যামসুন্দরও একেবারে নিকটে ছিল না।

তবে সে লক্ষ্য করছিল। একদৃষ্টেই চেয়ে ছিল, লক্ষ্যও রেখেছিল।

দেহ টলছে, কণ্ঠস্বর জড়িমাচ্ছন্ন হয়ে আসছে—অর্থাৎ সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে—এটা সে বুঝেছিল। তাই পতনের উপক্রম মাত্রেই সে এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল। বাধাও ছিল না, কোন এক আশ্চর্য কৌশলে অথবা দৈবক্রমে—জনতার ঐ বিপুল ঘনবদ্ধতার মধ্যেও নিজেকে একক রাখছে সে এই ক'দিনই।···

পতনের প্রথম বেগটা সম্পূর্ণ ঐ বালকই সামলে নিল। তবে অত দীর্ঘ দেহকে বেশীক্ষণ ধরে রাখা হয়ত সম্ভব হ'ত না—বা, সযত্নে, ধীরে ধীরে—আঘাত না লাগে পাথরের ওপর পড়ে, এমনভাবে—শুইয়ে দেওয়া।

তবে তার প্রয়োজনও ছিল না। অনুগামী প্রধান সহচররা সেই, প্রায় এক নিমেষপাত সময়ের মধ্যেই এসে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে সে বরদেহ ধারণ করেছে—বালকের হাতও সরিয়ে দিতে বিলম্ব হয় নি।

অতঃপর কিছুদূরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। বাতাস করা, স্বেদ-মোচন, শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভুর পকাল ভোগের 'তোড়ানি' বা আমানি ঈষৎ পান করানো—যাতে তৃষ্ণা নিবারণের সঙ্গে কিছু খাদ্যও দেহে যায়—এক কথায় সেই অবসন্ন মূর্ছাতুর দেহে চেতনার সঙ্গে ঈষৎ শক্তি ফিরিয়ে আনার কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি ঘটে নি।

এর মধ্যে—উদ্বেগাকুল সঙ্গী ও ভক্তবৃন্দের ঠেলাঠেলিতে—সে বালকের খোঁজ আর কে রাখবে!

সদাসতর্ক অন্তরঙ্গদের সামান্যমাত্র অসতর্কতায় যে মহাসর্বনাশ হয়ে যেতে পারত, ঐ অজ্ঞাতপরিচয় বালকটির জন্যই তা হয় নি—লজ্জিত অনুতপ্ত সঙ্গীরা এ তথ্য বিলুপ্ত করার জন্যই ব্যস্ত, ব্যগ্র। তাঁরা সে বালকের খোঁজ করবেন কি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন তা সম্ভব নয়।

শুধু কৃষ্ণপ্রাণ সামান্য একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলে—তখনও উঠে বসার মতো শক্তি আসে নি দেহে—একবার প্রশ্ন করলেন, 'কে আমাকে প্রথম ধরেছিল বলো

তো? সে কোথায়?'

রঘুনাথ বললেন, 'কি জানি, গান আর হবে না দেখে সে বোধ হয় বাড়ি চলে গিয়ে থাকবে। সে বালক পরিচিত কারও সন্তান নয়, চিনি না তাকে। তবে এ ক'দিন আসছে এটা লক্ষ্য করেছি।'

'বালক!' কৃষ্ণপ্রাণ যেন একটু বিস্মিত হলেন। 'আমি চেয়ে দেখতে পারি নি—তবে আমার মনে হ'ল উচ্চাঙ্গের ভক্ত কেউ হবেন—তেমনিই পুলকানুভূতি হয়েছিল, তেমনিই শিহরণ জেগেছিল দেহে—ভক্ত-সংস্পর্শে যেমন অনুভূত হয়।'

অনাবশ্যক বোধেই সম্ভবত কেউ এ কথার কোন উত্তর দিলেন না।

তবে রঘুনাথ আচার্যের অনুমান সত্য নয়।

সে বালক গৃহে ফেরে নি। গান বন্ধ হয়েছে বলে ফিরে যাবে, এই কীর্তন গানে এমন আসক্তি তার ছিল না, থাকার কোন কারণ নেই। প্রধান কীর্তনীয়া সম্বন্ধেই তার আগ্রহ, কৌতূহল।

কৌতূহল অবসানে ফিরে যাওয়ারই কথা হয়ত। সাধারণ কোন অল্পবয়সী বালক হ'লে তাই যেত—সেও তখনও পর্যন্ত অভুক্ত ক্ষুধার্ত—তা যায় নি।

তবে সবাইকে ঠেলে সরিয়ে এদের মধ্যে গিয়ে নিজের পরিচয় দেবার মতোও সাধারণ সে নয়। এই তুচ্ছ কৃতিত্বের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করা কি কৃতজ্ঞতা দাবি করার মতো প্রবৃত্তিও তার নেই।

সে কিছু দূরে গিয়ে লক্ষ্মীর মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে স্থিরভাবেই দেখছিল এঁদের। তারপর কৃষ্ণপ্রাণ আরও একটু সুস্থ হতে যখন সকলে ধরাধরি ক'রে তুলে প্রায় বহন ক'রে তাঁর কুঠিয়ার উদ্দেশে যাচ্ছেন তখন দূর থেকেই তাঁদের অনুগমন করেছে।

আজ সে প্রভাতে যাত্রাই করেছে মন স্থির ক'রে—দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। এ ঘটনা না ঘটলেও সে গৃহে ফিরত না, সন্ন্যাসীরই অনুগমন করত।

মাকে বলে আসা যায় নি। মা কাঁদাকাটা করতেন, তাকে ছাড়তেন না। তবে প্রতিবেশিনী এক বৃদ্ধাকে বলে এসেছে—'ক'দিন আর আমি ঘরে ফিরব না, মাকে বলে দিও। মা না ভাবে—খাওয়াদাওয়া না বন্ধ ক'রে দেয়। আমি যেখানে যাচ্ছি খাওয়ার অভাব হবে না।'

এ-ই মাত্র। আর কোন তথ্য জানায় নি ইচ্ছে ক'রেই।

ঘটনাস্রোত বা ভাগ্যস্রোত তাকে কোন্ পথে নিয়ে যাবে তা তো সে নিজেও জানে না।

সন্ন্যাসী তাঁর কুঠিয়ায় পৌছে আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবেন এই ইচ্ছা ছিল।

সন্ধ্যা আগত—সান্ধ্যকৃত্য না ক'রে কিছু আহার করা অকর্তব্য। জগন্নাথের প্রসাদ সর্বদা সর্বঅবস্থায় গ্রহণ করা যায়—তা তিনি জানেন কিন্তু সান্ধ্যকৃত্য না সারলেও অপরাধ হবে—এমনি একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। মনে স্বস্তি পাবেন না সে কৃত্য সমাপন না করলে।

তা ছাড়া, বিষ্ণুও বলেছে, 'মহাপ্রসাদ আছে সকলের মতোই—কিন্তু রাজার সূপকার বলে দিয়েছেন, এখনই মধ্যাহ্ন ধূপের ভোগ লাগবে, ভোগ সরা মাত্র তিনি পাঠিয়ে দেবেন। যদি এখনই প্রসাদ না পেতে চান তাহলে সেই প্রসাদই সেবা করবেন।'

সেই ব্যবস্থাই স্থির হয়েছে, কৃষ্ণপ্রাণ জপে বসবেন—কুঠিয়ার বাইরে কিছু বচসার শব্দ পাওয়া গেল। একদিকে পরিচিত কণ্ঠস্বর সব—ওঁরই অনুরাগী অনুগামীর দল- আর একদিকে একটি বালককণ্ঠ, বাঁশীর স্বরের মতোই সুমিষ্ট এবং তেমনই তীব্র।

কিন্তু তখন সঙ্কল্প ক'রে নিয়মসেবায় বসেছেন, জপে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। কোন প্রশ্ন উত্তরের সময় নয় সেটা। মন পূজা জপে নিবিষ্ট হ'লে আর কোন শব্দ কর্ণগোচর হয় না। তবু কথাটা মনে ছিল। সাধারণত থাকে না। জপে মন দিলে আর সব প্রসঙ্গই স্মৃতি থেকে মুছে যায়—কেউ স্মরণ করিয়ে না দিলে মনে পড়ে না—তবু আজ মনে ছিল।

বোধ হয় তাঁর মন তেমনভাবে অন্তর্মুখী হতে পারে নি। কেন? সে তাঁর কাছেও দুর্বোধ্য।

জপের মালা কণ্ঠলগ্ন ক'রে বাগ্বিতণ্ডাটা কিসের জানতে চাইলেন কৃষ্ণপ্রাণ।

সোমেশ্বর এসে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'সেই ছেলেটা, যে আপনাকে তখন ধরতে গিয়েছিল- সে ভেতরে আসতে চায়।'

ধীর ভাবে প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণপ্রাণ, 'তার পর?'

'কত ক'রে বোঝালাম আমরা', রুষ্ট কণ্ঠে শিবনাথ বলে উঠল, 'সন্ন্যাসীর

কুঠিয়াতে প্রবেশ করতে নেই, সে সম্ভব নয়। তদ্ব্যতীত আপনি নিরতিশয় ক্লান্ত, এখন কথা বলারও অবস্থা নেই—কিন্তু সে এসব কোন কথাই শুনতে প্রস্তুত নয়। তার কি স্পর্ধা, বলে যা শোনবার আমি তাঁর মুখ থেকেই শুনব, তোমরা কে? সে ঐ বাইরেই অনড় হয়ে বসে আছে, বলছে আমি দেখা না ক'রে যাবো না, যদি সারারাত এখানে বসে থাকতে হয় তাই থাকব। দরকার হয় তো—এমনি আরও অনেকদিন অনাহারে ধরণা দিয়ে অপেক্ষা করব তাঁর—তিনি দেখা না দিয়ে থাকবেন কেমন ক'রে দেখি!'

সোমেশ্বর আবারও পূর্ব বক্তব্যের সূত্র গ্রহণ করেন, 'ব্রাহ্মণের ছেলে, গলায় উপবীত রয়েছে দেখছি—কিন্তু কোন বিদ্যাভ্যাস কি শাস্ত্রচর্চা করেছে বলে মনে হয় না। মূর্খ তো বটেই—উদ্ধত আর দুর্বিনীতও।...থাক বসে, কত দিন উপবাস ক'রে থাকতে পারে দেখি!'

না না, ছিঃ!' কৃষ্ণপ্রাণ বলেন, 'ছেলেমানুষ, অকারণে ওর ওপর রূঢ় হয়ো না।...আর, ধরে ফেলতে গিয়েছিল বলছ কেন, ধরে ফেলেছিল—সেটুকু আমার মনে আছে। ওর স্পর্শে আমার দিব্য পুলকানুভূতি হয়েছিল—নিশ্চয়ই ওর সত্ত্ব-গুণের দেহ। ওকে নিয়ে এসো এখানে।'

অগত্যা পথ ছেড়ে ভেতরে আসতে দিতে হয়।

শ্যামসুন্দরের এটা বড় একটা জয়লাভ—কিন্তু সে বিজয়গর্ব বা অহঙ্কার কিছুই ওর মুখে-চোখে প্রকাশ পেল না। কারও দিকে চাইলও না। সোজা—যেন মনে হ'ল এমন বহুবার এখানে এসেছে সে, এ সবই ওর পরিচিত—ঘরে ঢুকে ওঁর কাছে বসে, প্রণাম করার চেষ্টা করল না, একেবারেই পায়ে হাত দিল, পায়ের গোছ থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত হাত বুলোতে লাগল। আস্তে। ওর কোমল হাতের সেবা বা ওর স্পর্শেই আবারও যেন রোমাঞ্চ জাগল সন্ন্যাসীর দেহে।

তবে সে অনুভূতির কথা চিন্তাও করার সময় পেলেন না কৃষ্ণপ্রাণ, শ্যামসুন্দর বসার সঙ্গে সঙ্গেই যেন অভিমানে ফেটে পড়ল, 'আমি তোমার কাছে আসতে চাই, তোমার কাছে থাকতে চাই—ওরা আটকাবে কেন? তুমি কি ওদের কেনা সম্পত্তি?'

পুলকানুভূতির মাধুর্য, ওর কোমল হাতের স্পর্শ—ওঁকে দ্রবীভূত ক'রে এনেছে ততক্ষণে, সেই সঙ্গে মনে বিপুল একটা স্নেহক্ষরণ চলছে ওঁর।

উনি শ্যামসুন্দরের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ,

আমি বয়স্ক সন্ন্যাসী, আমাকে দেখতে চাও কেন ? আমার কাছে এসেই কি তোমার ভাল লাগবে ! ইহজীবনের আনন্দ তোমার চারিদিকে—তুমি এই বদ্ধঘরে এসে কি করবে ?...আর তোমার অল্প বয়স—তোমার তো এখন পাঠাভ্যাস করার কথা। তুমিই বা এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ? কোথায় থাকো তুমি ? বাবা কি করেন ? তোমার মুখ দেখে তো মনে হয় এখনও কিছু খাও নি। তাঁরা হয়ত কত ভাবছেন !'

কুঠিয়া ছোট, সেখানে অধিক লোকের প্রবেশ সম্ভব নয়। সেবক সঙ্গীরা দরজার কাছেই ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা রীতিমতো বিস্মিতই হলেন। কত কাল এমন সহজ, গৃহীজনোচিত কথা ওঁর মুখে শোনেন নি তাঁরা !

আরও বিস্মিত হলেন তাঁরা ছেলেটির উত্তর শুনে।

'ভাল লাগবে বলেই তো এসেছি। আসতে চাই। কার কিসে ভাল লাগে কেউ কি বলতে পারে ? শুনেছি তো তুমি মহাপণ্ডিত—সব ছেড়ে ভিখিরী হতে ভাল লাগল কেন ? ভাল লাগে বলেই তো রোজ তোমাকে দেখার জন্যে মন্দিরে আসি।'

তার পর একটু থেমে বলে, 'খাওয়া হয়ই নি তো। এমনিই তো একবেলা খাওয়া—বাবা নেই, মা এক মন্দিরে কাজ করে, যা পায় দুজনের একবেলার বেশী খাওয়া হয় না। তাই দেরি ক'রেই খাই। বিকেলে না হয় সন্ধ্যেয়। যখন হোক খেলেই হ'ল।'

'ও, তোমার বাবা মারা গেছেন ? তাই এমন ক'রে ঘুরে বেড়াও, দেখবার কেউ নেই বলেই—। তা তুমি ব্রাহ্মণসন্তান—পূজার্চনার কাজ কিছু কিছু শিখে নাও না কেন ? পূজারীর প্রয়োজন তো হয়ই—এত মঠমন্দির এখানে।'

'ও সব কাজ আমার ভাল লাগে না। নিজের কাজ করি সে আলাদা কথা —ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে দেবসেবা বিক্রী করব ! আর নিজের ভাতের জন্যে করলেই ফাঁকি দিতে ইচ্ছে করবে, মন থাকবে কখন লোক-দেখানো পুজো সেরে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে পারব। যে মজুরীর জন্যে এ কাজ করা—সেটুকু পাবার মতো লোক-দেখানো কাজে তাদের তুষ্ট ক'রে বেরিয়ে পড়া। দেবতাকে ফাঁকি দিয়ে জীবন কাটাতে চাই না, ও তো মহাপাপ !'

সেবক বিষ্ণু আর অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নন। তিনি কিছু বিরসমুখেই বললেন, 'প্রভুর ভিক্ষা নেবার সময় উত্তীর্ণ হতে বসেছে। এখানেই কি গ্রহণ

করবেন ?'

কৃষ্ণপ্রাণ একদৃষ্টে ছেলেটির দিকে চেয়ে ছিলেন। এতটুকু বালকের মুখে—ঠিক কিশোরবয়সীও বলা যায় না, ও বালকই—এমন কথা কখনও শোনেন নি। এ যেন বালকের দেহে কোন জ্ঞানবৃদ্ধ কথা বলছে।

তিনি এবার মুখ ফিরিয়ে বিষ্ণুর দিকে চেয়ে বললেন, 'দুজনের মতোই নিয়ে এসো। এ ছেলেটির পাতাও এখানে দাও। তোমার নাম কি বাবা ?'

'শ্যামসুন্দর !'

'শ্যামসুন্দর ! শ্যামসুন্দর !' মৃদুকণ্ঠে নামটি বার দুই উচ্চারণ ক'রে কেমন যেন উন্মনা হয়ে যান।

কে জানে কেন, বহুদিন পূর্বের এক বিস্মৃত ঘটনা মনে পড়ছে বার বার। এমনি আর একজনের কথা। সেই যে ছেলেটি, গয়াতে তিনি গুরুকে ভিক্ষা দেবেন ব'লে মনস্থ করছিলেন—তাঁকে সন্ন্যাসের নিয়ম সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

তারও এমনি স্পষ্ট স্পষ্ট কথা।...

এক অজ্ঞাতকুলশীল এদেশী বালক, মূর্খ—তা তো বোঝাই যায়, দীন অবস্থা, নগ্ন দেহে একটা উত্তরীয় পর্যন্ত নেই—তাকে এতদূর প্রশ্রয়দানে ভক্ত অনুচরের দল সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

অথচ কিছু বলতেও সাহস হয় না। কৃষ্ণপ্রাণ বিরক্ত হলে আর রক্ষা নেই—আজকের মতো আহার তো ত্যাগ করবেনই—হয়ত এদের সকলকেই ত্যাগ ক'রে অন্য কোথাও চলে যাবেন।

একবার এক ভক্তের জন্য অনুনয় করতে গিয়ে এমনি ঘটনা ঘটেছিল ; কোমল শয্যার প্রশ্নেও—পুরী ছেড়ে আলালনাথে গিয়ে একা বাস করবেন বলেছিলেন।

তবু, আরও কিছু বিস্ময়াঘাত, বালকের অবিশ্বাস্য স্পর্ধার পরিচয় লাভ ভাগ্যে ছিল তাঁদের।

বিষ্ণু এসে সেই স্বল্পপরিসর স্থানেই দুটি কদলীপত্র পেতে রেখে প্রসাদ আনতে যাবেন, শ্যামসুন্দর বেশ উচ্চকণ্ঠে পরিষ্কার বলে উঠল, 'আমি কিন্তু তোমার কাছে থাকব, যতদিন আমার ইচ্ছা। যদি থাকতে না দাও আমি কিছুই খাব না। শুধু এখানে বা আজ নয়—আর কোনদিনই খাব না। না খেয়ে এখানেই দেহপাত করব। এরা যদি জোর ক'রে বাইরে ফেলে দেয়—রাস্তাতেই পড়ে

থাকব, সেখানেই মরব। আমি মিথ্যে কথা বলি না, তোমাকে ছুঁয়ে তো বলবোই না। আমার যে কথা সেই কাজ।'

এবার কৃষ্ণপ্রাণেরও বিচলিত হয়ে ওঠার পালা।

'আরে না না। এসব কি বলছ। সে কখনও হয়। তুমি এখানে থাকবে কি। তোমার মা আছেন গৃহে—'

'মাকে আমি বলে এসেছি।' নিশ্চিন্ত ভাবে বলে শ্যামসুন্দর।

'তা হোক, তুমি থাকবে কি ক'রে। সন্ন্যাসীর কুঠিয়ায় কারও থাকা সম্ভব নয়। থাকতে নেই।'

'কেন নেই? কে বলেছে? শুনেছি মেয়েছেলেকে আসতে নেই, থাকতে নেই। আমি তো পুরুষ। তাও মেয়েদের এলে কি এমন ক্ষতি তা জানি না। নিজের সন্ন্যাস নিজের কাছে। মেয়েছেলে কাছে এলেই সন্ন্যাস নষ্ট হবে?'

বাইরে দু'একজন রুদ্ধকণ্ঠে বলাবলি করতে লাগল, 'এ ছেলের তো দেখছি এই বয়সেই কিছু জানতে বাকী নেই। এত পরিপক্ক হ'ল কি ক'রে? এ ছেলে ভাল নয়, প্রভু বুঝছেন না, বেশী প্রশ্রয় দিলে বিপদে পড়বেন।'

'তা নয়', আরও কি কোমল হয়ে আসে কৃষ্ণপ্রাণের কণ্ঠ? বলেন, 'ধ্যান তপস্যা জপ- এসব সময়ে সাধকদের নির্জনতা প্রয়োজন। এটা বোঝ না কেন? তুমি তো অনেক কিছু জান দেখছি, এটাও জানা উচিত। আর, এইটুকু ঘর, এর মধ্যে একজনের বেশী লোক এলেই জনতা বলে মনে হয়, অস্বস্তি হতে থাকবে, নিজের চিন্তায় মন বসবে না।'

'বেশ, তুমি কথা দাও জপধ্যানের সময় ছাড়া অন্য সময় ইচ্ছামতো আসতে পারব—তাহলে আমি একটুও বিরক্ত করব না, এ ঘরের ত্রিসীমানায় আসব না। এই তো তোমার এত সেবক শিষ্য দেখছি—এরা তো বেশ আসে, তোমার জপ-তপের সময়টুকু বাদ দিয়ে সব সময়ই আসা যাওয়া করে—তার মধ্যে আমি এলে এমন কি ক্ষতি!'

বাহির থেকে কে যেন বলল, 'এত দেখল ও কখন? ওকে তো আমরা এখানে কোনদিন দেখি নি!'

কিন্তু সে কথার কেউ উত্তর দিল না। এঁরা কেউ শুনলেন কিনা তাও বোঝা গেল না।

কারণ ততক্ষণে বিষ্ণু প্রসাদ নিয়ে এসে গেছে।

ছুটি পাতাতেই প্রসাদ সাজিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসীর পাতে শুধু অন্ন ও একটি ব্যঞ্জন। ছেলেটির পাতায় একাধিক ব্যঞ্জন, কিছু কিছু মিষ্ট প্রসাদও।

কৃষ্ণপ্রাণ তখনও পাতায় হাত দেন নি। ধীর ভাবে বললেন, 'তোমারই বা কি লাভ হবে বলো। আমি এই কঙ্কালসারমাত্র বৃদ্ধ, ইহলোকের সঙ্গে সম্পর্কই ঘুচে গেছে—তুমি অল্পবয়সী বালক—আমার সঙ্গ তোমার ভাল লাগবে না। তুমি গৃহে ফিরে যাও, যখন মনে হবে এসো।...এখন প্রসাদ গ্রহণ করো, প্রসাদে বিলম্ব করতে নেই—প্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্ষয়েৎ!'

'না, আমি মুখে জলও দেব না, তুমি কথা না দিলে। কার কিসে আনন্দ হয়, কাকে কার ভাল লাগে কে বলতে পাবে? তুমি সন্ন্যাস নিয়ে আনন্দ পেয়েছ, কই আরও তো কত লোক আছে তারা তো নেয় না। কত লোক অনেকগুলো বিয়ে করে—অনেক ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার—তাতেই তাদের আনন্দ। এই যে এরা, তোমার ভক্তরা—তোমাকে সকলে ভক্তি করে, ভালবাসে—সেই দেখেই এসেছে। এদের মনে তেমন বৈরাগ্য হলে অন্য কোথাও বনে পাহাড়ে চলে যেত। আর এত কথায় কাজ কি, আমি যদি তোমার একটু সেবা ক'রে আনন্দ পাই, কাছে থাকি—তোমারই বা তাতে আপত্তি কি? তুমি যে কারও সেবা নাও না তাও তো নয়।

আর কথা বাড়ানোর মতো শক্তি ছিল না কৃষ্ণপ্রাণের। বললেন, 'তাই হবে, তুমি প্রসাদ নাও।'

'বেশ। তাহলে এদের বলে রাখো, তোমার এই পাহারাদারদের, কেউ না আমাকে তাড়িয়ে দেয়।'

॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণপ্রাণের যে অন্তরঙ্গ ভক্তগোষ্ঠী, যাঁরা নিয়ত ওঁকে ঘিরে থাকেন, সর্বত্র অনুসরণ করার চেষ্টা করেন—তাঁরা কেউ ওঁকে ভাবেন গুরু, কেউ বা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলে মনে করেন।

তবু তাঁদের মনেও একটা অহঙ্কার থাকবে এটা স্বাভাবিক। ভক্তির অহঙ্কার, গুরুর আদর্শ-উপদেশ-ইচ্ছা ঠিকমতো পালন করছেন, করতে পারছেন এ অহঙ্কার—তাঁর কখন কি প্রয়োজন, সেবা বা অন্য দৈনন্দিন অভ্যস্ত কার্যে

—তাও তাঁরাই ঠিক বোঝেন, সতর্ক থেকে সেই কার্য নির্বাহ করেন—এই অহঙ্কারও।

সর্বজ্ঞ দর্পহারী কি তা জেনেই কৌতুক করার জন্য এই ছেলেটাকে এনে ফেললেন!

প্রভু বলেছেন, ওর গতায়াতের অবাধ অধিকার রইল, সুতরাং বাধা দেওয়ার কি ভৎ'সনা করার কোন উপায় তাঁদের নেই। তাই বলে ছেলেটা যে অনায়াসে একদিনেই সেই প্রভুর প্রভু বয়ে বসল—এতটা সহ্য করা যায় কি করে!

অথচ প্রভু তো বেশ সহ্য করছেন—হাসিমুখেই। মনে হয় এতে তিনি বরং আনন্দিত। যেন এমনি একজন অভিভাবকই তিনি মনে মনে চেয়ে ছিলেন।...

প্রথম দিন জপধ্যানের পর সমুদ্রে স্নান করতে যাবেন, ছেলেটা যেন আগে থেকেই তৈরি ছিল—যে সব নিত্য সঙ্গীরা ওঁর সঙ্গে স্নানে যান—তাঁদের মধ্য দিয়ে এক ফাঁকে কাছে এসে একেবারে হাত ধরল।

'তুমি কোথায় যাবে শ্যামসুন্দর, তুমিও স্নান করবে?'

'কোথা যাব তা আমি কি জানি, তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানেই যাব।'

স্নানান্তে, কৃষ্ণপ্রাণ দুটি তিনটি প্রিয় ভক্ত বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে কুঠিয়ায় ফেরেন, সিক্ত বহির্বাস পরিবর্তনের জন্য, তার পরই শ্রীমন্দির যাত্রা করেন দর্শন করতে।

শ্যামসুন্দর ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গ নিল। তার দ্বিতীয় বস্ত্র নেই, সে ভিজে কাপড়েই যাচ্ছিল, প্রভু ব্যথিত নেত্রে তার দিকে চেয়ে তরুণ ভক্তদের মুখের উপর দৃষ্টি রাখলেন। এদের বস্ত্র গৈরিক নয়, বালককে দেওয়া যেতে পারে। ওঁর সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে বিলম্ব হ'ল না—শিবনাথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি নিজের একটা বস্ত্র এনে দিল। শ্যামসুন্দর নির্বিকার—যেন এ তার প্রাপ্যই, এই ভাবে কাপড় নিয়ে ভিজে কাপড়টা একটা শ্বেত করবীর ডালে মেলে দিয়ে ওঁর সঙ্গে চলতে লাগল।

মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে বেশ একটু অভিভাবকত্বর স্বরেই বলল, 'কালকের মতো অত দেরি ক'রো না। সকাল করে তোমার গান শেষ ক'রো।'

এবার কৃষ্ণপ্রাণও একটু অবাক হয়ে যান, 'কেন রে, আমার গান শেষ করার সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক?'

'বা রে! খেতে হবে না! নিত্য উপবাস চালাবে নাকি? না খেয়ে না খেয়ে কি চেহারা হচ্ছে! এমন ভাবে চললে তোমার ঐ নাম-গান তো চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে!'

আরও কিছু বলত হয়ত কিন্তু বলা গেল না। প্রভু মন্দিরের দিকে যখন যান—শহরবাসীদের তো জানা হয়ে গেছে, তারা এসে পূর্ব থেকেই ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল—এসে ঘিরে ফেলল। শ্যামসুন্দর ইচ্ছা ক'রেই এবার সরে এল। গায়ক দলের নেতৃস্থানীয় যাঁরা, দোহারের দল—এঁদেরই এবার কাছে থাকা প্রয়োজন, এটুকু সে বোঝে।

তবে সত্যই কিন্তু সেদিন অনেক আগে কীর্তন ভঙ্গ করলেন কৃষ্ণপ্রাণ। রাজভোগ উঠে ছত্রভোগ লাগছে—সেই সময়ই। প্রভু অভ্যাসমতো নীরবে যখন দর্শন শেষ ক'রে কুঠিয়ার দিকে যাত্রা করলেন—তখনও তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হতে বিলম্ব আছে।

কে জানে ছেলেটাও ক্ষুধার্ত থাকবে এই চিন্তাতেই তাঁর কুঠিয়ায় ফেরার কথা মনে পড়ল কিনা!

সেদিনও নিজের ভিক্ষায় বসার সময় শ্যামসুন্দরকেও সেইখানেই প্রসাদ দিতে বললেন।

এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করা কঠিন বৈকি।

এমন কি সেবক বিষ্ণুদাসের ললাটেও ভ্রূকুটি দেখা দিল। কিন্তু বলতে গেলে যিনি ওঁদের মালিক, সর্বেশ্বর—যিনি ওঁদের মনে ঈশ্বরের সঙ্গে সমান হয়ে গেছেন, ইহ-পরকালের কাণ্ডারী, গুরু—তাঁকে কি বলবে!

প্রসাদ গ্রহণ শেষ হ'লে শ্যামসুন্দর ওঁর সঙ্গে কুঠিয়ায় প্রবেশ করল।

এবার আর সহ্য হ'ল না শিবদাসের। সে এসে বলল, 'তুমি এখন যাও, উনি বিশ্রাম করবেন।'

'তা বিশ্রাম উনি করুন না!' নিশ্চিন্ত মনে উত্তর দিল শ্যামসুন্দর, 'আমি ওঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাব কে তোমাকে বললে! আমি কি ওঁর সঙ্গে বকবক করব!'

'এই সময় ওঁর একটু সেবার প্রয়োজন—'

'তা আমি জানি, সেবা করতেও জানি। সেই জন্যেই এসেছি। তোমরা

ছাড়া আর কেউ সেবা করতে পারবে না এমন কোন লেখাপড়া আছে?'

এবার কৃষ্ণপ্রাণই কথা বললেন, 'না বাবা, তুমি এখানে থাকতে পারবে না। ছোট ঘর, গবাক্ষ বলতে ঐ একটুখানি, গরমে কষ্ট হবে। স্থানও নিতান্ত অল্প।'

'কিছু কষ্ট হবে না। তুমি শুয়ে পড়ো দিকি। কতটুকুই বা সময়। এখনই তো উঠে পড়বে, সন্ধ্যার জপের সময় বলে। শুয়ে পড়ো, আমি তোমার কোমর পা টিপে দিই। আমার খুব ইচ্ছে—'

তখনও শিবদাস অপেক্ষা করছিল, যদি প্রভু ওকে কঠিনভাবে নিবৃত্ত করেন, চলে যেতে বাধ্য করেন। কিন্তু তেমন কোন ঘটনাই ঘটল না। তিনি শুয়ে পড়ে—পা টান ক'রে শোওয়ার কোন উপায় নেই এ ঘরে—শুধু আবারও বললেন, 'তোমার কষ্ট হবে। কেন এমন করছ!'

'আমার কষ্ট আমি বুঝব। আমি কি রাজবাড়িতে বাস করি নাকি! চালা ঘর তাও নিচু চালা—একটুও হাওয়া আসে না।'

তারপর বলে ওঠে, 'তুমিই বা এত কষ্ট ক'রে থাকো কেন! না খেয়ে না খেয়ে দেহ তো ঐ কাঠ হয়ে গেছে—বিশ্রাম বলতে গোণা ক'দণ্ড। তার ওপর এত কষ্ট ক'রে লাভ কি? এ তোমার বাপু লোক-দেখানো সাধু সাজা। ভণ্ডামি। এই বলো তুমি ভগবানের সেবা করতে চাও, তা সেবা করবে কি দিয়ে? শরীর থাকলেই তো?—শরীর নষ্ট হ'লে সেবা করবে কে? কি দিয়ে করবে?'

কৃষ্ণপ্রাণ চমকিত হয়ে ওঠেন।

,এসব কথা তোমাকে কে বললে? কার কাছে শুনলে?'

'আহা, তুমিই তো বলে বেড়াও, মন্দিরে, গুণ্ডিচা বাড়িতে, বলগণ্ডিতে—কতদিন বলেছ, আমি নিজে শুনেছি!'

আর কথা বাড়ান না কৃষ্ণপ্রাণ। দুই চোখ মুদিত করেন মাত্র, কিন্তু তন্দ্রা আসে না চোখে। মনের মধ্যে একটা ঝড় উঠেছে যেন, অকস্মাৎ। আবারও মনে পড়ছে গয়ার সেই ছেলেটার কথা।

শ্যামসুন্দরও আর কিছু বলে না। নীরবে মৃদু কোমল হস্তে ওঁর কোমর পা, দুই হাতের পাল্কা—একটু একটু টিপে দেয়।

শিবদাস বিষ্ণু শরণ এঁরাও অন্যদিন দেহের এই সব স্থানগুলি টিপে বা টেনে

দেন। কৃষ্ণপ্রাণ প্রথম প্রথম প্রবল বাধা দিতেন কিন্তু এরা শোনে নি, শোনে না। শীর্ণ শরীর, উদ্বাহু হয়ে উদ্দাম নৃত্য করেন—ব্যথা হবারই কথা, হয়ও। এটুকু পরিচর্যা না হ'লে পরের দিন শয্যা ত্যাগ করতেই পারবেন না। সেই-ভাবেই এরা অঙ্গ সংবাহন করেন—নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝেন, কোথায় কোথায় এ সংবাহন প্রয়োজন।

এ ছেলেটার তো কোন অভিজ্ঞতা নেই, এ জানল কি করে? এমন নৈপুণ্যই বা পেল কোথায়?

হাতের স্পর্শটাই কি মধুর, আর লঘু। ওঁর জননীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে বার বার। তিনিও এইভাবে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, মনে হ'ত ওঁর সে কল্যাণহস্তের স্পর্শে বুকভরা স্নেহই উজাড় ক'রে দিচ্ছেন—

এইসব চিন্তা থেকে জোর ক'রে মনকে সরিয়ে এনে মানসজপের চেষ্টা করেন, তার মধ্যেই তন্দ্রায় শিথিল হয়ে আসে দেহ।

সন্ধ্যার সময় শ্যামসুন্দর কোথা থেকে একটা তালপাতার পাখা সংগ্রহ ক'রে আনে।

রাত্রে কৃষ্ণপ্রাণ শয়ন করলে সে পিছনে বসে বাতাস করতে যায়।

কৃষ্ণপ্রাণ ব্যস্ত হয়ে উঠে বসেন, 'না না, পাখার বাতাস ক'রো না। সন্ন্যাসীর আরাম করতে নেই। আমার লাগবেও না।'

রেগে ওঠে শ্যামসুন্দর, 'কে বলেছে নেই? কোন শাস্ত্রে খা আছে যে দারুণ গ্রীষ্মে বদ্ধ ঘরে একটু পাখার বাতাস খেলে সন্ন্যাস নষ্ট হবে? সন্ন্যাসী যদি আরামে বাঁধা পড়ে, আরামের দাস হয়—তবেই খারাপ।···আর এতই যদি সন্ন্যাসের বিধিনিষেধ, তাহলে সন্ন্যাসী হয়ে পাকা ঘরে শোবার শখ কেন? খোলা গাছতলায় পড়ে থাকো—বাতাস লাগবে না।'

তারপর, আড়চোখে বাহিরে-প্রতীক্ষমাণ উৎসুক ভক্তদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে, 'আর আরাম যে একেবারে নিচ্ছ না, তাও তো নয়। আমি তো প্রথম নই—তোমার এই চেলারা তো কতদিন থেকে তোমার গা টিপে দিচ্ছে। মুখে বলো ভিক্ষা, ভিক্ষায় যাও কোনদিন? প্রসাদ ঘরে পৌছে যায়, বিষ্ণুদাদা সাজিয়ে দেন, ভক্তরা প্রতিটি প্রয়োজনের দ্রব্য হাতের কাছে এগিয়ে দেন—এর কোনটা আরাম নয়?'

'ভিক্ষায় বেরোলে সবাই অনেক দেয়, ভাল ভাল খাদ্য দেয়, সেই জন্যেই বেরুনো বন্ধ করতে হয়েছে। আমি ভিক্ষা করতে বেরোলেই অনেকে বহু প্রসাদ পাঠিয়ে দেন। আর গা হাত—নেচে পাথরে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে গায়ে ব্যথা হয় বলেই ওরা টিপে টেনে দেয়, আমিও না বলতে পারি না—নইলে এত ব্যথা হবে যে পরের দিন হয়ত উঠতেই পারব না—'

ওঁর বক্তব্য শেষ করতে না দিয়েই বালক বলে ওঠে, 'আর এই গুমোট গরমে চারদিক চাপা ঘরে পড়ে থাকো—ঐ তো শরীর করেছ, হাড়ের ওপর চামড়া জড়ানো—তাতেই তো ঘামে গা ভেসে যাচ্ছে। ঘুম না হ'লে শরীর থাকবে? ঘামে পচে গায়ে ঘা হয়ে যাবে না? আসলে এরা যে জোর করতে পারে না। তোমাকে ভয় করে—তুমিও যা খুশি তাই করো।'

কথা বলছে যুক্তি দিচ্ছে—কিন্তু পাখা বন্ধ হয় নি একবারও।

কৃষ্ণপ্রাণ বলেন, 'পাখা চালাবে তুমি ছেলেমানুষ, তোমার গায়ে ব্যথা হবে না? পরকে কষ্ট দিয়ে আরাম নেওয়া অধর্ম।'

শ্যামসুন্দর বলে, 'আমি আর বাপু অত বকতে পারি না তোমার সঙ্গে। পরের দুঃখে তো প্রাণ কাঁদছে, এই যে গরমে সেদ্ধ হচ্ছ—নিজের শরীরকেই বা কষ্ট দিচ্ছ কেন? সব শরীরেই তোমার ঠাকুর আছেন, তোমার শরীর বলেই কি তিনি পালিয়ে যাবেন!…বেশ তো, আমার যখন কষ্ট হবে তুমি বাতাস করো—তাহলেই হবে।'

বাইরে থেকে ভক্তরা প্রবল তিরস্কার করে ওঠেন, 'প্রভু তোমাকে বাতাস করবেন! তোমার সাহস তো কম নয়! মুখে আনলে কি ক'রে! একেই বলে মূর্খ আর অর্বাচীন।'

তেমনিই উচ্চ কণ্ঠে উত্তর দেয় শ্যামসুন্দর, 'সাহস কার কোথা থেকে আসে তোমরা কি জানবে। ভালবাসাই সাহস যোগায়। তোমরা ভক্তি করো—ভালবাস কি?'

তারপর কৃষ্ণপ্রাণের দিকে ফিরে বলে, 'তোমাতে আমাতে কথা হচ্ছে, এরা তার মধ্যে কথা কইতে আসে কেন বল তো? আমি তোমার কাছে আসি, সেটা ওদের সহ্য হয় না—হিংসেয় বুক ফেটে যায় একেবারে!'

কৃষ্ণপ্রাণ তখন নীরবে এই মধুর সেবাটুকু নিচ্ছেন, শ্রান্ত চোখ দুটি—বহু দিন পরে পাওয়া এই মৃদুমন্দ বাতাসে আপনিই নিমীলিত হয়ে এসেছে, আর কোন

কথা বলতে কি কথা বলাতে ভরসা হ'ল না কারও।

যিনি প্রভু, সর্বেশ্বর—তিনিই যদি এ দুঃসহ স্পর্ধার কোন প্রতিবাদ না করেন—ওঁরা কি করবেন!

পরের দিন প্রসাদ পাবার সময় আর এক অঘটন ঘটিয়ে বসল শ্যামসুন্দর।

স্বল্পমাত্র আহার করেন কৃষ্ণপ্রাণ, শুধু প্রাণটুকু রাখার মতো। পূর্বে তার মধ্যেও বৈচিত্র্য ছিল, এখন—কে এক এদেশীয় সাধু, সম্ভবত ঈর্ষাবশতই—নিত্য রাজভোগ্য খাদ্য ওঁর কাছে কুঠিয়ায় পৌছে যায় এই ঈর্ষাতেই—কি কটাক্ষ করাতে তাও ত্যাগ করেছেন।

রসনা-লাম্পট্য সাধুর কাছে প্রকৃতি-সংসর্গের মতোই অনাচার—বার বার এই কথাই ব'লে সকলের অনুযোগ অনুরোধ এড়িয়ে যান। এখন সুদ্ধমাত্র একমুষ্টি অন্ন মহাপ্রসাদ এবং যে কোন একটি ব্যঞ্জন—এ ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না। দিনান্তে একবার মাত্র তাও। কদাচিৎ এক-আধ টুকরো মিষ্ট প্রসাদ—নিতান্ত কোন ভক্ত ভিক্ষা দিতে এসে চোখের জল ফেললে গ্রহণ করেন।

এই ভাবেই সেদিনও ব্যবস্থা হয়েছে। শ্যামসুন্দর যেন প্রভুর অনুক্ত নির্দেশে, কতকটা বিধিবদ্ধ ভাবেই ওর সামনে বা পাশে বসে আহার করার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে। তার পাতায় তিন-চার প্রকারের ব্যঞ্জন, ক্ষীর মালপুয়া প্রভৃতি পড়েছে।

শ্যামসুন্দর প্রথমে কিছু বলে নি, কৃষ্ণপ্রাণ এক গ্রাস মুখে তোলার পরই—তার নিজেরও মুখে দু-তিন গ্রাস উঠেছে—হঠাৎ উঠে নিজের পাতা থেকে একটা মালপুয়া এনে কৃষ্ণপ্রাণের মুখের সামনে ধরে বলল, 'নাও, মুখে দাও।'

প্রথমটা কয়েক নিমেষ ভক্তদের বাক্যস্ফূর্তি হয় নি, তার পরই তাঁরা ক্রোধে ফেটে পড়লেন। সোমেশ্বর বললেন, 'তুমি না ব্রাহ্মণ সন্তান, খেতে খেতে উঠে পড়লে!'

প্রশান্ত কণ্ঠে শ্যামসুন্দর বলল, 'মূর্খ, উঠতে নেই অবশিষ্টটা উচ্ছিষ্ট হয়ে যায় বলে। এ তো মহাপ্রসাদ, উচ্ছিষ্ট হবে কি? এ আহারও নয়, প্রসাদ লাভ। এর কোন বাধা নিয়ম নেই!'

তার পরই কৃষ্ণপ্রাণকে যেন প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে, 'নাও নাও ধরো। আমি কি সারাদিন এমনি লক্ষণের ফল ধরার মতো ধরে দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি!'

কৃষ্ণপ্রাণ বলেন, 'কিন্তু তুমি তো জান আমি এসব আহার ছেড়ে দিয়েছি !'

'আরে, ছেড়ে দেবে কি। জগন্নাথের প্রসাদ মুখের কাছে এনে ধরেছি—তুমি ফিরিয়ে দেবে ! তোমার আস্পদ্দা তো কম নয় ! স্বয়ং ব্রহ্মারও তো এমন সাহস হয় না শুনেছি !'

অগত্যা কৃষ্ণপ্রাণকে গ্রহণ করতে হয়, ওরই হাত থেকে একেবারে মুখে গ্রহণ করেন তিনি।

শ্যামসুন্দর নিজের স্থানে ফিরে গিয়ে পুনশ্চ আহার শুরু ক'রে বলে, 'কে এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর হিংসের জ্বালায় বলা কথা—তাই শুনে তুমি খাওয়াদাওয়া ছাড়লে ! তুমি তো বোকা কম নও ! তুমি থাকতে তার শিষ্য ভক্ত জুটবে না, তাই তোমার শরীরটা যত তাড়াতাড়ি যায়—সেই মতলবে বলা। এটা বুঝলে না !'

'না, না। তিনি প্রকৃত কথাই বলেছেন। সাধুর পক্ষে সর্ব প্রকারে সংযম রক্ষা করা প্রয়োজন।'

'তোমার ও পণ্ডিতি কথা শুনেছে সবাই। ওসব রাখো দিকি। তুমি বুকে হাত দিয়ে—এই মহাপ্রসাদ হাতে সত্যি কথা বলো তো, পাছে তার কথা শুনে কেউ ভণ্ড সন্ন্যাসী ভাবে—সেই জন্যেই এমন ক'রে শরীর পাত করছ কিনা। তুমি কিসের সিদ্ধ পুরুষ, সন্ন্যাসী—যদি লোকের কথায়, কে কি ভাববে এই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠবে ! আসলে প্রতিষ্ঠার ভয়। প্রতিষ্ঠা শৌকরী বিষ্ঠা—শোন নি ! প্রতিষ্ঠা গেলে তো ভালই—এত লোকের ভীড়ে ভগবানের নাম হয় না—বেশ নির্জনে তাঁকে ডাকতে পারবে। আর তোমার তপস্যা তো ঐ সব সাধুর মতো নয়—তুমি চাও তাঁর সেবা করতে। তাঁর কাছ থেকে ভালবাসা আদায় করতে—সন্ন্যাসীর দলে নাম কাটা গেলে তোমার ভয়টা কি !'

তারপর, আরও খানিকটা খাওয়ার পর বলে, 'না না, আর একটু খাওয়া বাড়াও। এই দেহ নিয়ে সেবা করবে তাঁর, দেহটা ঠিক রাখো। ভগবান তোমাকে সুন্দর দেহ দিয়েছেন, সেই দেহ দিয়ে তাঁর সেবা করবে না ? তিনি একটা ঘাটের মড়া নিয়ে সুখী হবেন ?'

আবারও চমকে ওঠেন কৃষ্ণপ্রাণ।

অন্য ভক্তরা—অর্বাচীনটার স্পর্ধা এবং প্রভুর অকারণ প্রশ্রয় দান ও সহ্য-শক্তিতে স্তম্ভিত হয়ে থাকেন। কেবল সেবক বিষ্ণুদাস এই অবসরে আর এক মুঠি অন্ন এনে নিঃশব্দে রেখে যান। দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ থাকায় কৃষ্ণপ্রাণ তা দেখতে

পান না, অন্যমনস্ক থাকার দরুন বুঝতেও পারেন না।

এই ভাবে আহার কমিয়ে দেহপাত করাটা বিষ্ণুদাসের ভাল লাগে নি কোন দিনই। এঁদের সকলের মধ্যে তিনিই আজ এই বালকের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করেন।

একটু একটু ক'রে, কদিনে শ্যামসুন্দর প্রভুর ঘরে পাকাপাকি ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

কেউ আর এখন, তার এই দিনরাত্রি ছায়ার মতো সঙ্গে থাকায়, বিস্মিত হন না। এখানে ওর এটা অনধিকার-প্রবেশ সেকথাও তাঁরা আলোচনা করেন না। এক কথায় সহ্য হয়ে গেছে সকলকারই, বাধ্য হয়েই মেনে নিয়েছেন।

কৃষ্ণপ্রাণের ওর সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত মনোভাব। তিনি নিজেই ঠিক বুঝতে পারেন না। এ কি স্নেহ? বাৎসল্য? নইলে ওর শাসন ভর্ৎসনা মেনে নিয়ে এমন আনন্দ পাবেন কেন? গৃহীরা এমনি সুখ বা আনন্দ পায় তা তিনি দেখেছেন। আবার ভাবেন, তাই যদি হবে—মধ্যে মধ্যে এমন সম্ভ্রমের ভাব বোধ করবেন কেন ওর কথা শুনে? আশ্চর্য হয়ে যান, ভয় ভয়ও করে তাঁর এক এক সময়। এই অল্প বয়স, লেখাপড়াও তেমন শেখে নি—এত সব গূঢ়তত্ত্ব জানল কি করে?

অনেক কিছুই মেনে নিতে হয় তাঁকে।

ভক্তদের চাপে শুষ্ক কদলীপত্রর তোশক ব্যবহার মেনে নিতে হয়েছিল। আর সত্যই হয়ত দেহে ক্ষতর সৃষ্টি হ'ত—দেহের এই অবস্থায় পাথরের ওপর শুয়ে।

এখন—হঠাৎ একদিন অনুভব করেন শয্যাটা আরও সুখদ বোধ হচ্ছে। তোশক তুলে দেখেন, আরও একখানি এই ধরনের পাতার তোশক যোগ হয়েছে সে শয্যায়।

মুখ তুলতে দেখা গেল নির্বিকার স্মিত মুখে শ্যামসুন্দর চেয়ে আছে, ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ কৌতুকের রেখা।

'এ তোমার কীর্তি!' একটু রুষ্টভাবেই বলেন কৃষ্ণপ্রাণ।

'হ্যাঁ, তা কি হয়েছে! পাতায় শুতে দোষ নেই। পাতার ভাগটা একটু মোটা হ'লেই দোষ! এসব কথা আবার কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে?'

'না না, কেনই বা তা হবে। ঠিক যেটুকু প্রয়োজন তার বেশী আরাম বিলাসেরই নামান্তর।'

'তোমার কতটুকু কি প্রয়োজন তার তুমি কি জানো! আর সে কথাই যদি ভাববে, হিসাব করতে বসবে তো—জগন্নাথ ঠাকুরের কথা ভাববে কখন? নিজের দেহের অবস্থা তুমি তো দেখতেও পাও না। আমরা দেখি, কি দরকার তাও বুঝি। বিষ্ণুদাদাকে বলতে উনি বললেন, তুমি বাঁচালে ভাই, আমরা তো বলতে সাহসই করি না। কিন্তু সত্যিই ওঁর দরকার।...বিষ্ণুদাদাই তো পাতা চিরে শুকিয়ে সব যোগাড় করে দিয়েছেন।'

তথাপি কৃষ্ণপ্রাণ কি বলতে যাচ্ছিলেন, শ্যামসুন্দর ওর স্বভাবমতো প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল, 'তোমার অত আমি-আমি ভাব কেন বলো তো! কিসের সাধু তুমি? এত প্রভুত্ব চালাবারই যদি সাধ—ভিখিরী সাজতে গিয়েছিলে কেন? তুমিই সব বোঝ আমরা কিছু বুঝি না? কষ্ট করলেই যদি ভগবানকে পাওয়া যায় মনে করো—বনে কি পাহাড়ে চলে যাও না। নগরে লোকালয়ে বাস করতে এলে কেন?'

অভিভাবকের দ্বারা তিরস্কৃত বালকের মতোই কৃষ্ণপ্রাণ মৌন হয়ে যান, নীরবেই শুয়ে পড়েন।

॥ ২৫ ॥

শ্যামসুন্দর সম্বন্ধে যতই যা ভেবে থাকুন—কে যে প্রতি রাত্রি জেগে তাঁর সেবা করে—তা কৃষ্ণপ্রাণ ভাবতে পারেন নি।

ওঁর নিদ্রার সময় খুবই অল্প, রাত্রির তৃতীয় প্রহরের কিছু অবশিষ্ট থাকতেই শয্যাত্যাগ করেন—শয়ন করতে এক একদিন দ্বিপ্রহরও হয়ে যায়। সুতরাং যতটুকু নিদ্রা হয়—প্রগাঢ়, স্বপ্নহীন। কোন ভক্ত সেবা করছে জানলে উৎকণ্ঠিত থাকেন—যেমন কিশোর শিবদাসের বেলায়—তখন উঠে দেখেন সে তখনও জেগে আছে কি না; ঘুমিয়ে পড়েছে দেখলে—তার কোন কষ্ট হচ্ছে কি না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন। বিষ্ণুদাদের বেলায় সেটুকু চিন্তাও থাকে না। উনি নিদ্রিত হয়ে পড়লে সে নিঃশব্দে বাইরে গিয়ে প্রবেশপথের সামনে শুয়ে পড়ে।

শ্যামসুন্দরের সম্বন্ধে তেমন কোন উদ্বেগও ছিল না। এ বালক অন্য ধাতুতে

গঠিত। এ কোন কথাও শুনবে না। আবার যা প্রয়োজন আদায় করে নিতেও পারবে। এর সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে এমন কথা মনে হয় নি কখনও।

প্রগাঢ় সুষুপ্তিতে অচেতন ছিলেন, সহসাই কি এক কারণে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর, আর চোখ মেলতেই চোখে পড়ল, পাখা দিয়ে মৃদু ব্যজন করতে করতে—এক ভাবে, হাত বন্ধ হচ্ছে না—নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে আছে ওঁর মুখের দিকে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের প্রায় মধ্যভাগ সেটা, অভ্যাসবশতঃই অনুভব করলেন—আর কিছু পরে—চার পাঁচ দণ্ড কাল পরে—তাঁর জাগ্রত হওয়ার কথা। এতক্ষণ জেগে থাকে নাকি প্রত্যহ? তিনি জানতে পারেন না!

কে জানে অন্য দিন নিদ্রা তরল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—চক্ষু উন্মীলিত করার পূর্বেই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন—সেই শব্দেই বোধহয় ছেলেটা সরে যায়। আজ নিঃশব্দে চোখ খুলেছেন বলে সতর্ক হবার সময় পায় নি।

'তুই এখনও জেগে আছিস!' বিস্মিত কৃষ্ণপ্রাণ অনুযোগের স্বরে প্রশ্ন করেন, 'রাত যে শেষ হতে যায়, এখনও ঘুমোস নি কেন?'

কেমন এক প্রকারের গাঢ় মৃদুকণ্ঠে বলে 'আমি আরও পরে শুতে যাই। তুমি ঘুমোও, এখনও ওঠার সময় হয় নি।'

ওর সেই কণ্ঠস্বরে আর নিমেষহীন চাহনিতে কি মনে হ'ল, উনি উঠে বসে ওর ডান হাতটা চেপে ধরে প্রশ্ন করলেন, 'তুই কি প্রতিদিনই এমনি জেগে থাকিস নাকি?'

'কি জানি।' আগের মতোই নিম্নকণ্ঠে বলে—অতি সংক্ষেপে।

'কি জানি কি রে! তুই ঘুমোতে যাস কি না তুই জানিস না!'

'তোমার দিকে চেয়ে তোমার গায়ে হাত বুলোতে কি বাতাস করতে করতে আমার কোন হিসেব থাকে না। আর সে হিসেবে দরকারই বা কি?'

'না না, এসব ভাল না। ছেলেমানুষ, না ঘুমোলে শরীর ভেঙে যাবে যে।'

'ঘুমুই না কে বললে! তুমি তো ওঠো বলতে গেলে মাঝ রাত্রে, আমি তারপর অনেকটা সময় পাই ঘুমিয়ে নেবার।'

'সে আর কত। আবার তো আমার সঙ্গে স্নান-দর্শনে যাস।'

'আমার বেশী ঘুম লাগে না। আমি জেগে থাকতেই ভালবাসি। তুমি শুয়ে পড়ো, আমার কথা ভাবতে হবে না।'

সে এক রকম জোর ক'রেই ওঁকে শুইয়ে হাত দিয়ে চোখ দুটো বুজিয়ে দেয়।

'তুই না শুলে আমি ঘুমোব না।' জেদ করেন কৃষ্ণপ্রাণ।

'আমি শোব ? তোমার ভাল লাগবে ?' কেমন এক অদ্ভুত গলায় বলে।

তারপর একেবারে শিশুর মতো ওঁর কোলের কাছে শুয়ে পড়ে আস্তে আস্তে ওঁর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'তুমি এবার ঘুমোও লক্ষ্মীটি, সত্যি আমি ঘুমিয়ে পড়ব, কথা দিচ্ছি।'

পরের দিন শোবার সময় বার বার সতর্ক ক'রে দেন কৃষ্ণপ্রাণ, 'না না, অমন ক'রে রাত জাগিস নি। আমি একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর আমার সেবার কোন দরকার পড়ে না। তুইও শুয়ে পড়িস, আমার কাছে—না হয় এখানেই শুয়ে থাকিস !'

'আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। সন্ন্যাসীর আবার এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন ?'

প্রথমটা গা হাত পা টিপে দেয় খুব মৃদু ভাবে, সবটাই তো প্রায় হাড়, জোরে টিপলে লাগবে—এ হুঁশটা ওর থাকে। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আস্তে আস্তে বাতাস করে। এটুকু উনি জানেন। সে সেবা যে সারারাত প্রলম্বিত হয় তা মনে করেন নি কখনও। অন্য কোন ভক্তই তো তা করে নি কোন দিন। তাদেরও ক্লান্তির যথেষ্ট কারণ থাকে, সহজেই নিদ্রাতুর হয়ে পড়ে।

এ ছেলেটাও তো সারাদিন ঘোরে, সন্ধ্যার পর এখানে ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা হয়—নানাবিধ পাঠ ও ব্যাখ্যা—কোনদিন আবার নামকীর্তন, ছেলেটাও তো সেখানে ওঁরই কাছে বসে থাকে। ঘুম তো তখনও হয় না। ঘুম বা বিশ্রাম। যেদিন কিছু আগে ভিক্ষা হয়, সেদিন রাত্রে ওকে ডেকে বিষ্ণুদাস কিছু খাইয়ে দেন—কৃষ্ণপ্রাণ একাহারী—সেই সময়টুকু মাত্র সে কাছে থাকে না। তবে তাতে তো আর বিশ্রাম সম্ভব নয়। সত্যিই কি ওর বিশ্রাম কি নিদ্রার প্রয়োজন হয় না !···

সেদিন সতর্ক হয়ে ছিলেন বলেই বোধ হয়—গাঢ় ঘুমের মধ্যে একবার সচেতন হলেন।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই বর্ষা নেমেছে, বৃষ্টি, দমকা হাওয়া—মধ্যে মধ্যে মেঘ-গর্জন—হয়ত তাতেও ঘুম ভাঙতে পারে—চেয়ে দেখলেন, আজ আর পাখা নেই হাতে, আজ আর গরম লাগছে না এখানেও, তবে গায়ে হাত বুলনো তখনও

চলছে, খুব মৃদু আলতো ভাবে—আর তেমনি নিমেষ-পাতহীন চোখে চেয়ে আছে ওঁর দিকে—

কৃষ্ণপ্রাণ বললেন, 'আজও ঘুমোও নি তুমি। মরে যাবে যে!'

তারপর জোর ক'রে কাছে শুইয়ে ওর গায়ে হাত রেখে বললেন, 'হ্যা রে, একদৃষ্টে অত কি দেখিস বল্ তো!'

'তোমাকে দেখতে ভাল লাগে—তাই দেখি।'

'আমাকে দেখতে ভালো লাগে কি রে! আমি তো এই বুড়ো, শুকনো, বিশ্রী দেখতে হয়ে গেছি—তুই-ই তো বলিস ঘাটের মড়া।'

'কি জানি। সে কথা তো ভেবে দেখি নি কোনদিন। ভাল লাগে এই তো ঢের—তার অত কারণ খুঁজতে যাব কেন? ভাল লাগা উচিত কি অনুচিত—বুড়ো কি ছেলে সে হিসেবেই বা দরকার কি?'

'কেন লাগে তার কোন কারণ মনে হয় না তোর?'

'তোমার কৃষ্ণনাম ভাল লাগে কেন, সে হিসেব করেছ কখনও?'

তারপর গলায় জোর দিয়ে বলে, 'তোমারই বা এই নিষুতি রাতে এত বাজে বকুনি কেন? চুপ করে ঘুমোবার চেষ্টা করো দিকি।'

সে সহসাই ওঁকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে। বুকে গায়ে মুখ ঘষতে থাকে।

বিস্ময়ের সীমা থাকে না কৃষ্ণপ্রাণের।

ওরা যা বলে তাই কি সত্য তাহলে? ছেলেটা কি পাগল?

পরের দিন রাত্রে যখন পায়ের কাছে এসে বসেছে, কৃষ্ণপ্রাণ বললেন, 'আয় আমি তোকে দীক্ষা দিই। আনন্দ পাবি। আমায় যেমন ভালবাসিস তেমনি এই ভালবাসা তাঁকে দে, তাঁকে পাবি।'

'কই তুমি পাচ্ছ?' শ্যামসুন্দর বলে, 'তুমিও তো সন্ন্যাসী, জপতপ কিছুই বাদ দাও নি, তাঁকে ভালবাসবে বলেই সংসার আত্মজন সব ছেড়েছ—তবে কোথা কৃষ্ণ কোথা প্রাণনাথ বলে কাঁদ কেন?...ওসব কিছু না। এই ভালবাসা মানুষকে দিলে অনেক পেতে, প্রাণ ভরে যেত।'

সহসা যেন বেত্রাহতর মতো লাফিয়ে উঠে বসেন কৃষ্ণপ্রাণ।

এ কে? কি বলছে ও? এমন কথা তো আর কেউ কোন দিন বলে নি!

'হ্যা রে, তুই ভগবানকে চাস না? এই সব সুখদুঃখের বাইরে যেতে?

জগন্নাথকে ভাল লাগে না ?'

'ছাই। কী এক রকমের মূর্তি—দেখলে ভয় করে। তোমাকে আমার ঢের বেশী ভাল লাগে।'

উনি আর কোন কথা বলেন না—ওরই মতো একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন ওর মুখের দিকে। সব কেন আজ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তাঁর। এতদিনের সাধনা ধারণা কল্পনা—সব। ওঁর মনের ভাব কি ছেলেটা বোঝে ?

সে আস্তে আস্তে ওঁকে শুইয়ে দেয়। বলে, 'তুমি ঘুমোও, আমিও শুচ্ছি তোমার কাছে, আজ ঘুমিয়ে পড়ব, ঠিক—দেখো।'

তারপর কোলের কাছে গুটিসুটি মেরে শুয়ে বলে, 'আমাকে একটু ভালবাসো না। ভালবাসতে ইচ্ছে হয় না ?'

'কি বকছিস পাগলের মতো। ভালবাসা কি কোন বাইরের জিনিস—গাছের ফল যে এনে তোর হাতে দেব ? আর ভালবাসে মানুষ তার মাকে একরকম, স্ত্রীকে একরকম, ছেলেকে একরকম, নাতি নাতনি তাদের একরকম। আমার তো সে সব কিছুই নেই, যাকে ভালবাসতুম, এখনও বাসি—এই পর্যন্ত, সে বহু দূর অতীতের কথা। বাৎসল্য অপত্যস্নেহ—এইটেই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক, ক্রমশ আসবে, কিছুটা হয়ত এসেওছে।'

'ওমা, ভালবাসা আবার এভাবে ওজন ক'রে ভাগ ক'রে রকম রকম ভাবে আসে বুঝি ? ভালবাসলে এ বিচার থাকবে কেন ? তুমি যে জগন্নাথকে ভালবাসো, ওটা কি মূর্তি বলো তো ? মেয়ে না পুরুষ, শ্যাম না শ্যামা, কিছুই তো বোঝা যায় না। তবে অমন পাগলের মতো ভালবাসো কি ক'রে—প্রহর ধরে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকো ! এই যে আমি তোমাকে ভালবাসি—তুমি আমার স্ত্রী কি স্বামী, বাবা কি মা—এসব কথা তো মনে পড়ে না। তুমি পুরুষ কি মেয়ে—তাও তো কোনদিন ভাবি নি। তোমার মতো ভাগ ভাগ ক'রে ধরে, ছেলের এইটুকু নাতির এইটুকু—ভালবাসা যায় নাকি ? মনের মধ্যে এত রকম ভালবাসা থাকে ? যাকে ভালবাসবে তাকে সবটুকু দিলে তবে তো তার ভালবাসা পাবে। ভগবানকেই যদি ধরো, তাঁকেও সবটুকু না দিলে তিনি সবটুকু দেবেন কেন ?'

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলে, 'ভগবানকে ভালবাসো বলছ—কালই তো পণ্ডিত ভাগবত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছিল, "তিনি অখণ্ড, পূর্ণ। তিনিই

পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। ব্রহ্মেরই দুই স্বরূপ।" তুমি তাহলে কি ভাবে ভালবাসো তাঁকে, কি ভাবে ত্থাখো ?'

কৃষ্ণপ্রাণের বুকের মধ্যে প্রবল একটা ঝড় উঠেছে। বাইরের ঐ ঝড়ের থেকে ঢের বেশী প্রবল, উত্তাল। এসব কি শুনছেন তিনি? এতকাল পরে এ বালক কী সব শোনাচ্ছে তাঁকে।

অনেকক্ষণ পরে যেন নিজেকে কতকটা সম্বরণ ক'রে নিয়ে বললেন, 'আমি তাঁকে প্রকৃতি ভাবে স্ত্রী ভাবে ভালবাসি। আমি যেন সেই রাধা, সেই গোপিনী —এই ভাবে। তাঁকে আমার স্বামী, আমার প্রেমিক, আমার সর্বেশ্বর—এই ভাবে দেখি।'

'ত্থাখো, তুমি তো স্ত্রীলোক নও, স্ত্রী নিয়ে ঘর করো নি, সে ভালবাসা কেমন তা বুঝলে কি ক'রে? ভালবাসার আবার অত ভেদ কি!'

তারপর বলে, 'আচ্ছা, তুমি তো তাঁকে স্বামীর মতো, প্রেমিকের মতো ত্থাখো বললে, সেইভাবে তাঁকে চাও। তার মানে নিজেকে মেয়েছেলে বলে কল্পনা করো। এই তো? তবে অত প্রকৃতিসংসর্গের ভয়ে শিটিয়ে থাকো কেন? পাছে কোন মেয়েছেলের ছায়া গায়ে লাগে এই ভয়ে সাবধান হতে হতে তোমার ভগবানের কথাও ভুলে যাও। ঐ যে তোমার অতবড় ভক্ত, কঠোর তপস্যা করে এই কাঁচা বয়সে, রসনা জয়—অত বোধহয় তুমিও করতে পারো নি —এক বুড়ীর কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়েছিল বলে তাকে তুমি ত্যাগ করলে চির-দিনের মতো। লোকটা সেই দুঃখে আত্মঘাতী হ'ল—বিষ্ণুদাদা পর্যন্ত তার জন্যে কত কেঁদেছে। কেন, এত কিসের অহঙ্কার—সাধু বলে—না পুরুষ বলে? তিনিই যদি এক পুরুষ হন, তোমরা তো সবাই মেয়ে, মেয়েছেলের ভয়ে দিনরাত কাঠ হয়ে থাকো কেন? নিজেকে এখনও পুরুষ ভাবো, আর এদিকে বলছ মেয়েছেলে হয়ে ভগবানকে পুরুষ ভেবে তাঁকে ভালবাসবে! ঐ তো কালই পণ্ডিত বলছিল, এ সংসারে এ বিশ্বে সেই এক জনই পুরুষ, আমরা সকলেই তাঁর প্রকৃতি। কতরকম কথা তোমাদের!'

উঠে বসতে চান কৃষ্ণপ্রাণ। তাঁর বুকের মধ্যে যে ভাবে আকুলিবিকুলি করছে—বাইরে ঐ বৃষ্টি আর বজ্রপাতের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে তবে বোধহয় কিছুটা শান্তি পান।

কিন্তু উঠতে পারলেন না। শ্যামসুন্দর এমনভাবে জড়িয়ে আছে, ওঠা সম্ভব

হ'ল না। আধশোয়া অবস্থায় কনুইয়ে ভর দিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলেন, 'শ্যাম, শ্যাম—ঠিক ক'রে বলো তুমি কে, তুমি কি!'

'অত আমি জানি না। তুমি কি তাও যেমন ভাবি নি, আমি কি—তাও না।…ঘরে তো আলো জ্বলছে, চেয়ে ছাখো না।'

গৃহে ক্ষুদ্র একটি প্রদীপ জ্বলে সারারাতই। সামান্য হলেও অভ্যস্ত চোখে তা-ই যথেষ্ট।

সেই আলোতেই একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে যান, সত্যই কেমন যেন সব একাকার মনে হয়। স্ত্রী কি পুরুষ, বালক কি বৃদ্ধ—কোন জ্ঞানই থাকে না। অনাদি-কালের দুটি সত্তা তাঁরা—কিম্বা একই।

সব একাকার, কেবল সামনে দেখেন করুণ কোমল স্নিগ্ধ দুটি চোখ, সে যেন বিপুল অতল এক প্রেমের সরোবর। প্রেম আর করুণা—আর কেউ নেই, আর কিছু নেই।

চেয়েই থাকেন।

তারপর মনে হয় সেই সরোবরে তিনি ডুব দিয়েছেন, ডুবে যাচ্ছেন।

আর কিছু নেই। তিনিও নেই।

আর কোন জ্ঞান থাকে না, কাকে দেখছেন, কি দেখছেন কিছুই মনে থাকে না।

অনন্ত অপার ভালবাসা, অমৃতর চেয়েও যদি শ্রেয় বস্তু থাকে—এ সেই।

কিছু ভাবার চেষ্টা করেন, চেষ্টা করেন কিছু চিন্তার। সন্ন্যাস, তপস্যা, লক্ষ্য। নানা প্রসঙ্গ মনে করার চেষ্টা করেন। বিগত বর্তমান জীবন। কিছুই ভাবতে পারেন না। শুধু আনন্দ, সব একাকার করা আনন্দ।

এই স্নেহ, এই একাত্মতা অভিন্নতা. এমন আনন্দ আর কখনও অনুভব করেন নি তো!

তিনি বালকের মাথার ওপর মুখ রেখে শুয়ে পড়েন আবার। ততক্ষণে দুই চোখ আচ্ছন্ন ক'রে নেমেছে জলের ধারা। সে বালকও তাঁর কণ্ঠের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বার বার উচ্চারণ করে—'শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ'।

॥ ২৬ ॥

গত কয়েক দিন ধরেই অন্তরঙ্গ ভক্ত-সঙ্গী অনুগামীদের সমাজে একটা নিতান্ত প্রাকৃতজনোচিত মনোভাব দেখা দিয়েছিল।

প্রথমে অস্বস্তি ও বিস্ময়। তার পর ঈর্ষা—তা থেকে বিরূপতা, ক্ষোভ।

প্রথমে যা সীমাবদ্ধ ছিল চোখের চাহনিতে, ভ্রূকুটিতে, দৃষ্টি-বিনিময়ে—ক্রমে তা ভাষায় প্রকাশ পেতে লাগল।

ক্ষোভ থেকে বিক্ষোভ। তা থেকে ক্রোধ। 'ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ' এই ভগবদ্বাক্য প্রমাণিত ক'রে ইতরজনের মতোই তাঁদের রসনা ঐ বালকের প্রতি কটু বাক্যে এবং গুরুর প্রতি অশুচি ভাষণে নেমে এল।

গুরুর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে। তাই একটা সুযোগ-সন্ধানী বালকের মোহে কাণ্ডা-কাণ্ড জ্ঞান হারিয়েছেন।

এর প্রতিকার-প্রচেষ্টা যদি না করেন তাঁরা, তাঁদেরই প্রত্যবায়। ধর্মের কাছে পতিত হবেন তাঁরা।

এ উত্তেজনার মধ্যে একবারও তাঁদের কারও মনে হ'ল না, কেউ স্মরণ করিয়েও দিল না যে—এই ইতর ঈর্ষায় তাঁদেরও এতদিনের সাধনা সংযম গুরু- ও ইষ্টভক্তি সম্ভবত বিনষ্ট হ'ল।

অথবা তা ছিলই না আদৌ। একটা ছদ্ম আবরণ মাত্র ধারণ ক'রে অপরের ভক্তি-শ্রদ্ধা আহরণ করছিলেন, নিজেদেরও প্রবঞ্চিত করছিলেন। এবার স্বয়ং ইষ্টই সে নির্মোক উন্মোচিত করে তাঁদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করলেন।

শেষ পর্যন্ত বহু আলোচনা, বহু কদর্য বাক্য ও ইঙ্গিতের অবতারণার পর স্থির হল প্রভুর এই মোহভঙ্গের ব্যবস্থা করতেই হবে। তাঁদের দায়িত্ব এটা।

পরিষ্কার বলতে হবে গুরুকে—ভক্ত-সমাজে তো বটেই—বৃহত্তর জন-সমাজেও—তাঁর এই মোহগ্রস্ততার প্রতিক্রিয়া কোন্ আকার ধারণ করছে।

কিন্তু কে সে কার্যের দায়িত্ব নেবে?

তা নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিল অবশ্যই। মুখে যে যাই বলুক—এ অপ্রিয় কার্যে অগ্রসর হতে অধিক সাহসের প্রয়োজন।

শেষ পর্যন্ত, সুব্যবস্থা হ'ল বলা যায় না, অন্তত অনিচ্ছায় সম্মত করানো হ'ল স্বরূপানন্দকে

বয়স্ক ভক্ত স্বরূপানন্দ—যিনি প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য পণ্ডিত বলেই পরিচিত—এসে বললেন, 'প্রভু, আমার অপরাধ নেবেন না। নিতান্ত বাধ্য হয়েই একটা নিবেদন নিয়ে এসেছি।'

তখনও পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয় নি, সূর্যের আবির্ভাব প্রত্যাশায় অধীর ঊষার লজ্জা-রক্তিমা প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। কৃষ্ণপ্রাণের প্রভাত-কৃত্য ধ্যান জপ শেষ হয়েছে। তিনি আসন ত্যাগ করতে যাচ্ছেন—এই সময়ই পণ্ডিত করজোড়ে এসে দাঁড়ালেন।

অর্থাৎ তিনি বহুক্ষণ ধরেই এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আজকাল শ্যামসুন্দরের অহর্নিশ সাহচর্যের জন্য ওঁকে একা বা নির্জনে পাওয়াই যায় না। সেও ওঁর ধ্যান-জপের সময় ও কাল অবগত আছে, এখনই হয়ত কাছে এসে দাঁড়াবে।

ঠিক সুযোগটির জন্য এই একাগ্র প্রতীক্ষা এবং কণ্ঠস্বরের ভয়মিশ্রিত গাম্ভীর্য—এতেই সন্ন্যাসী বুঝলেন কোন গুরুতর সমস্যার কথা তুলবেন পণ্ডিত। ভয়—যদি গুরু, যিনি ওঁর কাছে সাক্ষাৎ গোবিন্দ—ওর প্রতি ক্রুদ্ধ হন এ প্রসঙ্গে? কেবল ভয়ই নয়, সেই অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠের মধ্যে কোথায় উনি একটু প্রচ্ছন্ন অভিমান ও অনুযোগও লক্ষ্য করলেন।

যখন প্রায় সমস্ত জগদ্বাসী নিদ্রামগ্ন, সেই দুর্লভ নির্জন অবসরে ব্রহ্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের চেষ্টা করেন, ইষ্টের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার। ফলে কখনও ব্যথা, কখনও অপার্থিব আনন্দ দুই-ই অনুভব করেন। সে ব্যথাও কোন পার্থিব ব্যথার সঙ্গে তুলনীয় নয়। ফলে যখন এই ধ্যানজপের মধ্যেই কখনও কখনও মন সেই মনের সুদূর গহন অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয়—তখন জপও যায় বন্ধ হয়ে। শুধুই এক লোকোত্তর অনুভূতি থাকে সমস্ত সত্তা সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন ক'রে। তার পর যখন সে আচ্ছন্নতা তন্ময়মগ্নতা থেকে জেগে ওঠেন, তখনও মাধুর্যের রেশ বিদূরিত হয় না, সে অমৃতাস্বাদের কিছুটা থেকে যায় চেতনে ও অবচেতনে—বাস্তব-প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ বা কদর্য সংঘাত তাকে অপরিহার্য মালিন্য দ্বারা নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত।

কৃষ্ণপ্রাণ নির্বোধ নন। পণ্ডিতের কণ্ঠস্বরেই অনুযোগ ও অভিমানের আভাস পেয়ে প্রসঙ্গটা কোন্ পথ ধরে যাবে তা অনুমান করতে পেরেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রাভাতিক-ইষ্ট-অর্চনাস্নিগ্ধ ললাটে ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছিল।

সে ভ্রূকুটি বিরক্তি কি উষ্মার নয়—বেদনারই।

মানব-মন বুঝি যুগযুগান্তের অভ্যস্ত কলুষ ও সঞ্চিত আবর্জনার পঙ্ক কাটিয়ে সত্যকার উর্ধ্বে উঠতে পারে না। তাই তাদের ভুল বোঝারও অন্ত থাকে না। আর যে যতই প্রজ্ঞাধান হোক—অপরের প্রতি অবিচার করতেও দ্বিধা করে না।

কিছুক্ষণ মৌন থেকে কৃষ্ণপ্রাণ বললেন, 'বলো, কি বলবে। কিন্তু এটা আমার বড় দুর্লভ অবসর। এই অল্প মাত্রই সময় পাই নিভৃতে ইষ্ট স্মরণ করতে—তার পরও মন সেই রসে কিছুক্ষণ অন্তত নিমগ্ন থাক এইটিই আমার অভিলাষ। এই সময়ই তুমি বেছে নিলে !···যাক্, যা অনিষ্ট হবার তা হয়েই গেছে, এখন বলো কি বলবে।'

পণ্ডিত পায়ের কাছে বসে পড়ে ওঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম ক'রে বললেন, 'প্রভু, এ যে আপনার কি পরিমাণ ক্ষতি, আমি বুঝি। কিন্তু অনেক চিন্তা ক'রেও অন্য কোন অবসরের কথা ভাবতে পারি নি। আর, আবারও করজোড়ে জানাচ্ছি, আপনি আমার কাছে প্রত্যক্ষ ইষ্ট—এ প্রসঙ্গ তুলতে আমিও কম ব্যথা অনুভব করছি না।'

তারপরও কিছুক্ষণ ইতস্তত ক'রে সঙ্কোচ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'প্রভু, ঐ বালকটি যে ভাবে আপনার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, প্রকাশ্যে সর্বজনসমক্ষে যে ভাবে সমবয়স্কর মতো আপনার সঙ্গে কথা বলে—এবং প্রায় দিবারাত্রই আপনার সঙ্গে থাকে, আপনার নিভৃত বিশ্রামপ্রকোষ্ঠে রাতে এমন কি দিবাভাগেও শয়ন করে—এতে আপনার বিপুল ভক্তজনসমাজে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ক্ষোভ এবং দুঃখও। আমাদের মধ্যে—এই কজন আপনার করুণাধন্য সেবকের মধ্যে হলে এ নিয়ে চিন্তা কি আলোচনা করার কোন কারণ ছিল না। এ আলোচনা বিস্তৃত ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এ বালকের মা বিধবা, অল্পবয়সী, সুশ্রী—বালককে উপলক্ষ্য ক'রে তার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনাও খুব দূরকল্পিত নয়—এ ইঙ্গিতও দিচ্ছে কেউ কেউ। ভক্তগণের ক্ষোভ, ইতরশ্রেণীর লোকের ব্যঙ্গবিদ্রূপ নানা স্থানে নিন্দুকের রসনাকে মুখর ও নিন্দা-লোলুপ ক'রে তুলবে, এও স্বাভাবিক। তার ফলেই এ প্রসঙ্গের এত বিস্তৃতি। আপনার এই দীর্ঘদিনের কঠোর তপস্যা, লোকোত্তর সাধনার ফলে অর্জিত দেশদেশান্তর ব্যাপী খ্যাতির সূর্যালোক, এই রাহু ছায়াবৃত করলে আমাদের—আপনার স্নেহগর্বিত, আশীর্বাদপুষ্ট নিত্য-সেবকদের দুঃখের অবধি

থাকবে না।···আপনার নিকট এই কদর্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করতে হ'ল—এ পাপ নিত্য লক্ষ নাম জপেও স্খালিত হবে কি না, এই চিন্তাই আমাদের উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছে।'

তিনি আবারও প্রণাম ক'রে নীরব হলেন।

কৃষ্ণপ্রাণও কোন উত্তর প্রদান করলেন না, অনুযোগ কি তিরস্কারও না।

ততক্ষণে পূর্বাকাশের অরুণাভা বৃক্ষলতা ভেদ ক'রে সেই পূজার আসনেও পৌচেছে। চোখ তুলে দেখার সাহস থাকলে পণ্ডিত দেখতে পেতেন, অব্যক্ত যন্ত্রণায় ও দুঃখে, ইতর রসনার অশুচিতায়, মানুষের এই মনোভাবের প্রতি ঘৃণায় —এবং সর্বোপরি ঐ নিষ্পাপ আশ্চর্য বালকের প্রতি স্নেহে করুণায় প্রেমে ওঁর চক্ষু দুটি শুধু নয়,সমস্ত সুগৌর দিব্যদ্যুতি-মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করেছে; চক্ষুর ঠিক পাশের শীর্ণ শিরা স্ফীত ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিরুদ্ধ আবেগে রগের দুই পাশের ধমনীতে দ্রুত ও অধিক রক্ত-চলাচলের চিহ্ন বহু দূর থেকেও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।···

আর অল্পক্ষণের মধ্যে স্নানসঙ্গীরা এসে পড়বেন্।

কৃষ্ণপ্রাণ উঠে দাঁড়ালেন। পণ্ডিতও অপরাধীর মতো অবনতমস্তকে উদ্যানের পথে আশ্রমদেবতার মন্দিরাভিমুখে চলে গেলেন।

সকলের আগে এল শ্যামসুন্দরই।

সে-ই ওঁর শুষ্ক বহির্বাস বহন করে নিয়ে যায়। আজও কুঠিয়ার মধ্য থেকে বহির্বাস সংগ্রহ ক'রে নিকটে এসে কি বলতে গিয়েও ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সেও ওঁর দিকে চেয়ে আছে, কৃষ্ণপ্রাণও তার দিকে।

কৃষ্ণপ্রাণ দেখলেন, আশঙ্কা নয় উৎকণ্ঠা নয়—বিস্ময় বা অনুযোগের চিহ্নমাত্র নেই। দুটি চোখে শুধু অপার অপরিসীম স্নেহ—এমনও মনে হ'তে লাগল যে স্নেহ নয়, করুণাই—আর ওষ্ঠপ্রান্তে কোন এক আশ্চর্য কারণে প্রচ্ছন্ন কৌতুকের ঈষৎ বক্রতা।

সেদিন কৃষ্ণপ্রাণের ভাবান্তরে তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীরা কৌতূহলী ও শঙ্কিত হলেও—তাদের চিন্তা প্রকৃত কারণের পথে গিয়েছিল কিনা সন্দেহ। সকলেই আপন আপন মানসিক গঠন মতো কল্পনা কিরছল, তবে শঙ্কা বোধ করছিল সকলেই।

কৃষ্ণপ্রাণ নীরবেই স্নান সমাপন ক'রে মন্দিরে গিয়েছিলেন কতকটা অভ্যাস-বশতই। তবে অভ্যাসেরও ব্যতিক্রম ঘটে ছিল কিছু, সমুদ্র যাতায়াতের পথে নিত্য যেসব ভক্ত-বন্ধু মিলন ঘটত,—ঐ সময়েই কোন কোন দিন নির্মল কৌতুকে কাব্যচর্চায় নাট্যচর্চায় মুখর বা চপল হয়ে উঠতেন—তাঁদের কুঠিয়া বা বাসগৃহ পরিহার ক'রেই গিয়েছিলেন।

অপর দিন অপেক্ষা বিলম্ব ঘটেছে—কেউ কেউ আগেই বেরিয়ে পড়েছেন—এই ভেবেই মনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন সম্ভবত।

সাধারণত মন্দিরে গিয়ে দর্শন—বহুক্ষণব্যাপী দর্শন ও মননের পর বেরিয়ে এসে প্রতীক্ষমাণ কীর্তনদলে যোগ দিয়ে নামকীর্তনে মেতে ওঠেন। কিন্তু সেদিন মন্দিরেই গরুড় স্তম্ভ আলিঙ্গন ক'রে দণ্ডায়মান রইলেন প্রায় এক প্রহর কালের মতো। দুই চক্ষু বিস্ফারিত, জগন্নাথের মূর্তির উপর স্থির—সেই সঙ্গে বিস্ফারিত চক্ষু প্লাবিত করা দরবিগলিত অশ্রুধারা তাঁর কপোল বক্ষ সিক্ত করছে। এ দৃশ্য দেখার পর আর কারও তাঁকে আহ্বান করতে সাহস হয় নি।

তারপরও, জগমোহন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কীর্তনের দলে যোগ দিলেন না, দ্রুত পদে কুঠিয়াতে ফিরে এলেন।

তখন ভিক্ষা আসার সময় হয় নি। কুঠিয়ায় এসে দরজা বন্ধ ক'রে—যা দিনে রাতে কখনই বিশেষ বন্ধ হয় না—একা স্থির হয়ে বসে রইলেন।

শ্যামসুন্দর মন্দির থেকে কিছু দূরে দূরে অনুসরণ করেছিল—সেও এসে রুদ্ধদ্বারের বাহিরে বসে আছে, তাও, সে কোন কথা না কইলেও উনি বুঝে-ছিলেন।···

সেদিনও ভিক্ষার সময় শ্যামসুন্দরকে একেবারে পাশে নিয়ে বসলেন। বিষ্ণুকে নির্দেশ দিলেন—নাম ক'রে ক'রে—উৎকৃষ্ট মিষ্ট প্রসাদগুলি ওকে দিতে। এমন কি শ্যামসুন্দরও যখন—সেও আজ নির্বাক থেকেই প্রসাদ গ্রহণ করছিল—একখণ্ড মিষ্টান্ন তুলে ওঁর পাত্রে দিল, কৃষ্ণপ্রাণ কোন প্রতিবাদ কি অনুযোগ করলেন না, নীরবেই তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করলেন।

আহার শেষ হলে প্রতিদিনের মতোই ওঁর সঙ্গে শ্যামসুন্দরও পাখা নিয়ে ওঁর শয্যার এক প্রান্তে এসে বসল এবং নিঃশব্দে ওঁকে বাতাস করতে লাগল।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে সেবা গ্রহণের পর গাঢ় মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'শোন্, আমার কাছে, এখানে আয়।'

বিনাবাক্যে পাখা নামিয়ে রেখে শ্যামসুন্দর একেবারে ওঁর বুকের কাছে এসে বসল,—স্থির হয়ে নয়, ধীরে ধীরে ওঁর গায়ে হাত বুলোতে লাগল।

তবু কিছু সময় লাগল।

চোখ মেলে চেয়েও রইলেন কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে। আবারও সেই বিচিত্র অনুভূতি দুর্বোধ্য অভিজ্ঞতা, বর্ণনাতীত। সেই রকম যেন সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ—কিছু জ্ঞান থাকছে না। কখনও মনে হচ্ছে গুরু, কখনও মনে হচ্ছে সখা, কখনও সন্তান।

তবু মনে জোর আনতেই হয়।

বললেন, 'আমি কি বলব তোকে বুঝেছিস তো?'

'বুঝেছি সে কথা আগেই ধরে নিলে কেন?' কৌতুকের সেই চাপা হাসি—চাপা ঠোঁটের ভঙ্গিতে।

'তুই সব বুঝিস।'

'হয়ত বুঝি। চলে যেতে হবে—এই তো?...তবু তুমি বলো। তোমার মুখ থেকেই শুনি।'

বললেন কৃষ্ণপ্রাণ।

'তোর প্রতি আমার স্নেহ, একপ্রকার বশ্যতা স্বীকার—তোর প্রভুত্বর ভাব, অন্তরঙ্গতা, দিনরাত্রি আমার কাছে থাকা নিয়ে অনেক কুকথা উঠেছে। আমি একা হ'লে এসব অগ্রাহ্যই করতাম হয়ত—কিন্তু এতগুলি লোক আমাকে ভক্তি করে, ভালবাসে, এদের মনে যদি আমার কোন আচরণে, কি আমার নামে কুৎসা রটনায় ব্যথা লাগে—নিজেকে দায়ী বলে অপরাধী বলে মনে হয়। তুই ঘরে ফিরে যা। তুই যেখানেই থাকবি আমার আশীর্বাদ আমার শুভেচ্ছা তোর ওপর বর্ষিত হবে। জগন্নাথ স্বামীর কাছে নিত্য প্রার্থনা করব—তোর যেন ঈশ্বর লাভ ঘটে।'

শ্যামসুন্দর ততক্ষণে তার স্ব-রূপে ফিরে এসেছে।

সে বললে, 'জগন্নাথের কাছে নিজের জন্যে যা নিত্য প্রার্থনা করছ—তা কি তিনি দিয়েছেন? তোমার কথায় আমাকে দেবেন, যদি তোমার এত জোর তো তোমাকেই তো আগে দিতেন।'

এই বলে সে খুব খানিকটা হেসে নেয়।

তারপর সহসা একেবারে শিশুর মতো ওঁর বুকে মাথা রেখে বলে, 'অনেক

আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলুম, একটু ভালবাসা পাব বলে—তুমিও তাড়িয়ে দিলে? তুমি তো নাকি ভালবাসার পথে প্রেমের পথে সেবার পথে তোমার ভগবানকে চাও—তিনি যখন আসবেন তাঁকে চিনতে পাববে, গ্রহণ করতে পারবে? · তুমি এখনও এমন সংস্কার আর চলিত ধারণার শেকলে বাঁধা—তাঁকেও হয়ত এমনি ভাবে তাড়িয়ে দেবে।·· কে জানে, হয়ত তিনি এসেওছেন বারবার-তোমার ভালবাসা পেতে, চাইতে—বারবারই তাঁকে এমনি বিদায় ক'রে দিয়েছ!'

তারপর উঠে সাজা হয়ে বসে বলে, যাক, সে তোমার গরজ, তবে আমার জন্যে, নিজে ভিখিরী হয়ে আর একজনের কাছে ভিক্ষা চাইতে হবে না। ঈশ্বর লাভের জন্যে আমি কাঙাল নই, আমি একটু ভালবাসার কাঙাল।···তোমার কি দশা হবে জান? সেই যে গল্প আছে-একটা লোক স্পর্শমণি খুঁজতে খুঁজতে ঘরদোর আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে প্রায় পাগল হয়ে বেরিয়ে গিছল; যেতে যেতে পাথর দেখে আর তুলে হাতের লোহাটায় ঠেকায়, সোনা হ'ল না দেখে দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে যায় অন্য পাথরের খোঁজে। করতে করতে অভ্যেস হয়ে গিছল—শেষে আর লোহাটার দিকে তাকিয়েও দেখত না। এর মধ্যে কবে একদিন লোহাটা সোনা হয়ে গেছে তা টেরও পায় নি। যেদিন অপরে বলল, সেদিন দেখে এমন ঘা লাগল মনে - সেইখানেই পড়ে মরে গেল।'

তারপর একটু হাসি-হাসি মুখে বলে, 'বেশ, চলেই তো যেতে হবে। অনেক দিনের সাধ, যাবার আগে একটু সেবা ক'রে যাই। আমি বাতাস করি, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। সেই ফাঁকে আমি চলে যাবো। তোমার সামনে দিয়ে গেলে তুমি কষ্ট পাবে খুব।'

বলতে বলতে—কৃষ্ণপ্রাণকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ঘন ঘন বাতাস করতে থাকে।

॥ ২৭ ॥

তখনই মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলেন কৃষ্ণপ্রাণ যে তিনি জেগেই থাকবেন। আর তাই তো থাকেন অধিকাংশ দিনই। কিন্তু সেদিনই যে কখন চোখের পাতা বুজে এল তা বুঝতেও পারলেন না।

অতি স্বল্পক্ষণই। তারপরই সচেতন হয়ে উঠে বসে চারিদিকে তাকিয়ে

দেখলেন, পাখাটা পাশে নামিয়ে রেখে সে কখন চলে গেছে।

"বিষ্ণুদাস, বিষ্ণুদাস" বলে ডাকতে ডাকতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

বিষ্ণু বাইরেই ছিলেন, তখনই উঠে এলেন।

'শ্যামসুন্দর—মানে ঐ বালকটি কোথায় গেল ছাখো তো!'

'সে তো আপনার কাছেই ছিল—'

'ছিল তা আমিও জানি। নেই বলেই তো খুঁজে দেখতে বলছি।'

সহসাই যেন অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন।

বিষ্ণু সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন চারিদিকের উদ্যান, মন্দির, বাহিরের পথ পর্যন্ত খুঁজে দেখে এল। সে নেই।

'তবে' যেন কতকটা অশ্বাস দেবার ভাবেই বলেন বিষ্ণু, 'তার পরার ধুতিটা আছে। তার মানে সে বেশীদূর কোথাও যায় নি। এখনই ফিরে আসবে।'

'তোমরা কেউ তার গৃহ চেনো? একটু খবর নিয়ে এসো, সেখানে সে ফিরেছে কিনা।'

'তা যাচ্ছি, কিন্তু প্রভু ঐ আর একটিই মাত্র তো তার কাপড়, কিছুই তো আনে নি, সোমেশ্বর দিয়েছেন বলে তাই—সেটা ফেলে চলে যাবে অন্য কোথাও?'

'আঃ বিষ্ণু—যা বলছি শোন না। হয়ত এখান থেকে দেওয়া বলেই ও সে বস্ত্র নেবে না।'

কিছু পরেই সংবাদ এল—গৃহে সে ফেরে নি। ফিরছে না নাকি দীর্ঘকাল।

কে একজন—ঠিক কৃষ্ণপ্রাণকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হ'ল না—সাধারণ ভাবে, যেন বাতাসকেই নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করল—'কিছু নিয়ে গেছে নাকি, প্রভু অত ব্যস্ত হচ্ছেন!'

আরও কে তেমনিভাবেই উত্তর দিল, 'নেবার মতো প্রভুর ঘরে কি আছে—কয়েকখানা পুঁথি ছাড়া?'

কৃষ্ণপ্রাণের কর্ণে একথা যাওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না। এর উত্তর তিনি দেবেন না—কিন্তু সেই মুহূর্তে উত্তরটা তাঁর নিজের মনেই দেখা দিল—সে নিয়ে গেছে তাঁর শান্তি আর চিত্তস্থৈর্য—হয়ত বা চিরদিনের মতোই।

সান্ধ্যকৃত্য সেরে অন্যদিন ভগবৎ-প্রসঙ্গে যোগ দেন—সেদিন তখনই বেরিয়ে

পড়লেন সমুদ্রের পথে ।

'প্রভু কি এই রাত্রে সমুদ্রের ধারে ছেলেটাকে খুঁজতে যাচ্ছেন নাকি ?' কে একজন বলে উঠল। স্পষ্টই চাপা বিদ্রূপের সুর।

কানে গেল, তবে প্রাণে গেল না। এ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, কদর্যোক্তি তাঁকে আর বিচলিত কি ক্ষুব্ধ করতে পারবে না। যে চিন্তা তাঁর সমস্ত সত্তা, সমস্ত জীবনটাকে মূল সুদ্ধ নাড়া দিয়েছে—তার কাছে সংসার, সমাজ, মানুষ—অনেক ক্ষুদ্র, অনেক তুচ্ছ।

না, শ্যামসুন্দরকে খুঁজতে তিনি যাচ্ছেন না। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—এ তিনি বেশ বুঝেছেন। উনিই তাকে বিদায় করেছেন। কিন্তু তাকেই কি শুধু ? কে জানে। সেই কথাটাই একটু ভাবতে চান।

আসলে আজ নিজেকেই খোঁজবার সময় এসেছে। নিজের লক্ষ্য, নিজের সাধনা—নিজের ব্যর্থতা ! নিজের কলুষ, মনের গোপন পাপও।

সেই তো সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

এত তপস্যাতেও, এত কৃচ্ছ্রসাধনেও মন নির্মল হয় নি।

এক সেবক—সে তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিল, তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন সুদূর নবদ্বীপে, সেখানে মাকে দেখবার কোন লোক নেই, এই অজুহাতে। কারণ ? সে তাঁর ইচ্ছায়—এখন স্বীকার করছেন, অন্যায় ইচ্ছাতে বাধা দিতে এসেছিল বলে। বাধাকে স্বীকার ক'রে নিলেও মনের গোপন উষ্মা যায় নি—বাধাদানকারীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

সবচেয়ে অবিচার করেছেন বোধহয় নিত্যরূপানন্দ অবধূতের প্রতিই।

মাৎসর্য ? অহঙ্কার ?

হ্যাঁ, তাই। মনের অগোচর পাপ নেই। এতদিন প্রাণপণে এই সচেতনতাটাকে সরিয়ে রেখেছিলেন মনের মধ্যে, দেখতে বা সচেতন হতে চান নি। কিন্তু আজ সব হিসাবনিকাশ শেষ করতে বসে, কোন আত্মপ্রতারণার লেশমাত্র রাখবেন না।

আত্মস্বীকৃতিতে আত্মকলুষ মুছে দেবেন।

সহসাই এসেছিলেন নিত্যরূপানন্দ। বলিষ্ঠ পুরুষ, উদাত্ত মিষ্ট কণ্ঠস্বর, ওঁর মতো স্বার্থপর সাধনার সাধ তাঁর ছিল না—শুধুই হরিনাম বিতরণ, সৎবুদ্ধিতে মানুষকে উদ্বোধিত করা—এই ছিল তাঁর লক্ষ্য, তাঁর তপস্যা।

আর একজন উচ্চশিক্ষিত তরুণ উদ্দাম কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তনে নদীয়ায় প্রেমের বন্যা এনেছে লোকমুখে এই অমৃতসংবাদ পেয়েই নবদ্বীপে ছুটে এসেছিলেন, ওঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

এই নিত্যরূপানন্দ অবধূত সেদিন পাশে না থাকলে নবদ্বীপে তান্ত্রিক সাধনার নামে মিথ্যা প্রচারের বর্মাবৃত ব্যভিচারী পাপাচারীদের অত্যাচার দমন করা যেত না।

বস্তুত তিনিই ঐ সব দুষ্কৃতকারীদের বৈষ্ণবভক্তে পরিণত করেছিলেন।

সেই শক্তি, সেই সাহস, সেই উদ্যম তাঁর ছিল।

ছিল বলিষ্ঠ পৌরুষ! সেই সঙ্গে ছিল আশ্চর্য ক্ষমাগুণ, ছিল বুকভরা স্নেহ।

কৃষ্ণপ্রাণ নীলাচলে আসার পরও ওঁর কাছে ছুটে আসতেন। এখানেও তিনি পদার্পণ-মাত্র জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

তাঁর ব্যক্তিত্বে দীপ্তি ছিল, শক্তি ছিল।

ক্রমশ তিনিই যেন নায়ক বা ওঁর মণ্ডলীর প্রধান পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন।

ইদানীং সে প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, এমন কি ওঁর একান্ত ভক্তসমাজে স্বীকৃতও।

ওঁকে তিনি কনিষ্ঠ অনুজের মতো দেখতেন, ওঁর কল্যাণকামী ছিলেন, সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে নিজের ইচ্ছা দিয়ে ওঁর ইচ্ছাকে দমন করতেন। ওঁর শরীরের কথা চিন্তা করেই ওঁর উন্মাদদশাকে সংযত করার চেষ্টা করতেন, যুক্তি দিয়ে ওঁর অকারণ জিদকে খণ্ডন করতেন।

কিন্তু কৃষ্ণপ্রাণের তা ভালো লাগে নি।

তাই উনি সরিয়ে দিয়েছিলেন অবধূতকে।

কারণ একটা ছিল, একটা ইচ্ছা বা সঙ্কল্প মনে মনে রূপ ধারণ করছিল অনেকদিন ধরেই।

গৃহস্থ জীবন যাপন করেও যে সাধনা করা যায়, এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তবে সে কাজের জন্য বিশেষ ক'রে অবধূতকে নির্বাচন করার কি খুব প্রয়োজন ছিল?

উনি তাই করেছিলেন। নিত্যরূপানন্দ ছাড়া এ কার্য আর কারও দ্বারা সম্ভব হবে না এই কারণ দেখিয়েই উনি তাঁকে বঙ্গদেশে পাঠিয়েছিলেন—সেখানে বিবাহ ক'রে আদর্শ জীবন যাপন করার অনুরোধ জানিয়ে।

অবধূত কি বুঝেছিলেন কে জানে, ওঁর এই অদ্ভুত অনুবোধকে আদেশজ্ঞানে শিরোধার্য ক'রে নিঃশব্দে চিরকালের মতো সবে গিয়েছিলেন ওঁব জীবন থেকে।

আজ বুঝছেন কৃষ্ণপ্রাণ যে, শুধু নিজেব এই শুভবুদ্ধিকে কার্যকর করার জন্যই নয়—ওঁর প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তাঁর প্রাধান্যে, এই যে ধটাও ওঁকে উদ্বুদ্ধ কবেছিল এই অনুরোধে। তিনি ওঁর অন্তরঙ্গ-মণ্ডলীবও প্রধান নায়ক হয়ে উঠেছিলেন—এটা ভাল লাগে নি।

এই অবধূত জানতেন যে মানুষকে ভালবাসার মধ্যেও ঈশ্বরের স্পর্শ পাওয়া যায়। ঈশ্বব স্বয়ং সে ভালবাসা গ্রহণ করবেন। প্রতিদানও দেন।

ঈশ্বরেব প্রেম মানুষেব মধ্য দিয়েই মানুষেব কাছে পৌছয়।

সে উপলব্ধি ওঁর মধ্যে আসে নি—আত্মঅহমিকাব জন্য।

উনি নিজের সাধনাব জোবে ঈশ্বরকে স্ব-রূপে সীমায়িত করে মাটিতে টেনে আনবেন এই অহঙ্কার পোষণ কবেছেন, স্বার্থপবেব মতো ভেবেছেন সে অমৃত উনি একাই আস্বাদন করবেন, কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না।

তা-ই এসেছে অবশ্য, ওঁব প্রতি করুণায় তিনি সেই অমৃত নিয়ে এসেছেন বাব বার।

কিন্তু শ্যামসুন্দর যা বলেছিল— সেই স্পর্শমণি-লোভী উন্মাদেব মতোই তা চেয়ে দেখার কি বোঝার সময় পান নি—ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

সবই বলেছে ঐ বালক। তিনিই নির্বোধ, কিছু বোঝেন নি বুঝতে চান নি। পুরনো সংস্কারে বাঁধা তাব মন, নতুন কোন কথা ভাবতে দেখতে চায় নি।

একদিন বলেছিল না, একটা কথা? 'তোমার ঠাকুর যা তোমাব কাছে আসেনই, সেদিনের সে আনন্দ আমি ছাড়া কে বুঝবে, কে তার ভাগ নেবে? এই যে লোকগুলো তোমাকে নকল কবাব চেষ্টা কবে—তাদেব কি সাধ্য সে সিদ্ধি সে আনন্দর মর্ম বোঝে?'*

* "তাই তোমাব আনন্দ আমার 'পর / তুমি তাই এসেছ নিচে / আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর / তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে—"

* * * *

"তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে / তবু আমার হৃদয় লাগি / ফিবছ কত মনোহরণ বেশে, / প্রভু, নিত্য আছ জাগি। / তাই তো প্রভু যেথায় এল নেমে / তোমাব প্রেম ভক্ত প্রাণেব প্রেমে—"

—ববীন্দ্রনাথ

তখন উনি অত কানও দেন নি ওর কথায়। বালকের বাচালতা মনে করেছিলেন—শুধুই কতকগুলো ফাঁকা কথা, কি বলছে বুঝি তার অর্থও জানে না।

আজও কি বলে গেল না?

'ভালবাসার পথে প্রেমের পথে সেবার পথে তোমার ভগবানকে চাও, তিনি যখন আসবেন তাঁকে চিনতে পারবে তো, গ্রহণ করতে পারবে?'…

হঁ্যা, আরও বলেছে—'হয়ত এমনি বার বার এসেছেন তোমার ভালবাসা পেতে চাইতে—বারবারই তাঁকে বিদায় ক'রে দিয়েছ—'

হায় রে! তখনও যদি তার কথায় কান ও মন দিতেন, ওজন বুঝতেন তার আপাত-বাচালতার!

সত্যই তো। ভালবাসার পথে প্রেমের পথে উনি লক্ষ্যে পৌছতে চেয়েছিলেন। সে লক্ষ্য সেই পথেই পৌচেছে ওঁর কাছে—উনি চিনতে বুঝতে পারেন নি। অবহেলায় বিদায় দিয়েছেন।

আজ মনে হচ্ছে, নানা রূপে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর প্রিয়তম, তাঁর প্রভু এসেছেন তাঁর কাছে। সেবক রূপে এসেছেন সেবা করতে, সন্তানের মতো এসেছেন স্নেহ আস্বাদ করতে। বুঝি এই ভাবেই আসেন। যুগযুগান্তর ধরে, জন্মজন্মান্তর ধরে আসছেন তিনি—নানা ভাবে নানা রূপে ভক্তদের কাছে। লীলাময় তিনি—এ সৃষ্টিও তাঁর লীলা বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, প্রেম—এই সব বৃত্তিও তাই। তিনি নিজ সৃষ্টির এই সমস্ত সুধা, এই সমস্ত অমৃতরসস্রাবী বৃত্তি সম্ভোগ করতে চান।

কেউ বুঝেছে চিনেছে—কেউ পারে নি। তিনি ম্লান মুখে বিষণ্ণ চিত্তে ফিরে গেছেন।

হয়ত, যেমন আজও ফিরে গেলেন।

অস্থির হয়ে উঠে পাদচারণা করতে লাগলেন জনহীন সমুদ্রবেলায়।

অন্তরঙ্গ একান্ত অনুগামী যে কয়জন ভক্ত সেবক এসেছেন সঙ্গে, তাঁরাও নিঃশব্দে দূরে অবস্থান করছেন, নিকটে যেতে সাহস নেই। সন্ন্যাসীর মনে যে কোন কারণে একটা বিপর্যয় ঘটেছে, তা সকলেই বুঝছেন।…

মাথার উপরে অসীম আকাশ, নিঃসঙ্গ শারদ চন্দ্র, নিচে সীমাহীন অপার

সমুদ্র। রজত পর্বতের মতো আবেগের তরঙ্গ তুলে নিষ্ফল বেদনায় আছড়ে ভেঙে পড়ছে। অনন্তকাল ধরেই এমনি চলছে।

যুগ-যুগান্তর ধরে। আজও সে নিষ্ফল, নিঃসঙ্গ।

সবাই নিঃসঙ্গ।

তিনিও।

তবু মনে হতে লাগল এই আকাশ, এই সমুদ্র, এই নিশীথ রাত্রি—যেন তাঁকেই বিদ্রূপ করছে।

হে প্রভু, হে নাথ—তুমি কি তাহলে এই বেশেই এসেছিলে ওঁর কাছে! সেবক রূপে, সন্তান রূপে? সব প্রেমই যথার্থ হলে, সত্য হলে—পূর্ণ হলে, এক হয়ে যায় এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলে? তাই কি ওর দিকে চেয়ে স্ত্রী বা পুরুষ, বালক কি বয়স্ক কোন বোধ থাকত না—সব এক হয়ে যেত, এক অখণ্ড দেহাতীত সত্তা বলে বোধ হ'ত?

অনেকেই তো এসেছে ওঁর কাছে।

হয়ত তিনিই এসেছেন বার বার, এখনও আসছেন। পরীক্ষা করতেই আসছেন বুঝি।

আজ অনেকের কথাই মনে হচ্ছে।

কিশোর শ্রীকৃষ্ণবেশী রাজকুমার—ভক্তপ্রধান রাজার সন্তান; উনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণজ্ঞানেই তো আলিঙ্গন করতে গেছেন, সে প্রণাম করতে হ ভেঙেছে—দুঃখ পেয়েছেন, আশাভঙ্গের বেদনা।

এমনি আরও কত এসেছে। গৌড়ীয়, উড়িয়া, ঝাড়খণ্ডী। কত, কত। বার বারই নিজেকে প্রতারিত প্রবঞ্চিত মনে হয়েছে। অভিমান হয়েছে ইষ্টের উপর। এই তো সেদিনও—সোমেশ্বর এসেছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধরে কৃষ্ণলীলার অভিনয় যখন করছিল তখন তো তাঁকে ওঁর ধ্যানের ধন বলেই বোধ হয়েছিল। এসেছে শিবদাস, সেও এসেছিল ওঁর ভালবাসা, আদর পেতে। নৃপতিসদৃশ ভূস্বামীর একমাত্র কিশোর পুত্র রামনাথ—সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে, অতুল ঐশ্বর্য, নবোঢ়া বধূ, বাপ মা সব ছেড়ে ওঁকে তুষ্ট করতে ভিখারীর ভিখারী হয়েছে, তপস্যার কঠোরতায় ওঁকেও অতিক্রম ক'রে গেছে।

ভালবেসেছেন, যত্ন করেছেন—কিন্তু নিতান্তই বাৎসল্য ভাব বলে একে অবহেলা করেছেন, হতাশ হয়েছেন। হতাশ হয়েছে ওরাও—ওঁর কাছে স্নেহ

আশা করেছে বলে—কান্তাপ্রেম বা সেবিকার সেবা চায় নি বলে।

সন্তান রূপেও যে সেবা নেওয়া যায়—সেবা নিয়েও যে তাঁর সেবা করা যায় —এই জ্ঞানটাই ওঁর ছিল না।

কে জানে ঈশ্বরও হয়ত এই অনন্ত সীমাহীন বিশ্বে একক। নিঃসঙ্গ।

তিনি প্রেম নয়—স্নেহেরই কাঙাল।

প্রেমে যে ভজনা করে তারও স্বার্থবোধ থাকে। সে সুখ চায়, আনন্দ চায়, ঐকান্তিকতা চায়, তার পরিবর্তে। কিন্তু বাৎসল্য স্নেহে কিছু পাবার প্রত্যাশা থাকে না, পিতা সন্তানদের ভালবেসেই সুখী, তাদের সুখেই পিতার সুখ। জীবনের সব বিলাস, ভোগসুখ পিতামাতা বিসর্জন দেয় সন্তানের জন্য।

বাৎসল্য স্নেহ, শুধুই দিতে চায়। এ স্নেহ অনাবিল, অমলিন—আপাত-স্বার্থলেশহীন।

সেই জন্যই তিনি এসেছেন, আসেন—ভালবাসার ভিখারী হয়ে।

শ্যামসুন্দর তাঁর বুকে মুখ গুঁজে বলেছিল, 'আমাকে একটু ভালবাসো না!'

অন্ধ তিনি, নির্বোধ তিনি—তখনও বোঝেন নি।

এই আত্মধিক্কার ও অতীত স্মৃতিমন্থনের মধ্যেই একসময় সত্য প্রতিভাত হ'ল।

অকস্মাৎ যেন অবর্ণনীয় অকল্পনীয় আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

মনে হল কত শত যেন সঙ্গীতের সুর আকাশে বাতাসে, কত সুগন্ধ, কত সৌন্দর্য। যেন আকাশে বাতাসে ওঁর এই অনির্বচনীয় তৃপ্তি; সাফল্য ও সিদ্ধির তৃপ্তি, আনন্দ-উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছে—

এতদিনের সাধনা তো সফলই হয়েছে তাঁর। এটা কেন এতক্ষণ তাঁর মাথায় যায় নি। তিনি আজ সত্যই সিদ্ধ। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা, আকুলতা ক্রন্দন—সংশয়-যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে।

তিনিই তো এসেছেন। সেবা করতে, ভালবাসতে। ভালবাসা চেয়েছিলেন—সে ভালবাসা কি কৃষ্ণপ্রাণ দেন নি? হয়ত তত বাহ্য প্রকাশ ছিল না, ছিল না সংস্কারে বেধেছিল বলে—কিন্তু ওঁর মনের ভাব কি তাঁর অজানা ছিল?

ভক্তকে সেবা ক'রেই তাঁর সমধিক তৃপ্তি বুঝি, সেই লীলারস আস্বাদন করতেই চেয়েছিলেন।

জগন্নাথ প্রভুর কাছে নিত্য কেঁদেছেন—সেই কান্নার সমুদ্র পার হয়ে তিনি ঐ রূপেই এসেছেন ওঁকে পূর্ণতা দিতে, সিদ্ধি দিতে।

ওঃ! এ কি আনন্দ! এমন আনন্দ যে মানবজন্মে আছে, পাওয়া যায়, আনন্দ যে এমন সর্বপ্লাবী হয়—কখনও তো ভাবেন নি।

আর কিছু চাই না তাঁর। কাউকে কিছু বলার নেই, পাওয়ার নেই।

উনি জানেন না পূর্বেকার সিদ্ধ সাধকরা নির্বিকল্প সমাধিতে কি আনন্দ পেয়েছিলেন—জানতে চানও না। তিনি যা পেলেন তা কি কেউ পেয়েছে?

পূর্ণতা পৌঁচেছে ওঁর কাছে। তিনি এখন চান তাতে মিশে যেতে, পূর্ণ হ'তে।

"জগন্নাথ স্বামী প্রভু প্রাণেশ্বর—এসো এবার ঐ রূপেই এসো। সেবক রূপে, ভালবাসার কাঙাল রূপে। চরণে নয়, বুকে স্থান দাও—"

বলতে বলতে উদ্বাহু নৃত্যের মতো ভঙ্গীতেই সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কি দেখলেন সেই পরিপূর্ণ-জ্যোৎস্নাশীর্ষ বিশাল নীল কৃষ্ণাভ তরঙ্গের মধ্যে কে জানে।

সে কি জগন্নাথের দারুমূর্তি? সে কি গুঞ্জমাল্যধারী গোপীজনবল্লভ কল্পনার শ্রীকৃষ্ণকে? না কৌতুকহাস্যরঞ্জিত-অধর বালক শ্যামসুন্দরকে?

তার কোন ইতিহাস লেখা নেই কোথাও।

উনি উন্মাদের মতো, আনন্দোন্মত্তের মতো পিতৃক্রোড়পিপাসু শিশুর মতো গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—ভয়ঙ্কর সুন্দর বিপুল রহস্যময় পর্বতসদৃশ তরঙ্গের মধ্যে —সেই তরঙ্গও যেন ওঁকে পরম স্নেহে চরম প্রেমে আচ্ছাদিত ক'রে নিয়ে গেল এক চিররহস্যময় আনন্দলোকে। যেখানকার রহস্য চিরঅজ্ঞাতই থেকে যাবে আমাদের কাছে। যেখানের বার্তা কোনদিনই এখানে পৌঁছবে না।

সমাপ্ত

লেখকের অন্যান্য বই

কলকাতার কাছেই
আমি কান পেতে রই
মনে ছিল আশা
তব দক্ষিণ পাণি
নারী ও নিয়তি
পুরুষ ও রমণী
কেতকীবন
জীবন আরো বড়
বিধিলিপি (নাটক)
নীলকণ্ঠী
সেই রাজা সেই রানী
পাও নাই পরিচয়
হায়নার দাঁত
সাধুসঙ্গ
সুখে থাকার কাল
স্বর্ণমৃগ
বক্ষে বাজে বাঁশী
সমুদ্রের চূড়া
স্মরণীয় দিন
প্রভাত-সূর্য
আবছায়া
হে নিরুপমা
চাঁদ-মালা*
চির-সীমন্তিনী
স্বপ্ন আমার জোনাকি
সুপ্তিসাগর
*পাঞ্চজন্য

উপকণ্ঠে
শুভ-বিবাহ কথা
জন্মেছি এই দেশে
রজনীগন্ধা
সোহাগপুরা
জ্যোতিষী
নববধূ
বাহির বিশ্ব
আনারকলি (নাটক)
আকাশের আয়না
কিশোর গ্রন্থাবলী
তিনে একে চার
তৃতীয় রিপু
কথা কল্পনা কাহিনী
(খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত)
তারা ভৈরবী
এক প্রহরের খেলা
ভাড়াটে বাড়ী
যোগাযোগ
প্রেরণা
রাত্রির সীমানা
রক্তকমল
তিন সঙ্গিনী
বিজয়িনী
আকাশ-লিপি
পূর্বপুরুষ

পৌষ ফাগুনের পালা
রাত্রির তপস্যা
রাখাল ও রাজকন্যা
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম
পৃথিবীর ইতিহাস
মালাচন্দন
মিলনান্ত
স্বপ্ন-সন্ধ্যা
শ্রেষ্ঠ গল্প
আদি আছে অন্ত নেই
কঠিন মায়া
বড় ছোট মাঝারি
জলে দেখি জোনাকি
চুনি হল রাঙা
তবু মনে রেখো
সাধু ও সাধক
দহন ও দীপ্তি
কিশোর সাহিত্য সমগ্র
জীবন-স্বপ্ন
ছুটি
জায়া নয় দয়িতা
কোলাহল
নবজন্ম
দেহ-দেউল
রূপ তরঙ্গিমা
রানী-কাহিনী
আর এক উপন্যাস